KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 200 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলি-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher মীর ওসমান |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৫৮/১<br>৫৮/2<br>৫৮/৩ | Year of Publication বৈশাখ ১৪০৬<br>ভাদ্র ১৪০৬<br>পৌষ ১৪০৬ |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor আবদুর রউফ | Remarks : |

C.D. F.H No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৩ পৌষ ১৪০৩

রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় 'সুন্দরের পরিগ্রহণ' পর্বের জটিল প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন কবি-দার্শনিক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।
'সুন্দরের পরিগ্রহণ' আর একভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে খ্যাতিমান পণ্ডিত অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের সুদীর্ঘ অনুবাদ কবিতায়: 'প্রাচীন নাবিকের পালা', মূল রচনা স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে স্পর্শকাতর ভারতীয়দের ভাবাবেগের তোয়াক্কা না করে শ্রীনিরপেক্ষ উপস্থাপনা করেছেন ভিন্নধারার বিশ্লেষণ।
অধুনা লুপ্ত সোবিয়েট সমাজতন্ত্রেও সংখ্যালঘু জাতিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নিরসন ঘটেনি কেন? তাই নিয়ে তত্ত্বনির্ভর আলোচনা।
ধারাবাহিক নিবন্ধ: 'ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক'।

কবিতা বিষয়ে বোধের গভীরতা সঞ্চারী তিনটি নিবন্ধ: 'সময়ের দর্শন এবং বিজ্ঞানবোধের নিরিখে 'বনলতা সেন' ', 'অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা' এবং 'কবিতা ও কবিতার ব্যাখ্যা'।
সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা।

'আনন্দবাজারে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নিয়ে নিত্যপ্রিয় ঘোষের এবং 'গান্ধীমানস' অধ্যাপক দেবদাস জোয়াদারের গ্রন্থসমালোচনা।

'নাসিম' 'মাম্মো' 'V For' এবং থিয়েট্রনের 'অসঙ্গত' নিয়ে আলোচনা।

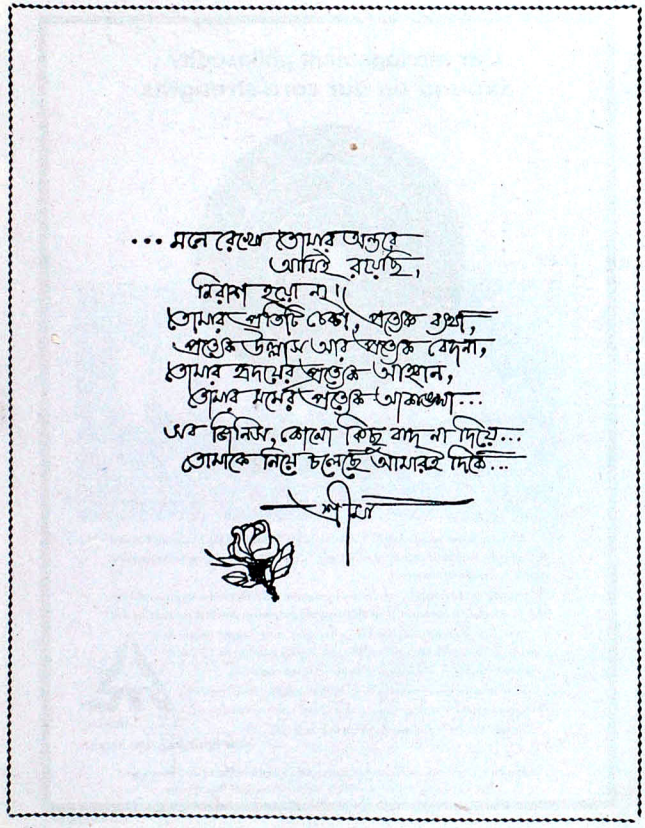


কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৩
পৌষ ১৪০৩


| | | |
|---|---|---|
| সুন্দরের পরিগ্রহণ | অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত | ২৩৭ |
| প্রাচীন নাবিকের পালা | স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ<br>অনুবাদ — শিশিরকুমার দাশ | ২৪৫ |
| কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা এক মহনীয় চ্যালেঞ্জ? | শ্রীনিরপেক্ষ | ২৫৭ |
| জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার — সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও পতনের প্রেক্ষিতে | বেণু গুহঠাকুরতা | ২৬৪ |
| ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক | বিনয় চৌধুরী | ২৭৫ |
| ধর্মের নাম মহাশয়। যা সওয়াবে তাই সয়॥ | সুধেন্দু মল্লিক | ২৮৪ |
| বাবুসমাজ | সমীর রায়চৌধুরী | ২৮৫ |
| ফাঁসীর আসামী | তুলসী মুখোপাধ্যায় | ২৮৬ |
| টান | অজিত বাইরী | ২৮৭ |
| প্রতিদান | গৌতম ঘোষদস্তিদার | ২৮৮ |
| ভুল ঠিকানা | অসীম রেজ | ২৮৯ |
| দ্বিপ্রহরে | উমা বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৯০ |
| অথচ জীবন | ডলি দত্ত | ২৯১ |
| বনলতা সেন: সময়ের দর্শন এবং বিজ্ঞানবোধের নিরিখে | আনন্দ ঘোষ হাজরা | ২৯২ |
| অন্নদাশংকর রায়ের কবিতা | অমূল্যকুমার চক্রবর্তী | ২৯৭ |
| কবিতা ও কবিতার ব্যাখ্যা | ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ৩০০ |
| সওগাত | শুচিস্মিতা সরকার | ৩০৩ |
| কলিকাতা পুলিশ মিউজিয়াম | সুরজিৎ দাশগুপ্ত | ৩০৭ |
| সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতা | মনোতোষ চক্রবর্তী | ৩০৯ |
| নাসিম, মাম্মো এবং V For | শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩১৪ |
| থিয়েটরের 'অসঙ্গত' নাটকটি দেখার পর | আবদুর রউফ | ৩১৬ |
| **গ্রন্থসমালোচনা** | | ৩১৮ |

নিত্যপ্রিয় ঘোষ ■ দেবদাস জোয়ারদার ■ পুলক নারায়ণ ধর ■ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ■ তিমির বসু ■ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ■ সন্তোষকুমার দে ■ কামাল হোসেন ■ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ■ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ■ মেঘ মুখোপাধ্যায়

**বিতর্ক**

| | | |
|---|---|---|
| প্রসঙ্গ 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়' | নজরুল ইসলাম | ৩৪৭ |
| স্মরণে মনসুর হবিবুল্লাহ | সলিল গঙ্গোপাধ্যায় | ৩৪৯ |
| সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য | বদরুদ্দীন উমর | ৩৫০ |
| স্মরণে অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় | আবদুর রউফ | ৩৫৪ |


শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্তপ্রেস কলি-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত

অফিস : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ দূরভাষ : ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত সম্পাদক : আবদুর রউফ

আর একটু পরেই ও প্রবেশ করবে
এক নতুন জীবনে...

'আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন'

কনের সাজে সজ্জিতা; সলজ্জ, চমৎকার রূপ। আশা ও আনন্দে থরথর হৃদয়। মা-বাবার মন কিন্তু শঙ্কায় দুরুদুরু। আয়োজনে ত্রুটি নেই কোনো; তবু তাঁদের চোখমুখের কী-হয় কী-হয় ভাব চোখ এড়ায় না কারও। সব আয়োজনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সকলের কাছে তাঁদের নিরুচ্চার প্রার্থনা—আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন। যেন ওর বিবাহিত জীবন সুখের হয়।

চিরন্তন এই রূপ ও প্রার্থনার সঙ্গে কে না পরিচিত! বিজলী গ্রীলও জানে, এই প্রার্থনা কতো গভীর, কতো আন্তরিক। তাই, যে-কোনো বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে অতিথি অভ্যাগতদের নানা সুখাদ্য পরিবেশনের সময় তারাও ঢেলে দেয় মনপ্রাণ। যাতে সকলেই খুশি হন—যাতে সত্যি-সত্যিই ফলবতী হয়ে ওঠে এই প্রার্থনা।

বিজলী গ্রীল—
বিবাহ কিংবা যে-কোনো
উপলক্ষে কলকাতার সেরা
কেটারার।

Bijoli Grill

৯ই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন : ৪৫৫-২৩৬০/৪৫৫-৩৯২২/৪৫৫-৫৫৪১
ফ্যাক্স নং : ৩৩ ৪৫৫-২৭৬৬

Printadex/BG-2/91B


# সুন্দরের পরিগ্রহণ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এক-একটি সময় উদ্‌যাপিত সৌন্দর্যের প্রহরমুহূর্তগুলির একটি কণাও নষ্ট হয়ে যায় না, মায়ামুকুরের মধ্যস্থতায় অদৃষ্টের অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করে ফিরে আসে মানুষের মুখমণ্ডলে, এ রকম একটি ধারণা থেকেই বোধহয় রিল্‌কে তাঁর দ্বিতীয় এলিজিতে লিখতে পেরেছিলেন:

আদি যত সার্থকতা, সৃষ্টির যা-কিছু সমাদৃত;
গিরিশ্রেণী, গিরিচূড়া ঊষা আরক্তিম শৈলমালা
প্রারম্ভের, মঞ্জরিত দেবায়তনের পুষ্পরেণু,
আলোয় আলোয় গ্রন্থি, দীঘল বারান্দা, সিঁড়ি, সিংহাসন যত,
অস্তিত্বের পরিসর, মাধুর্যের আচ্ছাদন, ঝড়ের ভিতরে
পরমের অনুভূতি, আর অকস্মাৎ
মায়াবী দর্পণগুলি অপসৃত সে সমস্ত সৌন্দর্যপ্রবাহ
প্রত্যাহার করে আনে নিজ-নিজ মুখের বলয়ে।

আর তখুনি আমাদের মনে পড়ে যায়, এই অভিভাবের কবি রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়ার মুহূর্তে কেমন বলে উঠেছিলেন, wichtig, ure mir selicint ('জরুরি বলেই আমার কাছে প্রতিভাত')। কেন জরুরি, সে কথা স্পষ্ট করে সেদিন বোঝাতে পারেননি রিলকে। বরং তাঁর ও রবীন্দ্ররচনার অনুরাগিনী হেলেনে ফন নোস্‌টিৎস্‌ প্রসঙ্গত তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার ভিতরে সেই বিস্ময়ের যুক্তি অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। তিনিও, রিলকের মতোই, প্রথমে ফরাসি ও অতঃপর জার্মান অনুবাদে রবীন্দ্র-সৌন্দর্যের পরিমাপ নিতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পরিশেষে তাঁর মনে হয়েছিল; 'এসব কবিতা শক্তিশালী পর্বতের মতো আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' এ পর্যন্ত লিখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এরকম বর্ণনা জাগতিকতার বিচারে খুব যথাযথ নয়। তাই তিনি বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন একটি মন্তব্য: 'এরকম উপমা চলে না, জানি, কিন্তু আমি এ ভাবেই যে তাকে অনুভব করেছি।'

অনুভব করবার স্বীকরণী এই প্রবলতা (intensity) থেকে সুন্দরের অভ্যর্থনা-র একটি দিক উঠে আসে। এরই প্রণোদনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া'। সূক্ষ্ম তারে বাঁধা এই মন চতুর্দিক থেকে প্রথম সংগ্রহ করে, আর তারপর কবির কাজ সেই 'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা/বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।' কবি অবশ্যই অর্থের চেয়ে চিহ্নের গুরুত্বই এখানে কবুল করে নিয়েছেন এবং সেজন্যেই বলে উঠেছেন: 'কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।' অন্যত্র নিজের লেখার প্রকাশমানতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে' উঠে-আসা 'স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্নের'র উপরেই জোর দিয়েছেন। 'সে-চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন পথে সে যাচ্ছে।'

হাইডেগার এই অজান্তে হতে-থাকা ও প্রকাশধর্মিতার সম্পর্ক পরিব্যক্ত করে বলেছেন: 'একজন ভাবুক বা রচয়িতার চিন্তন যত বিরাট—এখানে তাঁর রচনার বিশালতা বা সংখ্যা নিয়ে কোনও কথা উঠতেই পারে না—ততই বিশাল সেই চিন্তনের অন্তঃস্থ অ-চিন্তিত পরিমাণ, তার মানে চিন্তাধারা যেখানে এখনও-না-ভাবার মধ্য থেকেই উৎসারিত।'

অচিন্ত্য এই চিন্তাধারা থেকেই সেমিওলজির উদ্ভব এবং এর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের পুনর্নব সৌন্দর্যভাবনা আমাদের কাছে সহজে ধরা দেয়। আমরা তখন অনুধাবন করতে পারি রবীন্দ্রনাথ যাকে চিহ্ন বলছেন তার নির্জ্ঞান চয়নের ভিতর থেকেই সৃষ্টির

উৎসার। একটি বিশেষ জায়গায় সে আবদ্ধ থাকে না, তার ধর্মই বিবর্তন এবং অনুবর্তন। এক-একবার তাকে সচেতন সূত্রাকারে ধরাও যায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন, আত্মনির্ধারণের স্বস্তি নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন: " 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই।" 'ঐ একই' সে কোন্-এক সেটা অবশ্যই স্বতদর্শীর ভূমিকা থেকে তিনি, আমাদের বাঁচানো ও উদ্দীপিত রাখার পৌরোহিত্যে, ধরতে এবং ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ওভাবে হয়ত একটিমাত্র ধ্যানলব্ধ সূত্রের মধ্যেই মুষ্টিবদ্ধ হতে চায় না সৃষ্টির স্রোতের রহস্য। কেন 'শারদোৎসবেই' এর গোমুখী, তার আঠারো বছর আগের 'চিত্রাঙ্গদা'য় নয়, কেন 'রাজা' ও 'শারদোৎসবে'রও অন্তত এক দশক পরবর্তী সমধর্মী শিল্পসংঘটন 'অরূপরতন'/'ঋণশোধ' পর্যন্ত আমরা যাব না, 'থীমের নিরন্তর চলন' বা thematic continutiy-র খোঁজখবর নিতে ব্যাকুল হব না আমরা, তা নিয়ে সহজাত কোনও যাতনা ঐ সুপ্রসন্ন তত্ত্বদর্শিতায় ফুটে ওঠেনি। সেটাই হয়ত স্বাভাবিক, কেননা স্বরচিত সৃষ্টির প্রোটোকল দিয়ে যাওয়াও স্রষ্টার অবশ্যম্ভাবী দায়কাজ নয়। আমি তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ঐ মঙ্গলসূত্রের কাছে অধমর্ণ থাকি এবং তারই সহায়তায় তাঁর সৃজনধারার একটি তরঙ্গের উপর স্থাপিত বাতিঘর থেকে একটি রশ্মি আহরণ করে আলোকপাতের দুঃসাহসে মগ্ন থাকি কিছুক্ষণ।

তখন পরিচিত তথ্যের অরণ্য থেকে সরে আসি অপরিচয়ের পরিচর্যায়। অপরিহার্যতই আমার মন প্রথমে যাকে বলে 'ভাববস্তু'র উপর সংবদ্ধ হতে চায়। অনুমানের স্বাধীনতায় আমি চলে যাই পিটার ইলিচ চায়াকোভ্স্কি-র কাছে। রবীন্দ্রনাথ কি অন্যান্য পরিচিত উৎস উশকে দেবার এক অবসরে তাঁর কাছ থেকেও এ সব নাটকের কোনও কোনও মোটিফ তুলে আনেননি? তাঁর গুরু আন্টন রুবিনস্টাইনের সুর তো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিত্যই আবহসংগীতের মতো পরিকীর্ণ হয়ে থাকত। চায়াকোভ্স্কির সুর দেওয়া ব্যালের বয়ানে Swan Lake (Le lac des Cygnes/১৮৭৬)-এ যথার্থ সুন্দরকে বিদ্ধ করবার আগ্রহ কি আমাদের সর্বাগ্রণী গীতিনৃত্যনাট্যকার এবং রূপকরচয়িতাকেও তাড়িত করেনি? সেখানে মানুষীরা যখন মধ্যরাত্রে হংসবলাকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, রূপান্ধ রাজকুমার সীগফ্রীড শুভ্র সুকুমারী ওদেৎ ও আসিতহংসী ছলনাময়ী ওদিল অর্থাৎ সত্যিকারের এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে প্রথমত শেষোক্তকেই বেছে নেয় এবং শেষে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে অনাদি সুন্দরের দিকে ফিরতে চায়। কিন্তু তখন যে বড় দেরি হয়ে গেছে। ট্র্যাজিক শুদ্ধির এই 'পরমা নিষ্কৃতি'র (Catharsis) অভিমুখিতা থেকেই প্রমথনাথকথিত তত্ত্বনাট্যের জন্ম, এ রকম দাবি করলে গর্হণীয় অন্যায় হয় না। রাজকন্যা মরালদুহিতা ওদেৎ ও রাজপুত্র সীগফ্রীডের চরিত্রের বিপর্যাস ঘটিয়েই কি রবীন্দ্রনাথ রাজা ও সুদর্শনাকে ফুটিয়ে তোলেননি?

রবীন্দ্রতত্ত্বজ্ঞেরা বলতেই পারেন, এখানে আমি আরোপ করছি। সেক্ষেত্রে আমি দাবি করব, আরোপ-প্রত্যারোপ সাহিত্য সমালোচনার সেই শর্ত যা মূল বিষয়কে, আলোকচিত্রের ভাষায়, 'জুম' বা নিকটবর্তী করে টেনে আনে। এই উৎসাহেই আমি মরাল হ্রদের কোনও কোনও চিত্রকল্পের দিকে তাকিয়ে থাকি। মধ্যরাত্রি, অপশক্তির অভিশাপে অন্যতর প্রাণিসত্তায় রূপান্তরিত মানুষ কি মানবী, অশ্রুসমুদ্র জল ও আলোর সমাহার নারী — এ সব দৃশ্যছবি রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যে বা সাংকেতিক অসংখ্য গানে আমার কাছে তখন একই দ্যোতনা নিয়ে আসে। জাঁদরেল সমালোচকেরা এই নৃত্যনাট্যে, বিশেষ করে নারীর আর্কেটাইপ চিত্রণে, উপচেতন থেকে চেতনায় ক্রমমুক্তির যে-জায়মান গতি পরিণতি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তার প্রাণবন্ত সমর্থন দেখতে পেয়ে আমার আনন্দ অপরিমাণ বেড়ে যায়। এই সমালোচকেরা যে চায়াকোভ্স্কির রচিত সুরকল্পকে শেষ পর্যন্ত কোনও বিধিবদ্ধ সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করে তুলতে পারেন না, সেই সূত্রেও রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞাতিশায়ী রূপকল্পের সঙ্গে সারূপ্যের যুক্তিতে আরো দূরে এগিয়ে যাবার জন্য অস্থিরতা এসেই যায়।

এরকমই একটি সন্ধিক্ষণে দেখতে পাই, তত্ত্বের শারীরিকতায় নয়, মীড় মূর্ছনার নান্দনিকতাতেই রবীন্দ্রনাথের সুন্দর প্রতিষ্ঠাবান। চায়াকোভ্স্কির তৈরি একটি ডিজাইন সেই মুহূর্তে আমাদের খুব কাজে লেগে যায়। 'মরালহ্রদে'র প্রথম অঙ্কের শেষ দিকেই মদির প্রত্যাশা ও বিষাদ-পরিণতির ঠিক মাঝখানে ওয়াল্স নাচের দুলকি চালে (Tempo di-Valse) পাঁচটি বর্ণ, — শরীরী সময়টাকে ছায়ার মতো ফেলে রেখে দিগন্তে পাড়ি দেবার আনন্দে, আমাদের আচ্ছন্ন করে তোলে। আপনাদের বোধহয় এখন স্পষ্টতর করে বুঝিয়ে দেবার দরকার করে না 'শারদোৎসবে'র প্রথম দৃশ্যে বিভাস-একতালায় দিশাহারা বালকবৈতালিক 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে/বাদল গেছে টুটি'র ধুয়োটা একই সুরে-বাঁধা। মাত্র একবার রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে মুক্তিদ্যোতক ওই সুর শুনেছিলেন, তাকেই তিনি সুন্দরের স্বার্থে এখানে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুরদাদা ও বালকদের বাউলসুরে গাওয়া গান 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা'র মধ্যে ঐ পাঁচ বর্ণ আট প্রস্বরের এক-একটি পর্বাঙ্গে প্রসারিত হয়ে যায়। এবং সেই শারদীয়তাতেই সেই বিস্তারবাসনা ফুরিয়ে যায় না। নতুন জোর নিয়ে ফিরে আসে 'রক্তকরবী'তে নেপথ্যের নৈঃশব্দের প্রত্যুত্তরে নন্দিনীর শোনা 'পৌষ তোদের



ডাক দিয়েছে — আয় রে চলে, আয় আয়'-এর স্বরবৃত্ত স্পন্দিত আমন্ত্রণে। 'ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক'। আমরাও বধির হয়ে থাকি না, ঠাহর করে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়' উক্তিটির তাগিদ। রাগিণীর বন্ধন যখন একজন শ্রোতার স্বভাবে মুক্তি হয়ে আসে, সেই শ্রোতা রূপকার হলে সেই মুক্তিবোধ প্রবাহিত সৌন্দর্যে পরিণত হয়ে ওঠে। চায়াকোভ্স্কির একটি সৃষ্টি থেকে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের একাধিক সৃজনে এর ইঙ্গিত ব্যাপ্ত। প্রবাহের মধ্য থেকেই এভাবে যে নতুন-নতুন ধ্রুবপদ উঠে আসে, তাকে রবীন্দ্রনাথের অর্থে শিল্পের সুন্দর বলে ধরে নিতে অসুবিধে নেই। তার মানে এই নয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুন্দরের প্রতীতি রূপান্তরণের জন্য অপেক্ষামাণ হয়ে থাকে। বিশ্বশিল্পের পটভূমি ও সদ্য-ঘটে যাওয়া মুহূর্তের দোলাচলের মধ্যে রেখেই তো কল্যাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্য্ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরচনাকে সম্পর্কিত একটি আন্দোলনের অঙ্গ (part of a related movement)হিসেবেই দেখবার জন্য আমাদের প্রবুদ্ধ করেছেন। তাঁর সেই দেখায় রবীন্দ্রপ্রতিমার চালচিত্রে ভেসে ওঠে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যৌথ পরিবারের অনেকগুলি উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, আর সেই সুবাদে আমরা অনায়াসেই আঁচ করে নিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিয়েই রবীন্দ্রনাথ। 'The Tagores worked as a whole group the family circle worked together in the same direction; their activities covered literature, art, theatre disign....', সুব্রহ্মণ্যনের এই অন্বয়ী আলোয় আমরা নির্ণয় করে নিতে পারি ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ঐশী সুন্দরের পশ্চাৎপটে 'ভূর্ভুবস্ব' নামক তিনটি বর্গ কীরকম সক্রিয় ছিল। ওই তিনটি প্রাচীন ধারণার আড়ালেই কি লুকিয়েছিল না যথাক্রমে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের ত্রিনীতি? কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নিয়েও আমরা ভিকতর কুঁজার ১৮৫৪ সালে প্রবর্তিত তিনটি নীতি Du Vrai, du beau et du bien-এর অধিষ্ঠান কি দেখতে পাই না? কে ওই অনুবাদ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সেই তর্কে না গিয়েও আমরা এই ধারণায় পৌঁছতে পারি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদনে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ওই অনন্যোধর্মী বিধান ব্রাহ্মসমাজই নয়, জোড়াসাঁকোর নতুন শিল্পীদের কাছেও মঙ্গলাচরণের প্রাসঙ্গিকতায় গৃহীত হয়েছিল। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের চলার শুরু। শান্তিনিকেতনে অভিনয় বা উৎসবের নির্মিতির কাজেও এই যৌথতাই ছিল সার্থকতার প্রাক-শর্ত। তাই 'রাজা'ই নয় 'তাসের দেশে'র মঞ্চসজ্জা কি মুখোশগুলি কলাভবনে অবনীন্দ্র-নন্দলাল-বিনোদবিহারীর পরিচালনায় তৈরি হয়ে আসার সময়ে সংগীতভবন থেকে শান্তিদেব কি শৈলজারঞ্জনের তালিম নিয়ে এসে যেত গানের দল গৌরপ্রাঙ্গণের মঞ্চমোহনায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বরচিত রচনার প্রস্তাবিত পরিসরে কি সেই সম্মেলক আত্মীয়তার নিরাপত্তাতেই থেকে যেতে হয়েছিল? ঠাকুরবাড়ির 'আন্দোলন', সুব্রহ্মণ্যনের বিশ্লেষণে, একদিন থেমে গিয়েছিল। 'That in later days this did not remain a *movement* but splintered into *schools* with restricted objectives is probably what arrested its influence', তাঁর এই উক্তির জের ধরে বলা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এক-এক পর্বে এক-একটি স্কুল রচনা করে নিজেই ওই সর্বতোভদ্র আন্দোলনটিকে আলঠে দিয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্যনের সন্দর্ভ Art and Change (১৯৭২)-এর মধ্য থেকেই সমাধানসূত্র নিয়ে তাই বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথের বেলায় change-ই art-এর উদ্দীপক রহস্য।

তাঁর শেষ পর্যায়ের একটি রচনাও যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে অনুশীলিত হয়, সেখানেও দেখতে পাব অখণ্ড আকরধারণা ভেঙে ভেঙে তিনি সৌন্দর্যসত্য গঠনের কাজে নেমেছেন। এরকমই একটি শিল্পকাজ 'যোগাযোগ' উপন্যাস।

...যখন 'কুমুর বন্ধনে' (১৯৭৯) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আদর্শ ও পার্থিব সৌন্দর্যের দ্বৈরথকেই এই গল্পের বিষয় বলে গণ্য করে, প্রমাণিত হয় তাঁর অভিনিবেশের নতুনতা। তিনি যখন মনে করেন, 'অল্প কিছুদিন শুভ অশুভে দ্বন্দ্ব চলছিল, অশুভ ছিল নানাভাবে দুর্বল, তারপর শেষ অধ্যায়ে যখন শুভের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ঘটল অশুভের মুখগহ্বরে, কুমুকে বেঁধে নিয়ে চলল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ তখন পিছিয়ে এলেন', তাঁর সেই নির্ধারণের সঙ্গে এই উপন্যাসের ফল্গুশায়ী আরেকটি মাত্রা যোগ করে দেওয়া যায়। এবং সেই মাত্রাটি আরেকরকম সুন্দরের। তার সঙ্গে অশুভের একটি যুক্ততা যে নেই তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিস্তৃত তার আবেদন। সেই আকর্ষণ বিপ্রতীপ চরিত্রগুলির মধ্যেও, আধুনিক মানুষের তত্ত্বনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার ছায়ায়, সমানভাবে বিরাজিত। উপন্যাসের প্রায় মাঝখানে মধুসূদনের অনুশীলিত অপ্রেমের আবহে আমরা যখন প্রথম 'সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে' এই বর্ণনার সামনে থমকে দাঁড়াই, তখন আমাদের বীন্দ্রশীলিত মনে যে-বিসংগতি লাগে, মধুসূদনের চরিত্রের মালমশলা জানা থাকার ফলে একটু পরেই সেটা আমাদের সয়ে যায়। কিন্তু কুমুর বিদায়ের পর সেই শূন্যতারই শরিক যখন হয়ে ওঠেন কালিদাস এবং ভগবদ্গীতার শিক্ষার্থী এবং সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিভূ বিপ্রদাস, যখন আমরা লক্ষ করি 'বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা', আমাদের মনে যে culture shock বা অপর সংস্কৃতির

সংস্পর্শজনিত ধাক্কা লাগে তার বিদারণরেখাটি স্থায়ী হয়ে ওঠে। এখানে শুভ ও অশুভ দুটোই শিল্পের দাবিতে তুল্যমূল্য হয়ে যায় আর তাদের ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে সন্দর্শনী মায়াবী দর্পণ মনোবিকলনতত্ত্বের আভাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কথায় চিরাভ্যস্তের মন্থন থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতের দিকে টান দেবার উদ্ভাবনী ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়াকে মূর্ত করেছেন: 'হয়তো এ সব গল্প পড়ে কোনো কোনো রক্ষণশীল পাঠকের সুকুমার মনে আঘাতও লেগে থাকবে।' আঘাত দেওয়ার এই পদ্ধতিটি নিশ্চয়ই মুক্তমনে সুন্দরের অভ্যর্থনার একটি অনুভাব।

এর অনেক আগেই এই অনুভাব কাহিনীকার, কথাশিল্পে মনঃসমীক্ষণের অন্তর্ভুক্তির স্বযাচিত মন্ত্রণায়, আরেকটি অনুভাবের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। সেটি হল পূর্বকালীন লেখকের কোনও কাহিনী কিংবা বৃত্তান্তের উল্লেখ করে বর্ণনীয় প্রাত্যহিককে সঞ্চলমান করে দেওয়া। পূর্বোল্লেখের (allusion) সাহায্যে ঘটনার রুদ্ধমুখ খুলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যাওয়ার এরকম একটি বিখ্যাত উদাহরণ: 'অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল — বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।' এই বর্ণনার দু দশক পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'পঞ্চশরে'র উপসংহারের মুখে, একই রীতির আশ্রয় নেন:

> হঠাৎ একদিন বিছানা পাততে পাততে কমল জিগ্গেস করে,
> "চোখের বালি পড়েছেন?"
> রবি টেবিলে বসে পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে বলে, 'হুঁ!"
> কিন্তু পরমুহূর্তে সে সচেতন হয়ে ওঠে! মুখ ফিরিয়ে দেখে
> কমল তার দিকে তখনো তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নয়—সে যেন
> ক্ষুধিত আলিঙ্গন। রবি কমলকে যেন নূতনভাবে অনুভব করে।

কথাবস্তুকে স্রোতশ্চল করে তুলবার জন্য ধ্রুপদী হয়ে ওঠা পূর্বোল্লেখের (allusion) এই প্রয়োগ থেকে আরো একটি কথা প্রমাণিত হয়। এর আগেই দেখেছি, কল্লোলযুগের ঔপন্যাসিকেরা ভাবগত অর্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরাসরি কর্জ করে নিচ্ছেন, তাঁর প্রাক্তন মাঙ্গলিক সৌন্দর্যবাদ রপ্ত করে নিতে গিয়েও এতটুকু আড়ষ্ট বোধ করছেন না। এখন দেখলাম তাঁদের ঋণ এমন কি রূপগত। গল্পের বেগ যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, সেই বিবেচনায় তাঁরই ব্যবহৃত আরোপণপদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করছেন। এই আত্তীকরণ বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' পর্যন্ত বর্তিল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবস্তুকে উদ্দীপনবিভাব করে গল্পের গতি ত্বরান্বিত করেছেন প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথেরই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে উশকে দিয়েছেন স্মৃতি ও চরিত্রের অন্তর্বয়ন। বেঞ্জামিন কথিত স্মৃতির সঞ্চালক শক্তি'র সত্যতা এখানে নতুন করে প্রমাণিত হয়।

গোয়েটের ভাষায় 'অ্যানিকডোট শিকারী' না হয়েও এখানে একটি স্মৃতিকে নিরাসক্তভাবে ব্যবহার করা যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৮-র এপ্রিল মাসে 'আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। কবিদের চিঠিপত্র ও ছবি সেই সূত্রে যেমন কাজে লাগানো হয়েছিল, তেমনি তাঁদের অকপট বক্তব্যগুলি 'আধুনিক কবিতা ও কবিকথা' নামক একটি পুস্তিকায় সাজিয়ে দেবার মুখে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা আঁতিপাতি করে একটা সামগ্রিক পরম্পরা খুঁজে দেখতেই চেয়েছিলেন। বিষ্ণু দে-র ভাষাবন্ধে 'ঐ সাহিত্যিক গোয়েন্দাগিরির একটা তাগিদ ছিল নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের অন্তঃশীল যোগাযোগ আদৌ আছে কি না এবং থাকলেও কীভাবে আছে সেটা সোজাসুজি জেনে নেওয়ার। মনে আছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের অগ্রাধিকার খারিজ করে বলে উঠেছিলেন, 'কোনো বাহাদুরি দাবি না করলেও বলব প্রথম বাংলা গদ্যকবিতা আমিই লিখেছি।' এর পর, আমার কোনও ছাত্রকে সঙ্গে না নিয়েই আমি যখন তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাই তিনি অকাতরেই ধরতে পেরেছিলেন আমার সশ্রদ্ধ সংশয়, নিজে থেকেই বলে উঠেছিলেন, 'আরে, ওটা একটা কথার কথা। আমাদের সমস্ত প্রকরণই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া। তিনিই, এক কথায়, আমাদের বিশ্বসাহিত্য। তাঁর মধ্য দিয়েই আমরা বিশ্বসাহিত্য পড়ছি ও সেই ঝর্ণাতলা থেকেই কলস ভরে নিচ্ছি।'

যাঁর ঝর্ণাতলার নির্জনে প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবারই মাটির কলসগুলি ছাপিয়ে গিয়েছিল, তিনিও শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে ওয়াল্টার র‍্যালের কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলা যায়, বিশ্বসাহিত্য থেকে অধীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের স্বভাবকে অন্বিত করে দিয়েছিলেন। ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকায় (জানুয়ারি, ১৯৩৩) প্রিয়রঞ্জন সেনের Western Influence in Bengali literature বইয়ের সমালোচনাকালে, যুক্ত থাকবার এই এষণা থেকে, 'formative influences to helf self expression'-এর কথা আমাদের জানিয়েছেন। আত্মপ্রকাশভঙ্গি যে সাংস্কৃতিক স্বীকরণ বা বহিঃসংস্কৃতির অভ্যর্থনা ছাড়া অর্জন করা যায় না, সেদিকে আমাদের মনোযোগ আদায় করে তিনি একই নিবন্ধে বলছেন, 'Sufficient emphasis however has not been laid on the fact that it is this power to assimilate cultural influences from outside which proves the creative vitality of Bengali literature!' এরপর বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল প্রাণশক্তির ঔদার্যগুণই শুধু নয় ব্যক্তিলেখকের মৌলতাও যে বিশ্বসাহিত্যের উপর নির্ভর করে আছে, সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ এই নির্দেশ দিয়েছেন



যে 'Originality in literature lies in the capacity to absorb the universal in all literatures and arts and give it a unique expression characteristics in his (sic) particular genius and traditions'।

এখানেই সুন্দরের সংবর্ধনা নতুনতর যে মাত্রা পেল আজকের সমালোচনার ভাষায় তার নাম 'পরিগ্রহণের নন্দনতত্ত্ব'। এই তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাতা হান্‌স রোবার্ট ইয়াউস লেখক এবং পাঠকের সম্বন্ধবদ্ধতার কথা আমাদের ক্লান্তিহীনভাবে মনে করিয়ে দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, একটি সাহিত্যকর্মে পাঠকসত্তার প্রত্যাশার ব্যাপারে আছে। এবং সেই সমস্ত প্রত্যাশার সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনে নবায়নগুলির স্বরূপ পরিস্ফুট করে তোলা।

এখানে আমরা পর পর কয়েকটি হদিশ পেয়ে গেলাম। এক, রচয়িতার মৌলিকতা ও তার উপর পাঠকের প্রভাব। দুই, পাঠকের প্রত্যাশার গণ্ডি ডিঙিয়ে, লেখকের অভিযাত্রা। এবং তিন, সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞের কাছে এই পরস্পরস্পর্শিতার ভিতর থেকে একটি বিবর্তমানতা আবিষ্কার করার মন্ত্রণা।

কিন্তু তখন কী হয় যখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভূমিকা বদল ঘটে যায় আর আমরা দেখতে পাই এই দুজনের 'র‍্যাপোর্টের' মধ্য দিয়ে আধুনিক সাহিত্য বিবর্তিত হয়ে উঠছে? পরিগ্রহণ করা ও পরিগৃহীত হওয়ার এই যুগলবন্দির গতিপ্রকৃতি ধরবার তাগিদেই আমরা খুলে ধরি 'আকাশপ্রদীপে'র উৎসর্গপত্র: 'শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু, বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি! তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

বড়ই দ্বিধাদুরুদুরু এই আত্মবিশ্বাস যা সমস্ত সৃষ্টির প্রাণবিন্দু। এই বইতে নিকট সময়কে করতলগত করার পরেও স্রষ্টার সেই নান্দনিক বোধ আভাসিত যে, 'সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,/কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়'। ঘনিষ্ঠ ব্যবধানের প্রাত্যহিকতা থেকেই তারপর 'সোনার ধানে ছুটির সানাই বাজিয়ে' সেই 'মন্থর তরী'র 'নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই' আচমকা সাগর-উড়াল।

আর তখুনি, আবারও নতুন করে, শুরু হয়ে যায় পাঠকের চিরাচরিত প্রতীক্ষাকে চরিতার্থ করবার ইচ্ছা। আমাদের চোখের সামনে রিলকেকে লেখা হেলেনে-র চিঠিতে উল্লিখিত মহাশক্তিশালী পর্বত তথা রবীন্দ্র, যিনি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যান — এখানে আধুনিক কবিতার সাজ সরঞ্জাম ছুঁয়ে ছেনে তরুণ সতীর্থের সঙ্গে খেলায় মাতেন। আমরা দেখতে পাই, কবি 'দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে' উঠে গিয়েও তাঁর ভূতভবিষ্যকে একটি চলিচ্চিত্রে দেখছেন, যেখানে ভয়ের মূর্তি যাত্রার সং সেজেছে, মেখে নিয়েছে কুশ্রী রং। আর 'দিনগুলি যেন পশুদলে চলে চলে,/ঘণ্টা বাজায়ে গলে।' সাদা ও কালো যত চিহ্ন তখন একই উত্তরণের প্রার্থী নয়, তাদের তিনি আর মেলাতে পারছেন না। ১৯৩৮-এর উনত্রিশে সেপ্টেম্বরের এই কবিতার প্রতিস্পন্দে 'সংবর্তে'র কবির বিশে অক্টোবরে লেখা 'উপসংহার' কবিতাটিতেও দেখতে পাই 'অসম্ভৃত অমা'র ক্ষুব্ধ পশুদের। কিন্তু ওই পর্বতশিখরের কাছে দীক্ষা পেয়েছে বলেই তো কবির হাহাকারের ছবি কত ফ্রেমবদ্ধ, সমাহিত:

> সমাপ্ত সর্পিল পথ দিগন্তের পর্বতশিখরে;
> তার পরে অপার নীলিমা।
> কী হবে উদ্দেশ খুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাস নক্ষত্রনিকরে?
> এখানেই পৃথিবীর সীমা

এখানে দেখছি, রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেকে উজ্জ্বিত করে দিয়ে তাঁর আরব্ধ আধুনিকতায় যেতে চাইছেন, সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে কীরকম সংযত করে নিচ্ছেন। এবং এই সচেতন বৈষম্যসত্ত্বেও দুই কবির মধ্যে যে পরস্পরের উপর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সৌন্দর্য সেতুপ্রতিম হয়ে আছে, সেটা আমাদের এজন্যই কি চোখে পড়তে চায় না যে, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আধুনিক কবিদের আমরা প্রথম থেকেই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন কামরায় বসিয়ে দেখতে অভ্যস্ত?

সুধীন্দ্রনাথেরই empiricism বা মাণসাম্প্রতপন্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পরের কবিতাটি: 'জানা-অজানা'। এখানে পিতলের ফুলদানি বয়ে নিয়ে 'টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।' এরই মধ্যে রোদ্দুরে বিভাসিত হয়ে ওঠে সবুজরঙা একটি ডুরে শাড়ি, এখন সেটা ডেস্ক ঢেকে আছে। যে-নারী সেই শাড়ি পরত সে আছে, অথবা থেকেও নেই, আর সেজন্যেই 'আজ যেন সে রঙের আগুনের পড়ে গেছে ছাই।' 'আগেকার দিন আর আজকের দিন' তাই পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।' এভাবেই 'জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো' নির্মীয়মান হতে দেখে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন: 'বিরহের খাতে সেতু; অভিসার আজ পারঙ্গম।' সেমিকোলন থেকে সেমিকোলনে উদাত্ত রবীন্দ্রনাথের নিজেকে নিরন্তর খনন করে চলার মধ্য থেকেই যুক্তিক্রম আয়ত্ত করে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের চলন বেগার্ত হয়ে উঠলেও তিনি এক সময় রবীন্দ্রনাথকেই গুরুদক্ষিণা দিতে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে একটি শিল্পিত শাশ্বতিকতা উপহার দেন:

> মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার;
> প্রস্তরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উধাও নর্তক;
> নির্বিদ মর্মরে জ্বলে অঙ্গারিত আদিম কান্তার।

এখানেও দুই কবির খেলা শেষ হয়ে যায় না। বই আকারে অন্তর্গত করে নেওয়ার সময় 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত মূল পাঠের শেষ দুটি লাইন নির্মমভাবে বর্জন করেন রবীন্দ্রনাথ:

> তাহাতে আভাস থাকে চরমের কথা,
> অস্তগিরিশিখরের নক্ষত্রের রহস্যবারতা।

কেন এই অপূর্ব দুটি পংক্তি তিনি সেন্সর করলেন, তার কারণ খুঁজতে আমাদের বেশি দূর যেতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'চরমের কথা' অথবা বক্তব্যের ভার ঝরিয়ে এমন-একটি code বা শব্দলিপি পাঠাতে, 'সে কেহ পড়িতে নাহি জানে'। আর সুধীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মধ্যপর্বের রবীন্দ্রনাথের মতোই শিলালিপিময় একটি বাণীমূর্তি তৈরি করে দিতে এবং তাই তাঁর কবিতাটির অন্তিম জিজ্ঞাসা 'সংক্রমিত স্বয়ং কণাদ ?' অত্যন্তই উত্তরগর্ভ।

এই খেলায় কার জিৎ হয়েছে তার মতো অবান্তর প্রশ্ন আর কিছুই হতে পারে না। তবু এই একটা কথা ভিতর নজিরের জোরে বলা যায়, যে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের এই অমীমাংসিত খেলায় ঈষৎ এগিয়েই চলেছিলেন। লেনিন একবার দেময়ান বেদনি-কে তিরস্কার করে বলেছিলেন তিনি পাঠকের পিছন-পিছন না গিয়ে বড় এগিয়ে থাকছেন। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেই হয়ত এগিয়ে থাকছেন, সুধীন্দ্রনাথকে প্রতি মুহূর্তে খেলার নিয়মটা বদলে দিয়ে জব্দ করতে চাইছেন যেন। আর সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত অলংকারশাস্ত্রে দস্তুরমতো প্রস্তুত সুসজ্জিত শব্দশিল্পী, তার প্রতিপ্রয়োগের সময় নিজেকে পরের চালটির জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। আমি এই প্রতিযোগিতার দর্শক হবার আনন্দে মানফ্রেড নাউমান, ডিটার শ্লেনস্টেড, কার্ল হাইন্‌ৎস বার্ক, ডিটার ক্লিশে ও বোজেমারি লেনৎসারের 'সমাজ, সাহিত্য ও পাঠ থিয়োরিগতবিচারে সাহিত্যের পরিগ্রহণ' (Gesellschaft literature lesen—literaturrezeption in theoretischer Sicht/বার্লিন-হ্বাইমার ১৯৭৩) নামক মহাগ্রন্থটি পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখি রচয়িতার নির্মিত কিছু 'সম্ভাবা' প্রমূর্তনের কথা বলছেন ব্রেশট যার মধ্যে শুধু একটি গূঢ়ার্থের ইঙ্গিত নেই, সেই গূঢ়ার্থকে পাঠকরা যেন ছিনিয়ে আনতে পারেন, সেই মর্মে পরামর্শেই সুধীন্দ্রনাথ সেই সৃষ্টিধর্মী পাঠক, যিনি 'সংবর্তে'র কবিতায়-কবিতায় একই উদ্ধারকাজে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য দীপক মজুমদার এবং আমাকে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ খেলাচ্ছলে আমাদের পদেপদেই হারিয়ে দিতেন আর ওভাবে হারতে-হারতেই আমরা নিজেদের শৈলী খুঁজে পেয়েছি।'

ইয়াযুস তাই যখন বলেন লেখক, লেখা এবং পাব্লিকের ত্রিকোণমিতিতে শেষোক্তটি শামিলমাত্র নয়, তা নিজে ইতিহাস-গড়ে-তোলা একটি শক্তিও বটে', অনিবার্যতই দীপক মজুমদারকে লেখা চিঠিতে বুদ্ধদেবের নির্দেশনা আমাদের মনে আসে: 'শিল্প তো প্রকাশ-সাপেক্ষ ও পরনির্ভর—নির্জনতম কবিরও পাব্লিক চাই—তাই আমার শব্দরচিত মিনার টিকিয়ে রাখা আরো শক্ত হয়ে উঠছে (জানুয়ারি ১৯৭১)।'

এই মিনার এমন কি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও টিকিয়ে রাখা শক্ত হলেও পরাভববাদ যে ছিল না তাঁর চারিত্রে! অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে ভালেরির 'আমার কবিতায় সেই তাৎপর্যই আছে যেটা পাঠকেরা তাকে দেবে' কথাটি শুনে তাঁর ভাল লেগে থাকবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে তাঁকে পাঠক কীভাবে নেবে সেই ধরনটা তিনি নিজেই আমাদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই আগ্রহ থেকেই সঞ্জাত তাঁর আত্মসংজ্ঞায়নের আদল 'আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।/ সে কথা মানিয়া লই/রসতীর্থ-পথের পথিক' প্রভৃতি উচ্চারণে পাওয়া যায়। কিন্তু ওই সংজ্ঞার ভিতরেই কি তিনি অন্তরীণ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন? গ্যোয়েটেকেও শেষ বয়সে পৌঁছে নিজেকে চিহ্নিত করে তোলার দায়িত্ববোধে বলতে হয়েছিল, 'আমরা যে মূল্যভাবনা থেকে উঠে এসেছি তাকেই যথাসাধ্য আঁকড়ে ধরে থাকা আমাদের পক্ষে সংগত হবে। অত্যল্প সংখ্যক কয়েকজনকে ধরেই বলছি আমরা এমন একটি যুগের সর্বশেষ প্রতিনিধি যে-যুগ, শিগ্‌গিরই আর ফিরে আসবে না।' আমাদের কালের দার্শনিক য়াসপার্স ওই স্বীকৃতির সমর্থনে আরো অদ্ব্যর্থক ভাষায় জ্ঞাপন করেছেন, 'গ্যোয়েটের জগৎটা পশ্চিমের সহস্রাব্দের সেই উপসংহার যা সমাপ্ত এবং তখন পর্যন্ত সুমীমাংসিত, যার সক্রিয়তা বিদায়ী স্মৃতিতে অতিক্রান্ত। এ সেই জগৎ, যার মধ্য থেকে আমাদের পৃথিবীটা বেরিয়ে এলেও আমাদের সঙ্গে তার দূরত্ব এতই বেশি যে আমাদের চেয়েও হোমারের কালের তুলনায় অনেক কাছে গ্যোয়েটের অবস্থিতি।'

এই প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও কি আমাদের ভাববিশ্বের ব্যবধিও এতই অপার? আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অনুভব করি, আমাদের এই জগৎটা রবীন্দ্রবিশ্ব থেকে জন্ম নিয়ে কোথাও না কোথাও তার সঙ্গে নিকটতর সম্পর্কেই সম্পৃক্ত এবং সেই কারণে আমাদের সমস্ত কার্যক্রমই, নিতান্ত পার্বণীকরণের আনুষ্ঠানিকতায় নয়, জীবন এবং শিল্পায়নে চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্য পরিগ্রহ করার সময়েও ঐ বিশ্বের একটা পরিমাপ নিতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণে একটি বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্বে অতিক্রান্ত হয়ে যান। 'সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে / চলে হাতে হাতে', এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কেমন সহজে তাঁর প্রাগুনির্ণীত সংজ্ঞা বাতিল করে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়ে 'পারবি নাকি যোগ দিতে ওই ছন্দে' আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে স্তরবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা



এখনও অনেকেই অনুভব করেন এবং তাঁদের এই প্রয়োজনবোধে আমার কাছে দশক-বিভাজনের দশার মতোই এক ধরনের অসহায়তা প্রতিফলিত হয়। কোনও দশক বা পর্বন্যাসে একজন কবিকে আবদ্ধ করে দেখলে সেই প্রোক্রাস্টিয় পূর্বধার্যতায় পার হয়ে যাবার অনুমতি দিলে কবিতার চেয়েও কবির মমিকে বড় করে দেখবার লোভ জাগে এবং তার ফলে ইতিহাসপ্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। যিনি এরকম বিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ কবি কথাটির কোনও মানে নেই, শ্রদ্ধ কবি হওয়াটাই বড়ো কথা, সেই আঁদ্রে জিদকে তবু ফরাসিদেশের সবচেয়ে 'বড় কবি কে' এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়েছিল: 'দুর্ভাগ্যত, ভিক্তর য়ুগো'। দুর্ভাগ্য, কেন না 'গীতাঞ্জলি'র ওই অনুবাদকের কাছে আধুনিকতার সূচনার জায়গাটুকুই য়ুগোর মধ্যে দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। যদি আমরা এখানেই রবীন্দ্রনাথকে এরকমই জাদুঘরপ্রতিম একটি স্থিতাবস্থায় আধুনিকদের তুলনায় দেখতে চাইলে তাঁকে ভিক্তর য়ুগোর পাশাপাশি রেখে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ কবির অভিধায় সাজিয়ে রাখতে পারতাম। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয় যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পরিপার্শ্বকে নিয়ে চলেছিলেন এবং এখনও চলছেন বলেই সমকালীন কবির প্রবহমান ভূমিকায় সংজ্ঞাতিশায়ী। সেই তুলনায় 'ঈশ্বর বিশ্বকে প্রণয়ন করেছিলেন আর বিশ্বই তো অশুভকে রচনা করেছে,' য়ুগোর এই নির্ধারণ, অনড় বিভাজনের সরলীকরণে, কত অতীতের ঘটনা বলে মনে হয়।

একদা-কীর্তিত সাহিত্যের অভিঘাত আগলে আবজে রাখার সমস্যা নিয়ে দুর্ভাবিত গ্যোয়েটকেও বলতে হয়েছে, যে-সৃষ্টি একদিন আমাদের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক সময় আজও আমাদের ভাবনাচিন্তা প্রতিষ্ঠিত মতামতের কাছে নতিস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্দেহ নেই, এই মূল্যাংকনে রবীন্দ্ররচনার বড় একটা অংশই যাচাই করে নেওয়ার সময় এসে গেছে। সেটা ঘটলে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির ধারাবাহিক ক্ষমতা কখনোই খিন্ন বলে প্রতীয়মান হবে না, যেহেতু আমরা নির্বাচনী ওই বিবেকের আশ্রয় নিলে বুঝতে পারব, তিনি নিজেই নিজেকে যেভাবে পার হয়ে গিয়েছেন আত্ম অতিক্রমণের সেই ঐতিহাসিকতা আমাদের চৈতন্যে বজায় রাখলে তাঁর আধুনিকতা আমাদের কাছে আরও প্রতিপন্ন হতে পারবে।

গ্যোয়েটের এই সংশয়ের নিরিখে অবশ্যই থেয়োডোর আডোর্নোর সেই বিষণ্ণ দুর্ভাবনা আমাদের মনে পড়ে যায় যে, কোনও-কোনও ছবির গায়ে দর্শকের অসংখ্য দৃষ্টির দাগ লেগে থাকে। রীবন্দ্রসৃষ্টি ও তাঁর বিগ্রহের গায়ে এভাবেই যে সব দৃষ্টি-দাগ লেগে আছে তাদের ভিতরেও কি তাকে নিয়ে আমাদের অভ্যস্ত একটি সংরক্ষণশীলতা ধরা পড়েনি?

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের রচনা নিয়ে জার্মান ভাষায় একটি অনুবাদ-সংকলন প্রকাশিত হলে Rabindranath through Western Eyes-এর লেখক আলেক্স আরোনসন প্রকাশক হ্বোল্‌ফ মের্শকে লেখা ঐতিহাসিক একটি চিঠিতে (২৮ নভেম্বর ১৯৮৯) এই সূত্রে বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন: 'আদর্শায়নের সংসর্গ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, বিশেষত যে সেখানে [শান্তিনিকেতনে] আমার মতো সাত-সাতটা বছর কাটিয়েছে, হুবহু [টোমাস মানের উপন্যাস] জাদুপাহাড়ে হান্‌স কাস্টর্পের মতনই। সেটা রবীন্দ্রনাথের দোষ নয়। তাঁর তো তখন যথেষ্টই বয়েস হয়ে গিয়েছিল। দোষটা তাঁদেরই যাঁরা তাঁর কাজ আমলাতান্ত্রিক উপায়ে অগভীরভাবে একালের উপযোগী করে পরিবেশন করছিলেন।'

এই প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্দ্রায়নের গরজে, যে-রবীন্দ্রনাথ পরিবেষিত হয়ে চলেছেন বলে আরোনসনের মনে হয়েছে, তিনি প্রথানুগত পরিগ্রহণের অভ্যাসে জর্জরিত এবং অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছেন।

যদি আমাদেরই আরোপিত আবরণ সরিয়ে নিয়ে সৃষ্টির ভিতর থেকে শিল্পকে দেখা যায়, এমন একটি আধুনিকতা আমাদের চোখে স্ফুটতর হয়ে উঠবে যা কেবল সংকীর্ণ ভারতীয় অর্থে আধুনিক নয়, আমলাতন্ত্রের শিকার তো নয়ই, আধুনিকতম এবং ভারতীয়। এরই প্রবর্তনায় একই চিঠিতে আরোনসন স্তব্ধ আনন্দে লক্ষ করেন: ' যে জিনিসটা, এ বইতে আমায় বিশেষ করে মুগ্ধ করেছে, সেটা হলো শেষ পর্বের রবীন্দ্রলীরিকের তর্জমা। শ্রেষ্ঠ অর্থেই এই রচনাগুলি অস্বাভাবিক রকম আধুনিক।' আমি এই রোমাঞ্চসঞ্চারী বর্ণনার শেষ দিকে ungemain modern', এই দুটি শব্দের কাছে কৃতার্থ হয়ে দাঁড়াই। একটু পরেই আরোনসনের সেই অনবদ্য ব্যাখ্যা আমার চোখে পড়ে যায় যেখানে তিনি বলছেন, 'বিশেষত যদি (এসব লেখা) শ্রুতিগোচর করে পড়া যায়।' ও ভাবে, অর্থাৎ মূল পাঠে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে না দিয়ে সচেতনভাবে যদি পড়া যায়, সচেতন ব্রেশ্‌টীয় Verfremdungseffekt বা নিজেকে আলগা করে রেখে আস্বাদনের আয়তন সেখানে যুক্ত হতে থাকে এবং তখনই কবির স্বচিহ্নিত আধুনিক সত্তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরেও আরোনসন একটা কথা জুড়ে দিয়েছেন যার অভীপ্সা এই যে, এক ও অনেক রবীন্দ্রনাথের প্রকাশে প্রকরণে এমন জগৎ পাশাপাশি অথবা পর পর দেখা দিয়েছে: 'কী আশ্চর্য লাগে, যখন চোখে পড়ে কোনো কোনো কবিতা [পাউল] সেলানের মতো (যেমন 'ধূসর গোধূলি লগ্নে'/পৃ. ৫৬) আবার অন্য কিছু কবিতা হ্যোল্ডারলীনের মতোই পড়া যায় (যেমন রূপনারানের কূলে/পৃ. ৬৫)। স্টাইলের এই এত বহুধা বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথেরই, অনুবাদকের খেয়ালপ্রসূত নয়।

আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে 'মোকদ্দমা সংক্রান্ত কবিতার মতো ['বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার'] লেখাগুলি যাদের বিশ শতকের শেষ পর্বের রচনা হিসেবে পড়া যায়।'

আরোনসনের এই চিঠি থেকে সুন্দরের সময়োচিত অভ্যর্থনার প্রাসঙ্গিকতা খুব জরুরি ঠেকে। হাইনৎস মোডে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ভাবুক এবং কবির সন্ধানে' (Rabindranath Tagore: Auf den Spurn des Dichters und Denkers in Indian und Bangladesh/বার্লিন, ১৯৭৫) বইতে এই অভ্যর্থনার ধরন বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছেন তার ভিতরেও গ্রহণমাত্রা সমান্তরালভাবে ভেসে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে নব্য-আশ্রমিকতার প্রবলতায় ভাবুক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আইকন সর্বস্বতা এখন বৈধ হয়েছে — যাকে অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই Tagore country বলে সাব্যস্ত করেছেন, তার পাশে বাংলাদেশে, কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্বত্বাধিকারের ব্যগ্রতাও অলক্ষণীয় নয়। কিছুদিন আগেও তাই শিলাইদহের জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচিত সাতান্নটি গল্পের সঙ্গে তুলনায়নে তাঁর বীরভূমে প্রণীত রচনাবলিতে সৃষ্টিশক্তির আপেক্ষিক অনুর্বরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ঘটনা speech-identity বা ভাষাগত আত্মপরিচয়ের উত্তেজনায় একদেশদর্শী হয়ে পড়ে।

এই সূত্রে আমরা আরও একবার হ্বাল্টার বেঞ্জামিনের সতর্কীকরণের কাছে ফিরতে উদ্বুদ্ধ হই। তিনিও শিল্পকাজের দুরকম পরিগ্রহণের কথাই বলেছেন। একটিতে তার aura বা বিশেষ বিভূতিই বড়, বিগ্রহকে পবিত্র গর্ভগৃহে বাঁচিয়ে রেখে কালেভদ্রে তাকে এক-একবার দর্শনার্থীদের কাছে উপস্থিত করাই যার উদ্দেশ্য। বিরল এই ব্যবহারের পাশাপাশি আমাদের গণ মাধ্যমের এই যুগে শিল্পের প্রদর্শণীমূল্য (Ausstellungstvert) বলেও মনোহীন সংবর্ধনার আরেকটি দিক আছে যার সর্বগ্রাসিতায় তার গহন বৈভব কমে যায়, একই শিল্পসামগ্রী পণ্যময়তায় ক্রমান্বয়ে পুনারাবৃত্ত হতে থাকে। আমরা, রবীন্দ্রনাথের অঙ্গীকরণে দ্বিতীয় পর্যায়টাতে অডিও ভিস্যুয়াল যুগের কাছে যান্ত্রিক সমর্পণের ঘোরে দাঁড়িয়ে এখন। তাই সুযোগসুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব aura বা বিভূতির বদলে তাঁর প্রতিমার প্রদর্শন ঘটিয়ে আজ আমরা আত্মতৃপ্ত আছি। সংবেদনহীন এই শতক শেষে তবু একজন কবির করণীয় কী হতে পারে? তিনি হয়ত বিনয় মজুমদারের মতোই একটি গান, আরোনসনের ঈঙ্গিত অনুষঙ্গে নিজের মনে জোরে জোরে পড়তে থাকবেন আর অলক্ষ্যে তার মধ্যে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন তাঁরই প্রাতিস্বিক একটি-একটি প্রস্বর। এই অনুমিতি একেবারেই যে অমূলক তা নয়। সেদিন সদ্যই আমার হাতে এসে পড়ল 'সংবর্তিকা'র বিশেষ একটি সংখ্যা (শারদসংখ্যা ১৯৯৫) যেখানে বেরিয়েছে বিনয় মজুমদারের, সুন্দরের পরিগ্রহণ থেকে ঠিকরে পড়া, বস্তুত যতিচিহ্নহীন এই কবিতা, এক স্তবকের আত্মচেতন একটি নৈবেদ্য:

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তায় জীবন গানে
ফুলের মত সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পুরে
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে
বয়সও হল এতটা আজো
ফুরালো প্রায় আমার কাজও
বাজো হে তুমি হৃদয়ে বাজো
বাজো আমার প্রাণে
যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তায় জীবন গানে।

*[রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাননবিহারী বক্তৃতামালার (১৯৯৬) সর্বশেষ অংশ]* □

# প্রাচীন নাবিকের পালা

## স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ

## ভাষান্তর — শিশিরকুমার দাশ

### নিবেদন

বাইশ বছর পড়ে ছিল এই লেখাটা বাক্সবন্ধ
হঠাৎ তাকে খুঁজে পেয়ে জাগছে দ্বিধা, একটু দ্বন্দ্ব।
অনেক কালের পুরনো এই বিবর্ণ এক অনুবাদ
পাবে কি কেউ মূল কাব্যের বর্ণ, গন্ধ, ছন্দ, স্বাদ?

মূল কবিতার রচয়িতা কোলরিজ এক মহাকবি
তাঁর রচনার মায়া-সৃষ্টি বলতে পারি অসম্ভবই।
যাঁরা জানেন কবির ভাষা, আমার এসব পদগুচ্ছ
তাঁদের কাছে ব্যর্থ প্রয়াস, একেবারেই অতি তুচ্ছ।

বাংলাতে রূপ দিয়েছিলেন অনেক আগে এই কাহিনী
শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সিদ্ধ কবি স্বয়ং যিনি —
রূপদক্ষ, ছন্দকুশল, বৈদগ্ধ্যের নেই অন্ত
মান্যতা তাঁর বিস্তারিত সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত।

দুঃসাহসের কারণ তবু বলি পাঠক ও পাঠিকা
চতুর্দশটি প্রদীপ জ্বলে, মূলে একটি অগ্নিশিখা।
একই বৃক্ষ দেখে শিল্পী চিত্র আঁকেন ভিন্ন ভিন্ন
সব কটিতেই লুকিয়ে থাকে মূল বৃক্ষের কিছু চিহ্ন।

কোলরিজের এই কাব্য থেকে পাঠক কে-না জানে
সন্ধান পায় কত কথার, কত আভাস, নতুন মানে।
সবাই জানেন অনুবাদ তো আসলে এক ছায়া-শরীর,
কায়ার আভাস; প্রতিবিম্ব, মুখের তো নয়, মুখশ্রীটির।

তাই নিবেদন সুধীবৃন্দ, হোকনা যতই এ নগণ্য
এই অনুবাদ শ্রবণ করে করুন আবার জীবন ধন্য
প্রণাম করি কোলরিজকে লিখেছিলেন এই গল্প
দুশো বছর আগে যখন বয়স ছিল তাঁর অল্প।

সে এক ছিল বুড়ো নাবিক ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে
তার জীবনের গল্প বলে হঠাৎ যে কার কাছে এসে।
পাপের বোঝা গলায় নিয়ে সমুদ্রে দিকচিহ্নহীন
ঘুরছে নাবিক, সেই কাহিনী তাকে এবার বলতে দিন।

শিশিরকুমার দাশ

১

সে এক নাবিক, তিন যাত্রীর
একটির পথ রুখলে হঠাৎ।
"ওরে দেড়ে-বুড়ো, জ্বলজ্বলে-চোখো।
পথে কেন বাপু করো উৎপাত?

"বরের বাড়ির অবারিত দ্বার
আর আমি তার নিকট কুটুম;
আসে লোকজন, ভরা আয়োজন
শোনো শোরগোল, পড়ে গেছে ধুম।"

শিরা-ওঠা হাতে তাকে ধরে বলে,
"এক সে জাহাজ ছিল, শোনো সেই—"

"হাত ছাড়, দেড়ে বুড়ো থুত্থুরে"—
ছেড়ে দিল হাত বিনা বাক্যেই।

তবু জ্বলজ্বলে চোখের জাদুতে
সে বরযাত্রী দাঁড়াল শান্ত
শোনে নাবিকের ইচ্ছা-চালিত
শিশুর মতন সে বৃত্তান্ত।

বরাতি এবার বসে শিলাসনে,
শোনা ছাড়া আর উপায়বিহীন;
শুরু করে কথা, উজ্জ্বল আঁখি
সমুদ্রচারী নাবিক প্রাচীন।

"ভাসলাম কলধ্বনির সঙ্গে
বন্দর ছেড়ে প্রফুল্ল মন,
ছাড়িয়ে পাহাড়, চূড়া গীর্জার।
বাতিঘর, সব রইল পিছন।

"উঠল সূর্য জাহাজের বাঁয়
ভেদ করে এল সমুদ্র জল,
খরতাপ দিনে তরীর দখিনে
ডুবে যায় ফের তরঙ্গতল।

"সূর্য ক্রমশ মধ্য গগনে
দুপুরেতে ঠিক মাথার ওপর—"

অতিথি বরাতি চাপড়ায় ছাতি
বিয়ের বাদ্যি বাজছে সজোর।

কন্যা এখন এল অঙ্গিনায়
সে যেন গোলাপ রক্ত বরণ,
খুশ মাতোয়ারা গায়কের দল
করে নতশির অভিনন্দন।

অতিথি বরাতি চাপড়ায় ছাতি
তবু শোনা ছাড়া উপায়বিহীন;
শুরু করে কথা উজ্জ্বল আঁখি
সমুদ্রচারী নাবিক প্রাচীন।



" এইবার এল প্রচণ্ড ঝড়
মত্ত দামাল হিংস্র কঠিন;
উদ্দাম তার ডানার আঘাত
টেনে নিয়ে গেল দূর দক্ষিণ।

" ভাঙা মাস্তুল, ডোবা পাটাতনে—
চিৎকার করে পিছনে পিছনে
যেমন ধাবিত শত্রুর ছায়া,
সামনের দিকে মাথা গেছে ঝুঁকে
দ্রুত ভেসে যায়, ঝড় গরজায়,
পালাই এবার দক্ষিণ মুখে।

এল এক সাথে বরফ, কুয়াশা
কনকনে শীত এল চারিধার,
বিশাল আকার বরফের দল
পান্নার মতো শ্যামল আভার।

সেই স্রোতটানে তুষার পাহাড়
ঠিকরে উঠছে আলো ঝলমল,
নেই জনপ্রাণী, নেই কোনও পশু
শুধু ধূ ধূ করে বরফের দল।

কাছেও বরফ, দূরেও বরফ
বরফে বরফে ঢাকা চারপাশ;
ফাটে চড়চড় বাজে গরগর
মূর্ছায় শোনা ধ্বনির আভাস।

একদিন এক অ্যালবেট্রস
ভেদ করে এল জাল কুয়াশার,
যেন পবিত্র ভক্তের প্রাণ,
স্বাগত জানাই। জয় বিধাতার।

অচেনা খাবার খেল সেই পাখি
ওড়ে চারিদিকে গোল হয়ে ঘুরে;
অশনি শব্দে ফাটল বরফ
হালের নাবিক পথ পেল দূরে।

উঠল দখিনা হাওয়া অনুকূল
পেছনে চলল সেই বিহঙ্গ;
আসে প্রতিদিন, খায়, খেলা করে
মাঝি-মাল্লার নিকট সঙ্গ।

বৃষ্টি বাদলে মাস্তুলে পালে
বসে সে সান্ধ্য পূজার লগ্ন,
সারারাত ধরে সাদা চাঁদ জ্বলে
ধবল কুয়াশা ধূম নিমগ্ন।"

" মাথার দিব্যি, বিপদ-আপদ
থেকে তোকে দূরে বিধাতা রাখুন
ও ভাবে তাকাস কেন?"
তীর ছুঁড়ে
অ্যালবেট্রস করলাম খুন।"

২

"এবার সূর্য উঠল দখিনে
ভেদ করে নীল সমুদ্র জল,
কুয়াশায় ঢাকা রয়েছে এখনও,
ডোবে ফের বামে তরঙ্গদল।

এখনও দখিন হাওয়া অনুকূল
শুধু সুন্দর পাখি নেই আর,
আসেনা আহারে, আসেনা খেলায়
সঙ্গ দেয় না মাঝি মাল্লার।

আমি তো করেছি নারকীয় কাজ
এদেরও ভাগ্যে দুঃখ বিপুল
সব একমত করেছি নিধন
যে-পাখি আনল হাওয়া অনুকূল।
বলেছে 'পাতকী, মেরেছে যে পাখি
যে-পাখি আনল হাওয়া অনুকূল।'

অক্ষীণপ্রভ অনলস্তম্ভ
যেন স্রষ্টার নিজ মস্তক
উঠল সূর্য দীপ্ত প্রখর:

সব একমত করেছি নিধন
যে-পাখি আনল কুহেলিকা ঘোর
বলে মাঝিগণ 'উচিত-ই নিধন
যে-পাখি এনেছে কুহেলিকা ঘোর।'

মধুর হাওয়ায় ফেনা উড়ে যায়
তরী ভেসে যায় সাগরে অবাধ;
আমরা এলাম সর্বপ্রথম
সেই সমুদ্রে শান্ত অগাধ।

পড়ে গেল হাওয়া, পড়ে গেল পাল,
সে যে কী করুণ, কী বিপন্নতা;
ভাঙে সাগরের বিশাল মৌন
মাঝেমাঝে বলি দু'একটি কথা।

তাম্রবর্ণ তপ্ত আকাশ,
রক্ত সূর্য মধ্য গগন,
ঠিক মাস্তুলে মাথার ওপর,
আকারে সে ঠিক চাঁদের মতন।

দিন কেটে যায় দিন কেটে যায়,
আমরা বদ্ধ গতিহীন জড়;
চিত্রার্পিত তরীর মতন
চিত্রার্পিত সাগরে অনড়।

জল, চারিদিকে জল, শুধু জল
ক্ষয়ে যায় তরী, লবন সিন্ধু;
জল, চারিদিকে জল শুধু জল
নেই তৃষ্ণাহরা একটি বিন্দু।

পচন লাগল সাগরে, হে বিধি,
কপালে কী ছিল এই লেখা হায়!
ঘৃণ্য জীবেরা ঘৃণ্য সাগরে
কিলবিল করে চারিদিকে বায়

ঘুরে ঘুরে ঘুরে ওঠে আর নামে
সারারাত ধরে মৃত্যু অনল;
বুড়ি ডাইনির তেলের মতন
সবুজ, সুনীল, সাদা জ্বলে জল।

কেউবা দেখল স্বপ্নে প্রেতিনী
আমাদের দেয় নিদারুণ ক্লেশ;
নয় বাঁও পথ পিছু পিছু আসে
ছেড়ে কুয়াশা ও বরফের দেশ।

সকলের জীভ কঠিন খরায়,
কাঠের মতন শুষ্ক জীর্ণ;
কথা বলা ভার, যেন অঙ্গার—
চূর্ণে সবার কণ্ঠ দীর্ণ।

হায়! একদিন, যুবক, প্রাচীন
কুটিল নয়নে সবাই তাকায়!
নয় নয় ক্রশ, অ্যালবেট্রস
ঝোলাল সবাই আমার গলায়।

ক্লান্ত সময়, শুষ্ক কণ্ঠ
প্রতিটি চক্ষু দেখি ঝলসায়।
ক্লান্ত সময়! ক্লান্ত সময়!
প্রতিটি ক্লান্ত চোখ ঝলসায়,
পশ্চিমে চেয়ে দেখতে পেলাম
কী যেন একটা আকাশের গায়।

মনে হল বুঝি ছোট্ট ধূলি কণা;
মনে হল যেন রেখা কুয়াশার;
সামনে এগোয়, এগোয় ক্রমশ
শেষে নিতে থাকে একটা আকার।

ধূলিকা, কুয়াশা, একটা আকার!
কাছে, আরো কাছে আসতে থাকে:
এঁকে বেঁকে যেন কোনও জলপ্রেত
দৌড়ে পালায়, ডোবে, ভাসে, বাঁকে।

রুদ্ধ স্বর, দগ্ধ অধর
হাসায় কাঁদায় অক্ষম আজ।
মূক হয়ে আছি প্রবল খরায়!
কামড়াই হাত, চুষে নি রক্ত,
চিৎকার করি, 'জাহাজ, জাহাজ'।



রুদ্ধ স্বর, দগ্ধ অধর
আওয়াজে আমার সব বিহ্বল;
জয় ঈশ্বর। হাসি ফোটে মুখে,
নিঃশ্বাস বায়ু ভরে নেয় বুকে,
যেন মুখে লাগে তৃষ্ণার জল।

বলে উঠি, 'দ্যাখো, দ্যাখো নৌকোয়,
কোনও হাল নেই, এ তো শুভ নয়;
নেই হাওয়া, নেই জোয়ারের টান
তবু দৃঢ়গতি নৌকো এগোয়।'

পশ্চিমে জল আগুনে রাঙানো
দিন হয়ে এল অবসান প্রায়!
বিরাট দীপ্ত সূর্য এখন
স্থলে পশ্চিমে অস্তরেখায়;
অদ্ভুত তরী আমাদের আর
সূর্যের মাঝে হঠাৎ দাঁড়ায়।

আলো ঢাকা পড়ে তরীর কাঁকালে
(হে জননী কৃপা করো আমাদের)
উঁকি দেয় যেন কারাগার থেকে
জ্বলন্ত মুখ শেষ সূর্যের।

এগোয় কী দ্রুত, কাছে, আরো কাছে
আমি যত দেখি। দ্রুত কাঁপে বুক!
ও কি তার পাল আলোয় জ্বলছে?
যেন অস্থির ক্ষীণ অংশুক?

গরাদের থেকে সূর্যের উঁকি
যার ফাঁকে সে কি তার পঞ্জর?
একটিই মাঝি, রমণী একাকী?
ওই কি মৃত্যু? দুজন আছে কি?
মৃত্যু কি তবে ওর সহচর?

রক্ত অধর, মুক্ত নয়ন,
সোনার মতন কুন্তল ভার;
কুষ্ঠীর মতো ধবল বরণ
সে দুঃস্বপ্ন শরীরী-মরণ,
রক্ত জমাট হয় ভয়ে তার।

এল সম্মুখে তরী-কঙ্কাল।
পাশা খেলে ওরা সহচরীদ্বয়;
'খেলা হল শেষ, জিতেছি, জিতেছি'
তিন শিস্ দিয়ে সে রমণী কয়।

সূর্য অস্ত। ফুটে ওঠে তারা:
এক নিমেষেই রাত্রি ঘনায়
দূর থেকে শুনি ফিসফিস ধ্বনি,
ভুতুড়ে জাহাজ ভেসে চলে যায়।

চারিদিকে চাই শুনে সে আওয়াজ!
বুকের পাত্র থেকে ভয় আজ
শুষে নিতে চায় প্রাণের তরল;
নিভে আসে তারা, রাত্রি গভীর,
আলো পড়ে মুখে হালের মাঝির
পাল থেকে ঝরে শিশিরের জল।
অবশেষে ওঠে পুব সীমানায়
শিং-অলা চাঁদ, নীচের কোনায়
সঙ্গী একটি তারা উজ্জ্বল।

সময় ছিলনা বিলাপ শ্বাসের
গুঙিয়ে ওঠার, পিশাচী ব্যথায়,
তাকাল সবাই, এক এক করে
দিল অভিশাপ চোখের ভাষায়।

দশ কুড়ি সেই জোয়ান মাঝির
শুনিনি গোঙানি, বিলাপ শব্দ,
মাটিতে সজোরে এক এক করে
ঢলে পড়ে দেহ। জীবন স্তব্ধ।

আত্মারা দেহ ছেড়ে ফেলে দিয়ে
যায় মঙ্গললোকে কি আঁধারে,
প্রতিটি আত্মা, আমার ধনুর
শব্দের মতো মৃদু টংকারে।"

৪

" ভয় করে তোকে, ওরে বুড়ো মাঝি!
প্যাকাটির মতো হাত দেখে ভয়!
ঢ্যাঙাটে হ্যাংলা বাদামী এ হাত
হাড়বারকরা চর বালুময়।

ভয় করে তোর জ্বলজ্বলে চোখ,
প্যাকাটির মতো হাত কি বাদামী—'

" নির্ভয় হও, হে বরযাত্রী!
শুধু একা বেঁচে রইলাম আমি।

একাকী, একাকী, শুধু আমি একা
একা সমুদ্রে সুবিস্তীর্ণ!
কোনও সাধুজন করেননি কৃপা
আত্মা আমার ব্যথায় দীর্ণ।

সঙ্গীরা সব কত সুন্দর!
তবু তারা মৃত, তারা অচেতন;
বেঁচে আছে কত ঘৃণ্য প্রাণীরা
বেঁচে আছি আমি তাদেরই মতন।

তাকাই সাগরে গলিত দূষিত,
দু চোখ ফেরাব কোন দিকে আর;
তাকাই দূষিত জাহাজের গায়,
দেখি পড়ে আছে শব সারে সার।

তাকাই আকাশে, ভাবি তাঁকে ডাকি;
প্রার্থনা থাকে অনুচ্চারিত,
অস্ফুট পাপ ধ্বনি শুনি কানে,
হৃদয় শুষ্ক পাষাণ পীড়িত।

চোখ বুজি আমি। বুজে রাখি চোখ,
আঁখি তারা কাঁপে নাড়ির মতন;
সাগর আকাশ, আকাশ সাগর,
বোঝার মতন চোখের ওপর,
নীচে পড়ে আছে শবদেহগণ।

স্বেদজল ঝরে। সেই দেহ তাতে
পচেনা, গলেনা সেই শবরাশি
যে-চাহনি নিয়ে মরেছিল তারা
সে-চাওয়া এখনও চোখে অবিনাশী।

অনাথ শিশুর অভিশাপে হয়
স্বর্গবাসীরও নরকগমন;
আর তার চেয়ে আরো ভয়াবহ
যে-শাপ ঝলসে মৃতের নয়ন;
সাতদিন সাতরাত ধরে দেখি
তবুও আমার হল না মরণ।

আকাশে অথির চন্দ্রমা ওঠে,
কোন খানে নেই ক্ষান্তি আকাশে:
ধীরে ধীরে ওঠে ক্রমশ শূন্যে
একটি কি দুটি তারা তার পাশে।

গুমোট সাগরে বিকৃত জ্যোৎস্না
যেন দীতাস্তে ছড়ানো তুষার,
সেখানে তরীর সুদীর্ঘ ছায়া
জ্বলে সারারাত জলভরা মায়া
শান্ত, উগ্র রক্ত আভার।

তরীর ছায়ার পটভূমিকায়
চেয়ে দেখি যত জল-ভুজঙ্গ:
ঘোরে গোল হয়ে শুভ্র দীপ্ত,
তাদের গতিতে ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত
ধূসর মায়াবী আলোক-ভঙ্গ।

দেখেছি তাদের আংরাখা নীল
ঘন মসৃণ শ্যামল বর্ণ
কালো চিক্কণ, তারা সীতরায়
কুণ্ডলাকারে, জলে ঝলসায়
প্রতি আবর্তে অগ্নিস্বর্ণ



হে সুখী, প্রাণীরা, তোমাদের রূপ
এ কী অপরূপ। হঠাৎ হৃদয়
হল উচ্ছল করুণা ধারায়
অজান্তে বলি, সব সুখী হও।
আজ নিশ্চয় বিধাতা সদয়
অজান্তে বলি, সব সুখী হও।

তখন মুখেতে এল প্রার্থনা,
লঘু হয়ে এল কণ্ঠের তলে
খসে পড়ে যায় অ্যালবেটুস
শীশের মতন, সমুদ্র জলে।

৫

ওগো ঘুম, হায় সে যে কী মধুর
মেরু হতে মেরু আদরের ধন।
জয়তু জননী, মা মেরী আমার!
মধুর নিদ্রা তাঁরই উপহার,
পূর্ণ করল আজ প্রাণমন।

অকেজো পাত্রগুলো এতদিন
তরীর ওপর ছিল খালি পড়ে,
স্বপ্নেতে দেখি ভরেছে শিশিরে,
ঘুম ভেঙে দেখি ঝরে, জল ঝরে।

আর্দ্র অধর, কণ্ঠ শীতল
সারা পরিধান সিক্ত আমার,
স্বপ্নে করেছি পান নিশ্চিত
তবুও শরীরে নেশা পিপাসার।

চলি ফিরি, মনে হয় না এ দেহ
নিজের, এতোই লঘুভার হায়,
মরে গিয়ে যেন ঘুমের ভিতরে
আমি পরিণত পুণ্যাত্মায়।

শুনতে পেলাম বায়ু গর্জন
যদিও নিকটে এলনা সে ঝড়,
জাহাজের পাল কাঁপে সে শব্দে
শীর্ণ, শুষ্ক পাল জর্জর।

হঠাৎ শুনো ছাড়া পেল হাওয়া
হাজার অগ্নিপতাকা উজল,
চঞ্চল তারা চারিদিক ছুটে
এদিকে ওদিকে মরে মাথা কুটে
নাচে মাঝখানে ক্ষীণ তারা দল।

হাওয়া গর্জায়, আরো আরো জোর
কাঁপে পাল যেন লতা অসহায়
কালো মেঘ থেকে বাদল অঝোর
ঝরে, একপাশে চাঁদ দেখা যায়।

ভাগ হয়ে যায় ঘন কালো মেঘ
জেগে থাকে চাঁদ সে-মেঘের ধার,
শিলা উদ্ভিত জলের মতন
ঝলে দামিনীর রেখা কম্পন
নদী প্রশস্ত, খাড়া দুই পার।

সেই ঝোড়ো হাওয়া এলনা নিকটে,
তবুও জাহাজ নড়ে, ভেসে যায়;
বিদ্যুৎ আর জ্যোৎস্নার নীচে
শবদেহগুলি হঠাৎ গোঙায়।

গোঙায়, শিহরে, উঠেও দাঁড়ায়
নির্বাক, স্থির পঙ্গু চোখের,
স্বপ্ন হলেও অবাক হতাম
মৃতদেহ যদি প্রাণ পায় ফের।

মাঝি বসে হালে এগোয় জাহাজ
যদিও বায়ুর নেই চলাচল;
চিরাভ্যস্ত জায়গায় বসে
টানে দড়াদড়ি, কাজে চঞ্চল
যন্ত্রের মতো তারা নাড়ে হাত
আমরা নারকী নাবিকের দল।

পাশেই দাঁড়িয়ে ভাইপো আমার
তার দেহে লাগে আমার শরীর,

দুই জনে করি এক সাথে কাজ
তবু সে রইল নির্বাক স্থির।"

" ভয় করে তোকে, ওরে বুড়ো মাঝি!"
" হে বরযাত্রী, হও নির্ভয়
যারা মরেছিল সেদিন বাথায়
ফিরে আসেনিকো তারা পুনরায়,
এরা তো আত্মা মঙ্গলময়:

সেই হল ভোর — ফেলে দিল দাঁড়
মাস্তুল ঘিরে জড়ো হল সব;
মুখ থেকে ধীরে নির্গত হয়ে
দেহ ছেড়ে যায় সুমধুর রব।

ঘুরে ঘুরে ওড়ে মধুধ্বনি দূরে
সূর্যের দিকে হল উড্ডীন;
ফের ফেরে ধীরে, কখনও ভিন্ন
কখনও বা এক অন্যে নিলীন।

কখনও আকাশ থেকে ঝরে কৃপা
ভোরের পাখির শুনলাম সুর;
কখনও ছোট্ট পাখিদের দল
ভরল আকাশ, সমুদ্র জল
তাদের কাকলী কূজনে মধুর।

এই মনে হয় সুর সমাহার
এই মনে হয় নিসঙ্গ বাঁশি
এই যেন দেবদূতের কণ্ঠ
আকাশকে করে মৌন উদাসী।

ক্রমে থামে সুর, তবু পাল থেকে
আধিপ্রহর ওঠে মৃদুধ্বনি,
যেন বৈশাখে পাতা দিয়ে ঘেরা
কোনও পার্বতী ক্ষিপ্রা তটিনী,
ঘুম বিছুল কাননের কানে
সারারাত গায় সে কলভাষিনী।

আধিপ্রহর তরী বাই ধীরে
তবু নিঃশ্বাস ফেলে না পবন
ধীরে তরী বয় সাবলীল গতি
কাছে থেকে দূরে অগ্রসরণ।

হালের নীচের ন-বাঁও গভীর
থেকে সরে গেল সেই অশরীর
কুয়াশা-তুষার দেশের সে প্রেত
যেই করেছিল চালনা তরীর।
ঠিক মাঝদিন পাল গতিহীন
জাহাজও দাঁড়ায় সমুদ্রে থির।

সূর্য দাঁড়াল ঠিক মাস্তুলে
জাহাজের গতি করল বন্ধ:
তবু মুহূর্তে হল চঞ্চল
ক্ষীণ গতিবেগ মন্দ ছন্দ
যেটুকু এগোয় সেটুকু পেছোয়
ক্ষীণ গতিবেগ মন্দ ছন্দ।

তারপর তরী সহসা তীব্র
গতি পায় কোনও অঙ্কের মতো:
মাথায় রক্ত উঠে গেল দ্রুত
পড়লাম নীচে মূর্ছা আহত।

কতটা সময় সেই মূর্ছায়
ছিলাম জানিনা, সে অবান্তর;
যখন আবার এল জ্ঞান ফিরে
শুনলাম যেন মনের গভীরে
আকাশে দ্বৈত কণ্ঠের স্বর।

'এ কি সেই?' বলে একটি কণ্ঠ
'খ্রীশ্তর শপথ এ কি সেই জন?
এরই ক্রুর ধনু সুকুমারতনু
অ্যালবেট্রস করেছে নিধন?

কুয়াশা তুষারঢাকা দেশে থাকে
যে প্রেত, এ পাখি প্রিয় ছিল তার,
আর তার প্রিয় ছিল এই লোক —
সে প্রিয় করল তাকে সংহার।'



আরেকটি স্বর আরো সুকোমল
এত মৃদু যেন মাধবী গাঢ়
বলে, 'এই লোকে করেছে পাপের
প্রায়শ্চিত্ত, করবে আরো।'

৬

প্রথম স্বর

"'বলো তুমি বলো, বলো পুনরায়
তোমার মধুর কণ্ঠে আবার, —
কী করে তরনী চলে এত দ্রুত?
কী করছে এই মহাপারাবার?'

দ্বিতীয় স্বর

'প্রভুর সামনে দাসযথা নত
সমুদ্রে আর নেই কোন ঝড়
বিশাল দীপ্ত আঁখি নিবদ্ধ
এখন আকাশে চাঁদের ওপর।

পথের হদিশ সেই তাকে দেয়
আসুক সুখ বা বিপদ আসুক
দ্যাখো ভাই দ্যাখো, কেমন কোমল
চোখে চাঁদ দ্যাখে মানবের মুখ।'

প্রথম স্বর

'কিন্তু কী করে দ্রুত যায় তরী
কোনও হাওয়া নেই, নেই তরঙ্গ?'

দ্বিতীয় স্বর

'বাতাসের পথ সামনে রুদ্ধ
পেছন থেকেও বাতাস বন্ধ।

ওঠো ভাই ওঠো, শুনোতে আরো
তা না হলে হয়ে যাবে বিলম্ব
জাহাজ চলবে অতি ধীরে ধীরে
ভাঙবে যখন মাঝির স্তম্ভ।'

জেগে উঠে দেখি চলেছে জাহাজ
যেমন স্নিগ্ধ দিনে ভাসমান;
শান্ত রাত্রি, ঊর্ধ্বে চন্দ্র,
মৃতেরা তরীতে দণ্ডায়মান।

মৃতেরা সকলে জাহাজের ছাদে,
শবাগার হলে মানাত ভাল
পাথর-কঠিন চোখে চেয়ে আছে
চোখে স্থলে ওঠে জ্যোৎস্নার আলো।

যে-ব্যথা যে-শাপ নিয়ে মরেছিল
চোখ থেকে তার নেই অবসান,
পারিনা ফেরাতে চোখ থেকে চোখ,
পারিনা করতে তাঁর নামগান।

তারপর ঘোর কেটে যেতে ফের
দেখি সম্মুখে শ্যামল সাগর,
তাকাই সুদূর, সামান্য ক্ষণ
চেয়ে থাকি, বেশি দেখতেও ডর।

যেমন একটি লোক একা পথে
হাঁটে আতঙ্কে, হাঁটে শঙ্কায়
ফের পিছু ফিরে আবার সে হাঁটে
আর কিছুতেই ফিরে না তাকায়,
সে জানে ভীষণ এক শয়তান
তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধায়।

কিন্তু হঠাৎ এল এক হাওয়া
গতি নেই, নেই শব্দও তায়,
তার পথ-রেখা সমুদ্রে নয়,
নয় ছায়াতে বা ঊর্মিমালায়।

ওড়ে কেশরাশি, গালে লাগে ছোঁওয়া
যেন ফাল্গুনী-মাঠের হাওয়ায়
ভয়ের সঙ্গে মেশে অদ্ভুত
তবু মনে হয় স্বাগত জানায়।

দ্রুত, অতি দ্রুত ভেসে চলে তরী
যদিও সে চলে নম্র অলস
মধুর মধুর ধীর বায়ু বয়
আমি একা পাই পবন-পরশ।

কী সুখ স্বপ্ন? সত্যই এ কী!
দেখি বাতিঘর, দেখি চূড়া তার,
ওই যে পাহাড়? এই সে গীর্জা?
এই কি আমার, স্বদেশ আমার?

বন্দরে ভেসে যাই স্রোতটানে
প্রার্থনা করি ক্রন্দন ভরে;
ওগো ঈশ্বর, রাখো জাগরিত
অথবা নিদ্রা দাও চিরতরে।

স্বচ্ছ কাচের মতো নির্মল
সুবিন্যস্ত সে উপসাগর,
জলে চন্দ্রের পড়েছে রশ্মি
শশাঙ্ক ছায়া পড়ে তার পর।

উজ্জ্বল গিরি পাহাড়ের গায়
ঝলমল করে গীর্জার শির
জ্যোৎস্না নেমেছে মন্থর পায়
বাতাস-দিশারী চক্রও স্থির।

নীরব আলোয় শুভ্র সাগর
তবু উঠে আসে তার বুক থেকে
নানান আকার, কত সব ছায়া
কারণ কোমল রাঙা রঙ মেখে।

গলুই-র থেকে একটু দূরেই
রাঙা ছায়াগুলি দণ্ডায়মান
ছাদের দিকেতে চোখ ফেরাতেই
এ কি দেখলাম; হায় ভগবান।

পড়ে আছে শব স্তব্ধ নীরব,
পাশে তার ক্রশ, কী পুণ্যময়,
প্রত্যেক শবে এক দেবদূত
চারিদিকে তার জ্যোতির্বলয়।

জানাল বিদায় এক এক করে;
সে এক দৃশ্য, দিব্য কান্ত;
তারা যেন সব তীরের দিশারী
আলোকস্তম্ভ, স্নিগ্ধ, শান্ত।

জানাল বিদায় করকম্পনে
শব্দবিহীন, কোনও কথা নয়,
কোনও কথা নয়, তবু সে-মৌন
গানের মতন ভরল হৃদয়।

অচিরে দাঁড়ের ধ্বনি এল কানে
শুনি চালকের হর্ষোচ্ছ্বাস,
অনিচ্ছাতেই ফেরালাম মুখ
দেখা দিল দূরে তরীর আভাস।

চালক এবং তার সন্তান
ক্রমশই করে দ্রুত আগমন
ওগো প্রভু আজ এ সুখ আমার
করতে পারেনা মৃত্যুরা হরণ।

আরো একজন দেখি, শুনি তাঁর
কণ্ঠের স্বর, ব্রত লোকহিত,
উদাত্ত স্বরে বনের ভিতরে
এই সাধু গান পূজা সংগীত;
তিনি ত্রাণ, তিনি মুছিয়ে দেবেন
অ্যালবেট্রস পাখির শোণিত।

৭

এ সাধু থাকেন বনের ভিতরে
যে-বন মিশেছে সাগর বেলাতে,
চড়ায় খেলান সুরময় গলা,
তাঁর ভাল লাগে বসে কথা বলা
দূরদেশ-ফেরা-নাবিকের সাথে।

ত্রিসন্ধ্যা তিনি হন নতজানু
তাঁর আছে এক পীবর কোমল
শৈবালাসন, তাতে আছে ঢাকা
প্রাচীন জীর্ণ এক পদতল।

তরী এল কাছে। শোনা যায় কথা,
ভাবি কী ব্যাপার, এ কী অদ্ভুত!
কোথা গেল সব কত সুন্দর
একটু আগের এত আলো-দূত।



'কী আশ্চর্য,' বলেন সে সাধু,
আমাদের ডাকে নেই উত্তর,
বেঁকে যাওয়া কাঠ, দ্যাখো পালগুলো
কী জীর্ণ আর কত জর্জর;
এই বনভূমে এমন ভীষণ
শুধু একবারই দৃষ্টিগোচর।

পাতার বাদামী কঙ্কালগুলি
যখন নদীর ধার ছুঁয়ে যায়
যখন আইভি তুষারেতে ঢাকে
নেকড়েকে দেখে শিশু পাঁচা ডাকে
নিজের শাবক যে-নেকড়ে খায়।"

চালক এবার দেয় উত্তর
'হে প্রভু, এ এক পিশাচী দশা',
'ভয় করে'।
'তুমি এগোও এগোও',
সন্ন্যাসী তাকে বলে সহাস্য।

নৌকো এগোয় জাহাজের কাছে,
আমি নির্বাক, নেই স্পন্দন;
সে-নৌকো এল জাহাজের নীচে
শোনা গেল এক শব্দ ভীষণ।

জলের তলায় ওঠে তোলপাড়,
ক্রমশ প্রবল ক্রমশ ভীষণ;
কাঁপল জাহাজ, উথাল সাগর
জাহাজ ডুবল শিশের মতন।

স্তম্ভিত আমি, শব্দ ভীষণ;
আকাশ-সাগর শব্দে কাঁপায়;
সাতদিন-ডোবা প্রাণীর মতন
এ দেহ সাগরে ভাসে পুনরায়;
স্বপ্নের মতো ক্ষিপ্র গমন
দেখি আমি ফের শুয়ে নৌকায়।

ঘূর্ণাবর্তে ডোবে সে জাহাজ
পাক খেয়ে খেয়ে সেখানে ঘোরে,
সব স্থির আর, কেবল পাহাড়
সেই শব্দের ঘোষণা করে।

আমার অধর কাঁপল, চালক
আর্তস্বরে পড়ল ভূতল;
প্রার্থনা দীরে করলেন বসে
সন্ন্যাসী তুলে নয়ন যুগল।

আমি বসি দাঁড়ে, চালকের ছেলে——
ইতিমধ্যে সে উন্মাদ প্রায়——
হাসে খলখল সারাটা সময়
আঁখিতারা নাচে চঞ্চলতায়
হা-হা করে হাসে, বলে সে, 'সাবাস,
শয়তানটাও দেখি দাঁড় বায়।'

এইবার আমি এসেছি স্বদেশে
দাঁড়াই ওপরে শক্ত মাটির;
নৌকোর থেকে নেমে সন্ন্যাসী
কোনক্রমে তিনি দাঁড়ালেন স্থির।

'বাঁচাও, আমায় বাঁচাও হে প্রভু'
কুঞ্চিত হল ভ্রূযুগল তাঁর,
বললেন তিনি, "বল তাড়াতাড়ি
কে তুমি, কী পাপ হয়েছে তোমার?"

সঙ্গে সঙ্গে হল কুঞ্চিত
এই দেহ এক ব্যথায় অধীর,
আমার কাহিনী শোনাবার পর
বেদনামুক্ত হল এ শরীর।

সেই থেকে কবে হঠাৎ কখন
ফিরে ফিরে আসে সে তীব্র ব্যথা,
জ্বলে পুড়ে যায় সারাটা শরীর
যাবৎ না শেষ এ পিশাচী কথা।

রাত্রির মতো যাই দেশে দেশে,
মোহিনী আমার কথা-কুশলতা,

জনতার ভিড়ে ঠিক তাকে চিনি,
যে শুনবে বসে আমার কাহিনী,
তাকেই শোনাই এই নীতি কথা।

দ্বার ভেদ করে ওঠে কোলাহল
বরযাত্রীরা মিলেছে হোথায়,
কুঞ্জতলীতে কন্যাকে ঘিরে
সখীরা এখন সব গান গায়,
শোনো গীর্জার সান্ধ্য ঘন্টা
পূজা নিবেদন ডাকে সে আমায়।

বন্ধু, এ প্রাণ বহুদিন ছিল
বিশাল, বিশাল সাগরে একা;
কী নিঃসঙ্গ, সেখানে কখনও
ঈশ্বরও বুঝি দেননা দ্যাখা।

বিয়ের ভোজের চেয়েও মধুর
আমার নিকটে সুমধুর অতি,
গীর্জার পথে এক সাথে হাঁটা
সঙ্গে বন্ধু মঙ্গলমতি—

গীর্জার পথে এক সাথে হাঁটা
এক সাথে বসে উপাসনা করা,

পিতার সামনে সব নত শির
বৃদ্ধ ও শিশু, সখা ও সখীর
তরুণ-তরুণী আনন্দভরা।

বিদায়, বিদায়, শুধু বলে যাই,
বিবাহসভার অতিথি তোমায়,
তারই পূজা পূজা, যার আছে প্রেম
নর, পশু আর বিহঙ্গমায়।

তারই পূজা সেরা যে ভালবেসেছে
মহৎ, ক্ষুদ্র, সকল সৃষ্টি;
প্রভু প্রেমময় সবই তাঁর গড়া
সকলেরই প্রতি প্রেমের দৃষ্টি।"

চলে গেল মাঝি, উজ্জ্বল আঁখি
শ্মশ্রু ধূসর বয়সের ভারে,
বরের বাড়ির দুয়ার থেকেই
সে বরযাত্রী ফিরল এবারে।

লুপ্তবুদ্ধি সে বরযাত্রী
ফিরে এল ঘরে স্তব্ধ, বিমূঢ়।
রাত শেষে যেন নতুন জন্ম
বিষণ্ণতর, জ্ঞানী আরও গূঢ়।

---

# কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ? অথবা একটি মহনীয় চ্যালেঞ্জ?

শ্রীনিরপেক্ষ

স্বাধীনতার উষালগ্নে গাঁটছড়ায় বাঁধা হয়েছিল দু'জনকে। সেই গাঁটছড়াটি ইতিমধ্যে বহুবার স্খলিত হওয়ার উপক্রম ঘটেছে। কীটদষ্ট, ছিন্নসূত্র তার চেহারা দেখলে মন বিষণ্ণ হয়। যে-দু'জনকে বাঁধা হয়েছিল অন্তরের সাথী হিসাবে, তাদের একে আজ অপরের ভাগ্যের অভিশাপ।

গত ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তির উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হল। সুতরাং কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং আবেগবর্জিত খতিয়ান হওয়া দরকার। একথা যেমন উপলব্ধি করি, তেমনই আরও একটি বিষয় অবশ্যই অনস্বীকার্য। এখন-মিত্র-তখন-শত্রু এই সম্পর্কের ইতিহাসটিকে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ধাবমান কাল বিভিন্ন সমস্যার প্রলেপ—বারে বরে বিভিন্ন স্তরে—এমনভাবে রেখে গেছে যে, সত্যই যদি কাশ্মীরসঙ্কটের বাস্তব পর্যালোচনা করতে হয়, তাহলে শুধু ঐতিহাসিক বিবরণের তালিকা বা ধারাবাহিকতার উপরে আতস কাঁচ ধরলেই চলবে না। শুধু যদি ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকেই সঙ্কটটির পরিমাপ ও পর্যালোচনা করা হয়—আপাতত বর্তমান লেখকের তাই উদ্দেশ্য তাহলে একটি মৌলিক এবং তর্কসাপেক্ষ প্রশ্নের উপর এই প্রবন্ধটিকে স্থাপিত করতে হবে।

প্রশ্নটি এইরূপ। আমি যাকে উভয়পক্ষের অভিশাপ বলছি, তা কি সত্য? আমার সমবয়স্ক বেশিরভাগ ভারতীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক কাশ্মীর সঙ্কটকে অভিশাপ মনে করেন না। দুর্গমগিরিসঙ্কুল এই সম্পর্কটি তাঁদের কাছে একটি মহনীয় চ্যালেঞ্জ।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের অবমাননাকর সিদ্ধান্ত যখন কংগ্রেস মেনে নেয়, সেই অর্দ্ধ নিরানন্দ রাত্রে আমাদের নেতারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, দেশ অখন্ড না থাকুক, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে—অখণ্ড তো বটেই—অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মাত্র একাত্তর রজনী অতিবাহিত হতে না হতেই সেই সঙ্কল্পের সঙ্গে পথের সাথী হিসাবে ২৬ অক্টোবর যোগ দিল কাশ্মীর। যোগদানের মুহূর্তেই রক্তপাত, কামানের গর্জন, বিদেশাগত হানাদারের বিকট উল্লাস শোনা গিয়েছিল, কিন্তু গাঁটছড়া বাঁধার—কাশ্মীরে কেউ কেউ বলবেন, রাখী বন্ধনের—ঘটনাটিকে ভারত আবাহন করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শবাদের প্রতীক হিসাবে। শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরও সে মহনীয় প্রতীক গ্রহণ করেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ আন্তরিকতার দ্বারা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দীর্ঘজীবী হয়নি। ইতিহাস তার ধারাবাহিক বিবর্তনের কক্ষপথ থেকে বার বার বিচ্যুত হয়ে গেছে। ১৯৪৯ সনে ভারতীয় সংবিধান সভায় ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ নামে যে সঙ্কল্পটি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, তার উপরে বহু আক্রমণ, অনেক রক্ত, অনেক কলুষযুক্ত ষড়যন্ত্রের নিঃশব্দ বারিপাত ঘটেছে। সুতরাং ভারতের বিবেকসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে এই লেখক মনে করে যে, "মহনীয় চ্যালেঞ্জ, না তামসিক অভিশাপ," এই বিতর্কটি অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত। কাশ্মীর আমাদের গলায় কন্টকের মালা, অথবা আদর্শের সমুচ্চ প্রতীক—এই প্রশ্নে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত অবশ্যই দ্বিতীয় বক্তব্যের সমর্থক। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দীর এই সর্বভারতীয় 'কন্‌সেন্‌সাস' আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার বৃহত্তর দিগন্তকে আবৃত করে রেখেছে কিনা এবং কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাসকেই এত সুদীর্ঘ মেয়াদে তর্কাতীত রাখা সম্ভব কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন বর্তমান প্রবন্ধের মুখবন্ধে রাখা হল।

কেননা, যে-মানুষদের ভবিষ্যৎ উপলক্ষে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, সেই কাশ্মীর উপত্যকা, লাডাক এবং জম্মুর অধিবাসীদের রাজনৈতিক অভীপ্সা, জীবন-প্রত্যাশা এবং সংস্কারবোধ ইতিমধ্যে নাটকের অধ্যায় পরিবর্তনের মতো দ্রুতবেগে বিভিন্নমুখী রূপ নিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের নাগরিকদের বৈষয়িক চিন্তা এবং তৎসহ জীবন-প্রত্যাশারও বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। 'ডেমোগ্রাফি', ভৌগোলিক শক্তি কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশ — অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যেমন কাশ্মীর, তেমনই ভারতবর্ষেও এই বিস্ফোরক উপাদানগুলি স্থবির হয়ে নেই। পালটায়নি কেবল দিল্লির সরকারের অভিমত এবং লোকসভার নির্দেশ। ইতিহাসের সমস্ত অমোঘ এবং পরিবর্তনশীল নির্দেশ উপেক্ষা করে, অচলায়তনের মতো আমাদের কাশ্মীর চিন্তাধারা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জায়গায় যেখানে ছিল সে উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। এই অবিশ্বাস্য এবং ক্ষতিকর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আমার প্রবন্ধ।

প্রারম্ভেই কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যুগান্তিক চিহ্নের বর্ণনা দেওয়া যেত, যেমন 'নেহরুর অধ্যায়', 'ইন্দিরার অধ্যায়' 'নাবিকবিহীন অধ্যায়' ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ রচনায় আমার উৎসাহ স্বভাবতই কম। পর্যালোচনার সুবিধার্থে এই পরিবর্তনশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটটিকে — খানিকটা স্থূলভাবেই — আমি প্রধান সাতটি প্রতিকৃতিতে, সংক্ষেপে চিত্রিত করব। তার মধ্যে উল্লেখ থাকবে যে, এই প্রবন্ধের পরবর্তী কিস্তি কিংবা কিস্তিগুলিতে কোন কোন প্রসঙ্গগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার ইচ্ছা রাখি।

প্রথম ॥ কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করার জন্য ১৯৪৭ সনের ২৬ অক্টোবর ভারত সরকার এবং কাশ্মীরের মহারাজার মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার যাথার্থ্য এবং নৈতিক ভিত্তি নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিবাদী যুক্তি এবং তার পিছনে মদত দিতে পারে এইরূপ কিছু আন্তর্জাতিক অভিমতও বিদ্যমান। উপরন্তু এই জটিল আইনগত প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অন্তত দুইটি প্রকাণ্ড ভুল — একটিকে বলা যায় ষ্ট্রাটেজিক ত্রুটি, অন্যটি কূটনৈতিক কৌশলের প্রমাদ। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ধূলিমলিন পুরাতন সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাগুলি ঘাঁটলে এ বিষয়ে যে কোনও গবেষকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হতে পারে। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট আইনসঙ্গত হলেও জনমত সঙ্গত নয়, এই আশঙ্কার, কিংবা সৎবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, কিংবা কূটনৈতিক চাপে পড়ে, কী কারণে মহামতি ভারত সরকার কাশ্মীর প্রসঙ্গটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্থাপন করলেন এবং ১৯৪৮ সনের নববর্ষে কী যুক্তির বশবর্তী হয়ে আমরা স্বেচ্ছায় বললাম যে, পাকিস্তানি হানাদরেরা অপসৃত হলে, ভারত কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবে — এই প্রশ্নটি কূটনৈতিক এবং আইনের খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়িত এবং সম্ভবত "সঙ্কটের উৎস সন্ধানে" নামক প্রবন্ধ রচনা করতে গেলে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান লেখকের এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা অপেক্ষাকৃত স্তিমিত।

দ্বিতীয় ॥ ভৌগোলিক এবং সামরিক নিরাপত্তার কারণে কাশ্মীর যে চিরকালই পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের উদ্বেগ এবং উৎসাহেরও কেন্দ্র হয়ে থাকবে — যুদ্ধের বারুদ জোগাতেও পারে — এবিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নেই। কাশ্মীর যে-দিকেই যাক, সামরিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার খাতিরে ওই রাজ্যের ৮৪ বর্গমাইল ভূখণ্ড ভবিষ্যতেও আমাদের বংশধরদের চিন্তান্বিত রাখবে। যত দিন যাবে এই দুইটি চিন্তার গুরুত্ব বাড়বেই। সোভিয়েত ভগ্নস্তূপ থেকে পশ্চিম এশিয়ায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্টগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের উত্থানের ফলে ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের "জিওপলিটিকাল" গুরুত্ব বদলে গেছে ( সে-প্রসঙ্গ একটু পরেই আবার আসছে)। কিন্তু সব মিলিয়ে এইখানে একটি গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়ে রয়েছে। সেই বিষয়টিও অন্য কোনও প্রবন্ধকারের জন্য তোলা রইল।

তৃতীয় ॥ কাশ্মীর রাজ্যের ৩১ লক্ষ নরনারী আমাদের জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জীবন্ত সাক্ষী, এই বিশ্বাস নেহরুর আমলের কংগ্রেস পার্টি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তাধারায় বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু এবিষয়ে দুইটি প্রশ্ন একান্তই ন্যায়সঙ্গত। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির জন্য এখনও কি কাশ্মীরকে আমাদের গাঁটছড়ায় বেঁধে রাখতে হবে, অন্য প্রমাণ কি উপস্থিত নয়, কিংবা উপস্থিত হলেও গ্রাহ্য নয়? অথবা, দ্বিতীয় প্রশ্ন : গত উনপঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস কি এই আদর্শবাদেরই প্রমাণ দিচ্ছে, অথবা পরিবর্তে — চিনের যেমন তিব্বত — কাশ্মীরও আমাদের আধিপত্যবাদের লজ্জাজনক সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে? (মুখবন্ধে অন্যভাষায় এই তর্কসাপেক্ষ প্রশ্নটিই উপস্থাপিত প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি।) বর্তমান আলোচনায় এই বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা রাখি।

চতুর্থ ॥ একাদিক্রমে উনপঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীরে ব্যবহার করা হয়েছে — এক এক সময় এক এক ভাবে। কোনও কোনও পর্যায়ে এই সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণ রণাঙ্গনে নামতে হয়েছে। কখনও কখনও তাকে ব্যবহার করা হয়েছে অন্তর্ঘাত নিবারণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কার্যত ওই কর্তব্য পালনে অনিবার্যভাবেই তাকে নিরীহ, নির্দলীয় নরনারীর উপরেও চড়াও হতে হয়েছে। নিরস্ত্র গৃহস্থের রক্তে তার হাত কলঙ্কিত হয়েছে। "রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার" প্রয়োজনে তার নিক্ষিপ্ত গুলি, প্রকৃতপক্ষে, বহু ক্ষেত্রে বিদ্ধ করেছে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আত্মাকে।



এই বিষণ্ণ স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি বৃহত্তর প্রশ্ন। ভারতসংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড থেকে যারাই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাদের উপরে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কতখানি সমরবল প্রয়োগ করবে, আদৌ করবে কিনা, এবং যতবার যত দৃঢ়তার সঙ্গে করতে যাবে ততবারই ভারতবর্ষের নৈতিক গণচেতনা আহত হবে কিনা, এই প্রশ্নাবলীর কোনও গভীর বিশ্লেষণ আমারা ভালভাবে আরম্ভই করিনি। সংবিধানে অঙ্কিত ভারতের মানচিত্র কি অলঙ্ঘ্যনীয়? এবং পরিবর্তনশীল জনমতের বিচারের উর্দ্ধে? এই প্রসঙ্গটি বর্তমান নিবন্ধের অন্যতম মূল বিষয়।

পঞ্চম ॥ কেন্দ্রীয় সরকার এবং লোকসভা কাশ্মীর রাজ্যের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে যে পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তি এবং দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যতার পরিচয় দিয়েছে তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই একটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বৎসরেও আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞানোদয় হয়ইনি, স্বল্পমেয়াদি ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে গণতান্ত্রিক উদারতার নীতি সংঘর্ষে আসছে বারেবারেই ফলে ভারতের রাষ্ট্রনীতিও পরস্পরবিরোধী আচরণে বাধ্য হচ্ছে। প্রমাণ ঘটনা পরম্পরায়।

মহারাজার সঙ্গে ১৯৪৭ সনের চুক্তিটিতে কার্যত কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ওই অন্তর্ভুক্তি যথার্থরূপে গণতান্ত্রিক হল কিনা এই সন্দেহবশত আমরাই শেখ আবদুল্লার সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি তৈরি করলাম ১৯৫২ সনের ২৪ জুলাই। তাতে কাশ্মীর রাজ্যকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হল। মাত্র চার বছর পরেই সেই সিদ্ধান্তও আমূল পরিবর্তন করা হল এবং এবার কাশ্মীর রাজ্য সংবিধান সভার দ্বারা প্রণীত একটি সংবিধান অনুযায়ী "স্বেচ্ছায়" নিজেকে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার ব্যবস্থা রাখল। বলা যায়, ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে কাশ্মীরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঠিক করলেন ১৯৪৭ সনের ২৪ অক্টোবরের চুক্তিটিই উভয়ের পক্ষে শ্রেয়তর।

তাতেও কি নাটকের শেষ হল? ১৯৭২ সনে ২রা জুলাই সইকরা সিমলা চুক্তিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার করলেন যে "জম্মু এবং কাশ্মীরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির" জন্য দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। এঁদের সিমলা চুক্তিতে জম্মু এবং কাশ্মীর সম্বন্ধে বক্তব্যটি মাত্র সাতটি ইংরাজি শব্দে সীমাবদ্ধ (এবং একটি সুবৃহৎ কূটনৈতিক বাক্যের শেষাংশে লিপিবদ্ধ)। কিন্তু পাকিস্তানের মতে তো বটেই, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলেরও অনেকে মনে করেন যে, এই উক্তিটির ফলে কাশ্মীর রাজ্য সংবিধানসভার ১৯৫৬ সনের সিদ্ধান্তটি কার্যত বাতিল হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ ॥ কাশ্মীর সঙ্কটের বিষাক্ত নিশ্বাস যদি ক্রমাগতই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক প্রাতিবেশীত্ব বোধকে দূষিত এবং বিভ্রান্ত না করত, তাহলে এই প্রকাণ্ড উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ কী হত, দুই পক্ষের কেউই ঠাণ্ডা মাথায় তা ভেবে দেখবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। এই দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য ঐক্যমুখী অর্থনৈতিক শক্তি এবং সম্পদ নিহিত আছে। দেশবিভাগের সময় কুয়োর উপরে মাটি চাপা দেওয়ার মতো এই নিহিত শক্তিগুলিকে আমরা মাটি চাপা দিয়েছি। তাদের উন্মোচন এবং প্রসারের সুযোগ দেওয়া হলে, গত পাঁচটি দশকে 'আসিয়ানের' মতো এই উপমহাদেশেও চারটি রাষ্ট্রের মধ্যে নতুন গতিবেগসম্পন্ন অর্থনীতি দেখা দিত কিনা, তাও সম্যক উপলব্ধি করা হয়নি। দাঁড়িপাল্লার একদিকে যদি এই ইতিবাচক এবং মিত্রতাকামী চিন্তাগুলি রাখা হত, তাহলে অন্যদিকে বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্য কতখানি, দুই পক্ষই তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। চল্লিশ-পঞ্চাশের বিকৃত ইতিহাস এই উপমহাদেশকে সেই সুযোগ দেয়নি।

সপ্তম ॥ একেবারে সম্প্রতি, গত অক্টোবরের নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের জনমত একটু স্বস্তি এবং কিছুটা আশার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছে। কেননা, নির্বাচন মোটামুটি নির্বিঘ্নে হল, ন্যাশনাল কনফারেন্স ক্ষমতায় এসেছে, এবং ডাঃ ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সদ্ভাব থাকবে বলেও মনে হচ্ছে। তিনটি কারণই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কি? ডাঃ আবদুল্লা আজ ভারতের প্রতি তুষ্ট। কিন্তু কাল বিমুখ হবেন না, তা কি কেউ হলফ ক'রে বলতে পারে? পিতা এবং সন্তান, দুই আবদুল্লার সঙ্গেই ভারত সরকার এখন-মিত্র-তখন-শত্রুর সুদীর্ঘ ইতিহাস তৈরি করে রেখেছেন। আরও দুইটি কারণ বর্তমান সম্প্রীতির উপর গভীর আশঙ্কার ছায়াপাত করে আছে। কাশ্মীরের পশ্চিমে ইসলামি উগ্রতা তো চিরকালই ছিল। তার আকর্ষণী মতবাদ গত চার পাঁচ বছরে অটোমেটিক কালাস্‌নিকভ বন্দুক কাঁধে নিয়ে প্রকৃত জিহাদের সৈনিক হিসাবে কাশ্মীর উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং প্রায় সমগ্র রাজ্যটিকেই যুদ্ধবন্দির মতো আটক করতে পেরেছে — প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ ভারতীয় সৈনিকের প্রহরাকে উপেক্ষা করে। প্যালেষ্টাইনের 'ইন্তেফাদ' কাশ্মীরের মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে যে সংগ্রামী মন্ত্র এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দিচ্ছে — তার প্রতিষেধক ডাঃ আবদুল্লা, কিংবা ভারত সরকার দিতে পারবেন কি? উপরন্তু কাশ্মীরের উত্তর শিয়রে রাশিয়ার ভগ্নাংশ থেকে উত্থিত ক্ষুদ্র এবং সম্পদশীল রাষ্ট্রগুলি কাশ্মীরকে প্রলুব্ধ করছে নতুন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতার আমন্ত্রণে। সেখান থেকে আসছে

জাতীয় সত্তা আবিষ্কারের নবতম দৃষ্টান্তও। নতুন প্রতিবেশীরা এই দুইটি — বৈষয়িক উন্নয়নের এবং জাতীয় মুক্তির — প্রভাব রপ্তানি করছে উত্তরের দরজা দিয়ে। এই নতুন প্রভাব পাঁচ বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষের ষ্ট্রাটেজিক চিন্তায় স্থান পাওয়ার কোনও কারণ ছিলনা। তৎসত্ত্বেও কাশ্মীরের নবযুগের নরনারীরা ভারতের সঙ্গেই মৈত্রী কামনা দৃঢ় করবেন, এটা কি বাস্তবিক প্রত্যাশা, অথবা আকাশ কুসুম? এই প্রশ্নটি এবং তৎসংলগ্ন দৃষ্টান্তগুলি বিশদভাবে না হলেও এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে, — "কাশ্মীরের দূরবর্তী ভবিষ্যৎ কী?" শীর্ষক পরিশিষ্টে আলোচিত হবে।

কিন্তু তার পূর্বে, বর্তমান সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধেই একটি আত্মজিজ্ঞাসা দরকার। কাশ্মীর সঙ্কটের উল্লিখিত সাতটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকৃতির মধ্যে তিনটি সমস্যাগুচ্ছকে আমি পরবর্তী পর্বে বিশদভাবে আলোচনা করব এবং শেষোক্ত প্রসঙ্গটি পরিশিষ্টে আবার উল্লিখিত হবে, একথা পূর্বেই বলেছি। যে-আত্মজিজ্ঞাসার কথাটি তুললাম, সে ওই সাতটি সমস্যাগুচ্ছের ভিতরে সর্বত্র নিম্নকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কী সেই জিজ্ঞাসা?

যে-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং গণমুক্তির স্বপ্ন এবং কবিতা নিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল, সেই আবেগ এবং আত্মবিশ্বাসের পীঠস্থলে যদি মনে মনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় — অর্থাৎ ওই শুভলগ্নটিকে যদি পুনর্নির্মাণ করা যায় — তাহলে দেখা যাবে, শুধু কাশ্মীর নয়, পাকিস্তানের বৈরিতার সম্ভাবনাও আমাদের মনস্তত্ত্বকে কাবু করতে পারেনি। কেননা, তখন আমাদের প্রকাণ্ড বিশ্বাস ছিল যে ভারত যে-জয়যাত্রা শুরু করেছে তা এমনই অভিনব, তার মধ্যে সাম্য, গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে অনতিকালের মধ্যেই ভারত উপমহাদেশের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ভারত প্রজাতন্ত্রের মাধ্যাকর্ষক শক্তিবলয়ের ভিতরে এসে যাবে। যদি ওই স্বপ্নের অর্দ্ধেকও সফল হত — অর্থাৎ কোরিয়া না হক, মালয়েশিয়ার মতো মাথাপিছু আয় যদি সাধারণ মানুষ অর্জন করতে পারত এবং তৎসহ যদি থাকত উদ্দীপ্ত আইনসভাগুলি থেকে বিচ্ছুরিত গণতন্ত্রের প্রভা — উচ্চকোটির জিডিপির মধ্যে সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তি, তাহলে কি কাশ্মীর স্বেচ্ছায় ভারতের অঙ্গ লগ্ন হতে চাইত না? পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা কি চাইত না অর্থনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা আমাদের সঙ্গে? সুতরাং বিষণ্ণ আত্মজিজ্ঞাসাটির মূলে, আমার মনে হয়, অন্য আরও নানাবিধ কারণ আছে সত্য, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ভারতের অর্থনৈতিক অসাফল্য। সুতরাং কে এই দুর্ভাগার সংসারে যোগ দিতে আসবে?

১৯৯৬ সনের অক্টোবর জম্মু এবং কাশ্মীর উপত্যকায় একটি অস্পষ্ট প্রভাতের নিরানন্দ ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রণক্ষেত্রের সমস্ত চিহ্ন উপেক্ষা করেই ভারতবর্ষ সেখানে সর্বজনীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। সেই ব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা যতটুকু ছিল, দৃশ্যত তার চেয়ে বেশি ছিল জবরদস্তি। আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট হাজার নরনারীর মৃত্যু হয়েছে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে — ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তে, কিংবা ইস্‌লামিক গেরিলাদের আক্রমণে, অথবা সামরিক দুর্ঘটনার ফলে। কাশ্মীর উপত্যকার বিষণ্ণহৃদয় মানুষকে সেই স্মৃতি কতটা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল, তার প্রমাণ ভোটদাতাদের স্বল্পতায়। সৈন্যবাহিনীর চাপাচাপি ও এমনকি জবরদস্তির প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মাত্র শতকরা ত্রিশ, কিংবা বিশ ভাগ ভোটার যদি ভোট দিতে যায়, সেই নির্বাচন কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারে, সে প্রশ্ন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকেরা তো তুলবেনই। বিক্ষিপ্তভাবে, মাত্র আঙ্গুলে গোনা যায় ওই রকম কতকগুলি জেলায় ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের উর্দ্ধে পৌছতে পেরেছিল, সেগুলি ব্যতিক্রম, তা থেকে প্রমাণ হয়না যে কাশ্মীরে বিগত নির্বাচন সুস্থ, কিংবা নির্ভরযোগ্য জনমতের পরিচয় দিয়েছে।

তবে, অপরপক্ষের যুক্তিও অগ্রাহ্য নয়। প্রায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই নির্বাচন উদ্‌যাপিত হয়েছে, অন্তর্ঘাতী শক্তিগুলি এই ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি, অথবা এর সঙ্গে প্রকাশ্যে মোলাকাত করতে চায়নি। সুতরাং ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতারা যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই বলতে পারেন, নির্বাচন ঘটাতে পারাটাই একটা উল্লেখযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ এবং এতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় যে প্রায় সত্তর বৎসরের পুরাতন এই দলটির সূর্যাস্ত এখনও আসন্ন নয়। দ্বিতীয়ত, এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত যে-সরকার কাশ্মীর শাসন করছিল, ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বারা গঠিত সরকার কাশ্মীরিদের কাছে নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বেশি কাম্য। তাছাড়া এই সরকারকে কেন্দ্র করে ধীরে শান্তিকামী, নির্দলীয় সাধারণ মানুষদের আত্মবিশ্বাসও ফিরে আসতে পারে। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে অক্টোবরের নির্বাচন ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করতে বাধ্য। এইজন্যই অস্পষ্ট প্রভাতের উপমাটি প্রয়োগ করেছি। একথা কেউ হলফ করে বলতে পারেনা যে কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তিকামী গৃহস্থ মানুষেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং অপরপক্ষে যুদ্ধবাজ, স্বাতন্ত্র্যকামী এবং পূর্ণ আজাদির পক্ষাবলম্বী মানুষেরাই এখন প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য বারুদেপোড়া আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে এবং স্বল্প কালের জন্যই শান্তির বাতাবরণ অব্যাহত থাকলে, সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অভ্যস্ত ছন্দে ফিরে যেতে চায়। বারুদের গন্ধ মুছে ফেলে সময়। মৃত্যুর স্মৃতিও চিরকাল প্রতিহিংসার বীজ বপন করে না। ফিলিপিন্‌সে সমাজবাদী 'হুক' গেরিলাদের যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে 'পিপল্‌স আর্মির' সংগ্রাম,





গোলাবারুদ, আধুনিক অস্ত্র ইত্যাদি সত্ত্বেও একবার যখন পিছু হঠতে আরম্ভ করল, আর হৃতশক্তি ফিরে আনতে পারল না। ভারতবর্ষে নাগা এবং মিজোরামের বিদ্রোহও এইভাবেই সমাপ্ত, অথবা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কম্বোজ, মালয়েশিয়া এবং পশ্চিমে আয়ারল্যাণ্ডে বিফল বিদ্রোহের আরও সাক্ষ্য উপস্থিত।

গেরিলাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তি যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন ধরেই নেওয়া যায় যে বিদ্রোহী শক্তি-ই শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হতে বাধ্য, যদি রাষ্ট্রশক্তির পিছনে দেশজ জনমত সমবেত এবং সংঘবদ্ধ থাকে। এই কথাটি রোমান্টিক বিপ্লবী এবং আদর্শবাদী গেরিলাদের কিছুতেই পছন্দ হবে না। 'প্যালেষ্টিনিয়ান লিবারেশন আর্মি', কিংবা আয়ারল্যাণ্ডের আই. আর. এ আমাদের এই প্রতিপাদ্যটিকে যুক্তিতে না হোক, গলার জোরে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, জানি। কিন্তু এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে সরকারের পিছনে যদি জনমত দৃঢ় হয়ে থাকে, তাহলে আজকের দিনে দীর্ঘকালব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে বিজয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব। সিংহলে জনমত নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সরকারের সামরিক অভিযানকে ক্রমাগত সমর্থন জানায়নি — দ্বিধা ছিল, আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব ছিল এবং সরকারের ক্ষমতার উপরে আস্থার আবার অভাবও ছিল। তৎসত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার সুদীর্ঘ অন্তর্বিদ্রোহে তামিল গেরিলাদের রণক্লান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। গত এক বৎসরের মধ্যে সেইজন্যই এল-টি-টি-ই ক্রমাগত কতকগুলি প্রকাণ্ড পরাজয়ের মধ্যে এ অবসাদের পরিচয় দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে না বলতে পারলেও একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় যে শীঘ্রই শ্রীলঙ্কার গৃহদাহের আগুন সম্পূর্ণই নির্বাপিত হবে। কেননা ইতিমধ্যেই সে আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

এই বাস্তব সত্যটি হিংসাত্মক বিপ্লবের পরিপন্থী এবং দুঃখের কথা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সহযোগী। এটা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে ভারতের জনমত যদি আগেই অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পড়ে, তাহলে কাশ্মীরের গেরিলারা আগে অবসন্ন বোধ করবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে বহুলাংশে অজ্ঞ এবং বিকৃত সংবাদের ফলে সংশয়গ্রস্ত হলেও সাধারণ মানুষ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাশ্মীরকে জাতীয়তাবোধের প্রতীক বানিয়ে নিয়েছে। কাশ্মীরের গেরিলারা সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় জনমতের মধ্যে অবসাদের সুযোগ নিতে পারবে বলে মনে হয়না।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে ক্লান্ত ভারত স্বচ্ছ, সৎ টেলিভিশনের পর্দায় নিজের সৈনিকদের নৃশংসতার ছবি দেখে আঁৎকে উঠবে, সংবাদপত্রগুলির বিবেক কম্পমান হওয়াতে বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা কাশ্মীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনী শাণিত করবেন এবং দিল্লি, কলকাতা, লখনৌ, আমেদাবাদের ছাত্রেরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্তলিকা দাহ করার জন্য রাস্তায় নেমে আসবে এবং এই প্রচণ্ড আভ্যন্তর বিস্ফোরণ অনিবার্য জেনে ভারত সরকার মাথা হেঁট করে কাশ্মীরের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার গুজরালকে পাঠাবে — এইরূপ একটি চিত্রনাট্য ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে আশা করা অবাস্তব। ঠিক এইরূপ সংলাপই আমেরিকার বাঘা বাঘা জেনারেলদের মুখে চুনকালি দিয়ে সরকারকে বাধ্য করেছে ভিয়েতনামের পরাজয় স্বীকার করতে, ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারকে পাঠিয়েছে শান্তির আম্রপল্লব হাতে প্যারিসে হানয়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে।

একথা অনেক সময়ই আমাদের দেশের রাজনীতিকেরা লক্ষ করতে চাননা যে ভিয়েতনামের যুদ্ধে সামরিক পরাজয়ই আমেরিকার সমুচ্চ বিজয়। এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছে যতটা উত্তর ভিয়েতনামের যোদ্ধারা, ততটাই আমেরিকার জাগ্রত জনমত। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এখন আর খুব দুর্বল নয়। কিন্তু তেমন সবলও নয় যে তথাকথিত জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যকে রুখে দাঁড়াতে পারে। কিংবা বিবেকের প্রশ্নকে সামরিক পরাজয় স্বীকারের চেয়েও বড় করে দেখতে পারে।

পারেনা যে, তারও প্রমাণ কাশ্মীরের পঞ্চাশ বৎসরের বিষণ্ণ কাহিনীতে লেখা আছে। শেখ আবদুল্লাকে আমরা এগার বৎসর বিনা বিচারে জেলে রাখলাম, বাইশ বৎসরের ব্যবধানে দিল্লির সরকার তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করে সেই দলিল স্বহস্তেই ইতিহাসের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল, কিন্তু ভারতবর্ষ কি সেজন্য প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল? গণতন্ত্রকামী, প্রগতিবাদী ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিরা কি উত্তপ্ত 'সমালোচনার' দ্বারা নিজের সরকারকে উদ্ব্যস্ত করেছিলেন, অথবা সরকার-বিরোধিতার দ্বারা নিজেদের বিবেককে সম্মান দেখিয়েছিলেন? দেখাননি। শেখ আবদুল্লাকে শের-ই-কাশ্মীর আখ্যা দিয়ে যৌবনের নেহরু মস্ত বড় সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। কেননা হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে এতে মহম্মদ আলি জিন্নার গালে চপেটাঘাত করা হল। কিন্তু যখন তিনি পিতামহ নেহরু, তখন ১৯৫৩ সনে সুদীর্ঘকালের কমরেড শেখ আবদুল্লার মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে জেলে ভরতে তাঁর আপত্তি হয়নি। নেহরুর এই আচরণ গোটা ভারতবর্ষের লোকের কাছে বিসদৃশ লাগবে, এ আশা করা যায়না। তখনও আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র শাবক মাত্র এবং দেশের অপামার জনতা নেহরুর ভাষায়, চেহারায়, প্রেমে একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু প্রথিতযশা সাংবাদিকের তো অভাব ছিল না দেশে। তাঁরা নীরব থাকলেন কীভাবে?

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে কাশ্মীর সঙ্কটের মীমাংসার পরিপূর্ণ সুযোগ অন্তত পাঁচবার ভারতবর্ষের দরজা থেকে ফিরে গেছে। তার মধ্যে দুইটি এসেছিল শেখ আবদুল্লার

অনলস সংগ্রামের ফসল হিসাবে। এগার বৎসর কারারুদ্ধ থাকার ফলে নেহরু পরিবার এবং কংগ্রেসি সরকার সম্বন্ধে তাঁর জাতক্রোধ হওয়ার কথা, কিন্তু কারামুক্তির দশ বৎসর পর ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শেখ আবদুল্লা ১৯৭৪ সনের নভেম্বর মাসে কাশ্মীর চুক্তি সই করেন এবং চারমাস পরে ১৯৭৫ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলের সমর্থনের ফলে বহুদিন পর আবার কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ১৯৭৭ সনে কংগ্রেস যে সর্বনাশের পথে কাশ্মীরকে ঠেলে দিল, তার মধ্যে ছিল হস্তচ্যুত মুহূর্ত, সংকীর্ণতার মতদ্বৈধ, দিল্লির বাদশাহি চক্রান্ত—এবং আশ্চর্যের বিষয়, ডঃ ফারুখ আবদুল্লাকে নিয়ে দুই-দুই বার প্রতারণার খেলা। ১৯৮২ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০ এর জানুয়ারির মধ্যে মাত্র সতেরো মাসে শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর বশংবদ অনুচরেরা শ্রীনগরে এবং দিল্লিতে যে-সুরঙ্গ সরকার প্রবর্তন করেছিল সে গেরিলা যুদ্ধের মতোই চক্রান্তপন্থী, গেরিলাদের মতোই সে জনমত, আইন কিংবা বিচারের অপেক্ষা রাখেনি। ওই সময় ভারত সরকারের গভর্ণরেরা ইন্দিরার ভৃত্যের মতো কাজ করে গেছে এবং শ্রীনগরের মানুষের কাছে দৃশ্যতই প্রমাণ করেছে যে আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনের নীতি গণপ্রতারণার হাস্যকর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়—দিল্লিতেও গণতন্ত্রের চিহ্ন নেই, শ্রীনগরেও গণতন্ত্রের আশা রেখো না। ওই অধ্যায়টিতে ইন্দিরা এবং তাঁর পোষা স্তাবকেরা ভারতীয় সংবিধান এবং লোকসভাকে (ভারতীয় সাংবাদিকদেরও) তরুণ মুসলমানদের চক্ষে ভণ্ডের চূড়ান্ত বলে একটার পর একটা নজির, প্রমাণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। ইতিপূর্বেও পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এইরূপ কিছু প্রমাণ পূর্ব প্রজন্মের আদর্শবাদী কাশ্মীরি মুসলমান নেতৃত্বকে স্তম্ভিত করেছিল। কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক রাজনীতির ব্যতিক্রম এবং গণতন্ত্রের সাময়িক বিকারে গণ্য করা যেত। ১৯৮২-'৯০ এর অন্তবর্তী সতেরো মাসের কুৎসিত রাজনীতি দেখে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে, "ভারতের মুখে গণতন্ত্রের নাম, ভূতের মুখে রাম নাম" মাত্র। তার আরও একটা কারণ, ওই সময়ে যে সব কাশ্মীরি মুসলমান যৌবনে উপনীত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে না ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্সের স্মৃতি, না ভারতের প্রজাতন্ত্রবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়কদের সম্বন্ধে কোনও পরিচিতি। ভারতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা একটি ভূলুণ্ঠিত বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। ওই সময় ইন্দিরার কংগ্রেসের প্রতিবাদীদের মধ্যেও ছিলেন না কোনও জয়প্রকাশ কিংবা কোনও লোহিয়া। ছিল না গান্ধীর ভারতবর্ষের আদর্শবাদ, কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতার আপোষহীন নেতৃত্ব। এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ে (উপরোক্ত সতেরো মাসের মধ্যে নয়) গোটা আশির দশক জুড়ে নিকটবর্তী পঞ্জাবে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অভিযান এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার দৃষ্টান্তগুলি কাশ্মীরের নতুন প্রজন্মের লোকেরা তীক্ষ্ম সমালোচকের চক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। অতঃপর যদি ভারতবর্ষকে তারা আধিপত্যকামী ঔপনিবেশিক শক্তির সমতুল্য বলে গণ্য করে তাতে কি খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সনে শেখ আবদুল্লার দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকে ১৯৮৯ এর শেষ পর্যন্ত প্রায় বার বৎসর এই অনাচারের রাজত্ব চলেছিল বলেই কাশ্মীরে '৮৯ এর মধ্যভাগ থেকে হিংসাত্মক আন্দোলনের বিস্ফোরণ আরম্ভ হয়। আগে যে-ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, অশান্ত বিক্ষোভ, কিংবা বিক্ষিপ্ত হিংসার নিদর্শন শ্রীনগরে কখনও কখনও আবির্ভূত হয়নি, তা নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকেরা স্বীকার করবেন যে বৃহত্তর কাশ্মীরি জনমত তার পিছনে সংহতি সৃষ্টি করতে যায়নি, কাশ্মীর উপত্যকার শহরগুলিও ভিয়েতনামের যুদ্ধের ন্যায় গেরিলাদের আশ্রয়, পোষণ এবং সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি দিতে আরম্ভ করেনি।

ঐস্লামিক সংহতির পক্ষে চিরকালই কাশ্মীরে একটা উল্লেখযোগ্য জনমত ছিল। ১৯৩০ এর দশকে ন্যাশনাল কনফারেন্স গঠিত হওয়ার পূর্বে শেখ আবদুল্লাও ওই জনমতের সহধর্মী উত্তেজনার শরিক ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঐস্লামিক সংহতির প্রতিশব্দ মুসলিম লীগ নয়। পাকিস্তানও এঁদের কাছে সর্বাগ্রে, অথবা সর্বতোভাবে উপাস্য ছিলনা।

১৯৯০ সন কাশ্মীরে যে নতুন দশকের যবনিকা তুলে দিল তার পশ্চাৎপটে পুঞ্জীভূত হয়েছিল চারটি বারুদের স্তূপ। তার মধ্যে একটি, ইতিপূর্বেই বলেছি, ইন্দিরা এবং তাঁর পোষা এলসেশিয়ান কুকুরগুলি তৈরি করে। তাদের নির্মাণ করা ভূমিকার উপর খুব সহজেই বাকি তিনটি শক্তি মাথা তুলল। তার একটি এল মার্কিন সরকারের অর্থপুষ্ট আফগান যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র এবং ট্রেনিং শিবির থেকে—না এলেই আমরা আশ্চর্য হতাম। দ্বিতীয়টি এল মধ্যপ্রাচ্যে ইন্তেফাদের দৃষ্টান্তে প্রজ্বলিত কিছু ভ্রাম্যমান মুসলিম গেরিলাদের হাত ধরে। সে হাত ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, কিন্তু বহুধা বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈনাপত্যে শিবিরে বিচ্ছিন্ন। তৃতীয়টির উৎস রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনে এবং গৃহযুদ্ধের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ পাকিস্তানে ক্ষমতার ঊর্ধতন মন্ত্রণালয় থেকে—সেখানে ছিল কুখ্যাত আই এস আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স) এবং জেনারেলদের দ্বারা প্রভাবিত বেনজির ভুট্টোর মন্ত্রিসভা।

রাশিয়ার অন্তঃস্ফোরণ পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই ক্ষমতার ভারসাম্য এবং ভৌগোলিক রাজনীতির মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু ওই ঘটনা থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুন ঐসলামিক রাষ্ট্র কাশ্মীরের অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়কে যে নতুন অনুপ্রেরণা



দেবে, একথা কোনও রাজনৈতিক জ্যোতিষীরই মাথায় ছিল না। কমিউনিষ্ট দুনিয়া ধ্বংসশীল হতে দেখে অনেকে বলেছিলেন যে এইবার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যখন সমাপ্তি ঘটল, মানবেতিহাসে সর্বপ্রথম আমরা একটা প্রকাণ্ড শান্তিপর্বে প্রবেশ করব। শুধু তাই নয়, বিশ্বের প্রধান সামরিক শক্তিগুলি যেহেতু আর অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজন দেখবে না, তাদের সমরাস্ত্র-গবেষণা, উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য যে-বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হত, তাও অতি দ্রুত সংক্ষেপ করা হবে। কাজেই অনিবার্যভাবে "শান্তির পুরস্কার" অথবা 'পীস ডিভিডেন্ড' অসামরিক উন্নয়ন এবং জনসেবার কাজে অর্থ সরবরাহ স্ফীত করে তুলবে। সেই প্রত্যাশারই বিদ্রূপ দেখা দিল কাশ্মীরে, ঠান্ডা লড়াইর বিরতির ফলে গেরিলাদের হাতে দেখা দল সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, গুপ্তযুদ্ধের উন্নততম উপকরণ এবং পুরাতন যুদ্ধের ভগ্ন সীমান্ত থেকে আগত, এক অসাধারণ ফেরারী ফৌজ তার এক হাতে স্কন্ধলগ্ন কালাস্নিকভ, অন্য হাতে পবিত্র কোরান।

কিন্তু এহ মুখবন্ধ। পরবর্তী একটি, কিংবা প্রয়োজনবোধে দুইটি কিস্তিতে শ্রীনিরপেক্ষ কাশ্মীর সঙ্কটের তিনটি প্রতিকৃতি বিশদভাবে আলোচনার ইচ্ছা রাখে। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যা যথাসময়েই প্রকাশিত হবে। বর্তমানে চতুরঙ্গের প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য হয়েছে বারো টাকা। পত্রিকার কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সেকথা বুঝবেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪টি, ৮টি এবং ১২টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে কটি সংখ্যার গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচা বহন করব। গ্রাহক চাঁদা মানিঅর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। চেকে কিংবা ড্রাফটে 'চতুরঙ্গ' কথাটি লিখতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য, যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : চতুরঙ্গ, ৫৪, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা–৭০০ ০১৩।

# জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার — সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও পতনের প্রেক্ষিতে

বেণু গুহঠাকুরতা

আজকাল খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় চেচান সংখ্যালঘুদের উপর রুশ আক্রমণের খবর। দেখতে পাওয়া যায় বস্‌নিয়ার সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু বস্‌নিয়ান সার্বদের পাশবিক অত্যাচারের খবর। জর্জিয়ার গৃহযুদ্ধ অথবা আজার বাইজানে আর্মেনিয়ান সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন অথবা উজবেকিস্তানে উজবেক-তাতার সংঘর্ষের খবর এখন পুরোনো হয়ে গিয়েছে।

এমন একদিন ছিল যেদিন শুধু সমাজতন্ত্রের সমর্থকরাই নয় পুঁজিবাদী দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরাও বিশ্বাস করেছিল যে একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সন্ধান দিতে। এবং সোবিয়েত ইউনিয়নই হল সেই দেশ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শোষিত ও পদানত জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। প্রমাণ তার ষোলটি বিপাব্লিক যাদের আছে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিল রুশ বিপ্লব। এবং ৭ই নভেম্বর পেট্রোগ্রাদে ক্ষমতা দখলের আটদিনের মধ্যে ১৫ই নভেম্বর ১৯১৭ সালে, লেনিন ও স্তালিন স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র — A Declaration of the Rights of the People of Russia. যাতে ছিল জাতি সমস্যা সমাধানে বলশেভিকদের মূল চারটি নীতি। আর সেগুলি ছিল এই রকমের :

1) The equality and Sovereignty of the people of Russia.
2) The right of People of Russia to free self determination including seperation and organisation of an independent State.
3) The abolition of all national and national religions privileges and limitaions.
4) Free development of all national minorities and ethnographic groups.

রুশদেশের কমিউনিষ্টদের দাবি ছিল এই মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই গঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালের ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিস্ট রিপাব্লিকস্। মুক্তি পেয়েছিল রুশ সাম্রাজের ইউরোপ ও এশিয় অংশের শোষিত ও পদানত জাতিগুলি। কিন্তু আমরা দেখলাম বিপ্লবের পচাত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হবার কালেই এই ইউনিয়নের স্বেচ্ছায় অবলুপ্তি। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উঠে গেল সোবিয়েত ইউনিয়নের নাম। এবং এই অবলুপ্তি ঘটালেন লেনিনের প্রতিষ্ঠিত পার্টির নেতারা। অর্থাৎ লেনিনের ঘোষিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি পরাজিত হল, তারই উত্তরপুরুষের হাতে, যারা সকলেই সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা। এর কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের একটু পেছিয়ে যেতে হবে।

**ফরাসি বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব :-**

জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ইউরোপের দেশে দেশে সম্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদের আবির্ভাবের কালে। তার প্রয়োজন হয়েছিল নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির, বিশাল বাজারের, যা শেষ করে দেবে পুরনো গির্জা ও সামন্ততন্ত্র প্রভাবিত রাজতন্ত্রকে। ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের বুকে, তছনছ করে দিয়েছিল



ইউরোপের এক বিশাল অংশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে। ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত একের পর এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ইউরোপের বুকে, যে বিপ্লবের নেতৃত্বে প্রধানত ছিল পুঁজিবাদ প্রভাবিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইউরোপের মানচিত্রে আবির্ভাব হল জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে নতুন নতুন রাষ্ট্রের। জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, চেক এমনি নানান রাষ্ট্র। ইউরোপ জুড়ে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল এই নতুন রাষ্ট্রগুলি।

**পুঁজিবাদ ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার**

এই প্রসঙ্গে যেটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সেটা হল শতাব্দীব্যাপী এই বিপ্লব পূর্ব ইউরোপে যেখানে পুঁজিবাদ দুর্বল ছিল সেখানে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে ইউরোপের এক বিশাল অংশে বিশেষ করে রুশ এবং অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি আবার সবার সামনে এসে যেতে থাকে। ততদিনে ইউরোপের বুকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না? এবং এর স্থায়ী সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিকদের বক্তব্যই বা কি হবে? পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এমন কোনও বক্তব্য তদানীন্তন সমাজতন্ত্রীরা কখনও বলেন নি বরং লেনিন বলেছেন এটা সম্ভব — where consistent, demoracy prevails." তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, ডেনমার্কের ও সুইজারল্যাণ্ডের।

১৯০৫ সালে এক শান্তিপূর্ণ গণভোট মারফৎ ডেনমার্ক সুইডেন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র গড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুইডেনের শাসক গোষ্ঠি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সে যুগেও সুইডেনের শ্রমিকশ্রেণী নরওয়ের শ্রমিকশ্রেণীর আলাদা রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। লেনিনের ভাষায় : The dissolution of the ties imposed upon Norway by monarchs of Europe and Swedish aristrocracy strengthened the ties between the Norweigion and Swedish workers. The Swedish workers have proved that inspite of all the vicissitudes of bourgeois policy — bourgeois relations may quite possibly bring about a forcible subjection of the Norweigians to the Swedes! — They will be able to preserve and defend the complete equality and class solidarity of the workers of both nations in the struggle against both the Swedish and Norweigions bourgeoisie (V.I. Lenin: Question of National Policy & Proletarian Internationalism. P. 89) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জাতীয় প্রশ্নের সঠিক সমাধানের আরেকটি দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডের উল্লেখ করে। এর কারণ সেখানেও গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। লেনিনের মতে — "At all events, does it not remain an indisputable and indisputed fact that national peace under capitalism has been achieved (in so far as it is achievable) **exclusively** in countries where consistent democracy prevails. (V.I. Lenin Ibid P. 38) কেমন ছিল সুইজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক অধিকার? "In Switzerland there are **three** official languages but Bills submitted for referendum are printed in **five** languages, that is to say in two Romanish dialects in addition to three official languages. According to 1900 census, these two dialects are spoken by 38,651 out of 3,315,443 inhabitants of Switzerland i.e. by a little over one percent. In the army, commissioned and non-commissioned officers are given the fullest freedom to speak to the men in their native language. In the cantons of Grabunden and Wallis (each with a population of over a hundred thousand) both dialects enjoy complete equality." (V.I. Lenin: Ibid P.38) সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় সমস্যার সমাধান হয়েছিল ১৭৯৭ থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে। লেনিনের মতে "This means that the epoch of the great Franch revolution, which provided the most democratic solution of the current problems of the transition from feudalism to capitalism, succeded incidentally **en passent** in "solving" the national question" (V.I.Lenin Ibid P. 39) কিন্তু পুঁজিবাদী জগতে এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। অত্যন্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ ইংল্যাণ্ডে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। আর উপনিবেশে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা? সে তো তখন সাত হাত জলে।

**জাতীয় সমস্যা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন :-**

পুঁজিবাদের বিজয় যাত্রার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। নতুন নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে। ফলে সেখানে সমস্যার সমাধানে কোনও বিস্ফোরক সমাধানের

প্রয়োজন দেখা দেয়নি। বহুজাতিক রাষ্ট্র খুব বেশি ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল অস্ট্রিয়ান ও রুশ সাম্রাজ্য। ১৮৪৮ এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পর ধনিক শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কোনও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়নি। ফলে ইউরোপের তদানীন্তন সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দায় চলে এল শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে। ১৮৭১, ১৯০৫ এবং ১৯১৭ এর বিপ্লব এর সাক্ষী। ফলে জাতীয় সমস্যা সমাধানের দায় এবার চলে এল সমাজতান্ত্রিক বা তদানীন্তন সোশাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের উপর। এবার দ্বন্দ্ব নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ডাক — শ্রমিকের কোনও দেশ নেই — অপরদিকে পদানত ও শোষিত জাতিগুলির মুক্তির প্রশ্ন শোষক জাতির হাত থেকে। প্রথমদিকে শ্রমিকদের কোনও দেশ নেই এবং শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই হবে শোষিত জাতির মুক্তি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যার গুরুত্বকে কমিয়ে দেখাবার প্রবণতা ছিল, যা পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়।

আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে মার্ক্স প্রথমে ভেবেছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধির মধ্যেই আছে এই প্রশ্নের সমাধানের চাবিকাঠি। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। আর এঙ্গেলস দেখেছিলেন "The hatred towards the Irish found among the English workers." (মার্ক্সকে লিখিত চিঠি ২০ নভেম্বর ১৮৬৮) তাই ১৮৬৯ এর ১০ই ডিসেম্বর, কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কাউন্সিলে আইরিশ প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য কীভাবে পেশ করা হবে সে প্রসঙ্গে মার্ক্স এঙ্গেলসকে লেখেন: quite apart from all phrases about international and human justice for Ireland—which are taken for granted in the International Council—**it is in the direct and absolute interest of The English working class to get rid of their present connection with Ireland** and this is my fullest conviction, and for reasons which in part I can not tell the English workers themselves. For a long time I believed that it would be possible to overthrow the Irish regime by the English working class ascendency. I always expressed this point of view in the New York Tribune. Deeper study has now convinced me of the opposite. The English working class will **never accomplish** anything until it has got rid of Ireland.....The English reaction in England had it roots in subjugation of Ireland. (quoted by Lenin: Ibid P. 100) মার্ক্সের এই চিন্তার সূত্র ধরে সোশাল ডেমোক্রাটরা পরবর্তীকালে পরাধীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে নেন। এ ব্যাপারে এরা এক পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লণ্ডন কংগ্রেসে ১৮৯৬ এ। কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়: This congress declares that it stands for the full right of all nations to self-determination and express its sympathy for the workers of every country now suffering under the yoke of military, national or other absolutism. (quoted by Lenin: P. 90)

একই ভাবে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটরা তাদের প্রোগ্রামে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ব্যাখ্যা করেন Rights of political secession বলে। এই ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক বা জাতীয়স্তরে সোশাল ডেমোক্রাটরা ঐকমত্য ছিলেন না। রোজা লুক্সেমবুর্গ শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিরোধিতা করেন। এমন কি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার অধিকারেরও তিনি বিরোধিতা করেন এবং সুইডেন থেকে নরওয়ের বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক দেখতে পান নি। তাঁর কাছে "The latest event in the history of the federative relations, the secessioon of Norway from Sweden — which at that time was hastily seized upon by the Social-patriotic Polish press (See the Cracow Naprzod) as a gratifying sign of the strength and progressive nature of the tendency towards state secession — at onece provided striking proof that federalism and its concomitant, seperation are in no way an expression of progress or democracy. After the so called Norweigian revolution 'revolution', which meant that the Swedish king was deposed and compelled to leave Norway, the Norweigians cooly proceeded to choose another king, formally rejecting by a national referendum, the proposal to establish a republic. That which superficial admirers of all national movements and of all semblence of independence proclaimed to be a 'revolution', was simply a manifestation of peasant and petty bourgeois particularism, the desire to have a king of their own for their money instead of one imposed upon them by the Swedish aristrocracy, and was consequently, a movement that had absolutely nothing in common with revolution. At the same time the dissolution of the union between Sweden and Norway showed once more to what extent, in this case also the federation which had existed until then was only an expression of purely dynastic interests and therefore, merely a form of monarchism and reaction. (quoted by Lenin. Ibid P.84) রোজা লুক্সেমবুর্গের কাছে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল "a mere platitude" লেনিনের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই মামুলি ছিল না। তাঁর কাছে প্রশ্ন ছিল একাধিক জাতি নিয়ে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য সোশাল ডেমোক্রাটদের প্রোগ্রামে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অথবা সেই রাষ্ট্র ত্যাগ করার অধিকার থাকবে কি না? লেনিন রোজাকে এই প্রশ্নে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন আর তাঁর মতামত কী ছিল তা আগে বলা হয়েছে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নানা জনে নানাভাবে আক্রমণ করেন যেমন Semkovsky প্রশ্ন তোলেন: What are we to do.....if the Polish proletariat wants to carry on a joint struggle together with whole proliterariat of Russia within the framework of one state, and the reactionery classes of Polish society, on the contrary, want to seperate Poland from Russia through a referendum, obtain a majority of votes in favour of seperation; are we Russian Social-Democrats to vote in a central parliament together with our Polish comrades against secession, or in order not to infringe 'on the right to self-determination' vote in favour of secession? এই প্রশ্নের জবাব লেনিনের কাছে ছিল খুবই সহজ: The right of self-determination, my dear Mr. Liquidator, certainly does not imply the solution of the problem by a central parliament, but by a parliament, a diet, or a referendum of the seceding minority. When Norway seceded from Sweden (1905) it was decided by Norway alone. (a country half the size of Sweden) (Lenin: Ibid P. 112)

সঠিক পথ কী হবে তা নিয়ে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল মার্ক্সের আমল থেকেই। মার্ক্স নিজেও সব রকমের জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। যে আন্দোলন বিপ্লবের সমর্থক নয় তাকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। যদি সে আন্দোলন বিপ্লবের সহায়ক তবেই তিনি তাঁকে সমর্থন করার কথা ভেবেছেন। ঐতিহাসিক E.J.Hobsbawm এ প্রসঙ্গে বলেছেন: For Marx, Hungarian and Polish nationalisim in 1848 was good, because mobilised on the side of the revolution, Czech and Croat nationalism was bad, because objectively on the side of counter revolution. But we cannot deny that there was an element of great nation nationalism in such views, very obviously among the highly chauvinistic French revolutioneries (notably the Blanquists) and not easily to be denied even in Frederick Engles. (The Age of Capital, Rupa. P. 109) হয়ত এরই জন্য এত বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার কথা সত্ত্বেও ১৯১৪-এ এসে আমরা দেখতে পেলাম, ইউরোপের শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা নিজেদের পরিণত করেছেন নিজ নিজ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে অর্থাৎ শিকার হয়েছেন জাতীয়তাবাদের। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন লেনিন। কিন্তু তিনিও বাঁচাতে পারেননি রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে মহারুশ জাতীয়তাবাদের হাত থেকে।

**বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও জাতীয় সমস্যা :-**

বিপ্লবের পরে এবং গৃহযুদ্ধকালে রাশিয়া ডুবে যায় এক চরম অরাজকতার সমুদ্রে। রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গড়ে ওঠে বেশ কিছু ছোট ছোট রাষ্ট্র, যেগুলির স্থায়ীত্ব বেশি দিন হয়নি। এদিকে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বেসারবিয়া অধিকার করে নেয় রুমানিয়া। মূল রুশ ভূখণ্ড যা ছিল রুশ সাম্রাজ্যের ৯০ ভাগ সেখানে স্থাপিত হল: রাশিয়ান সোশালিষ্ট ফেডারেটিভ রিপাব্লিক। এশিয়া ও ইউরোপের এক বিশাল অংশ নিয়ে সংগঠিত হয়েছে এই রাষ্ট্র যার সীমানার একদিকে ছিল কৃষ্ণসাগর অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগর তীরের ব্লাদিভস্তক।

মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখনও ছিল অসংগঠিত, কৃর্তত্ব পুরোপুরি তখনও স্থাপিত হয়নি কমিউনিষ্টদের। এছাড়া গড়ে উঠেছিল ককেশাস অঞ্চলে ট্রান্স ককেশিয়ান সোসালিষ্ট ফেডারেটিভ সোবিয়েত রিপাব্লিক যাতে ছিল, জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া, বাইলোরুশিয়ান সোসালিস্ট সোবিয়েত রিপাব্লিক ও ইউক্রেনিয়ান সোসালিষ্ট সোবিয়েত রিপাব্লিক। সোবিয়েত ইউনিয়নের তখনও জন্ম হয়নি।

"সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সমূহের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯২২ এ। এখানে ঘোষণা করা হয় সোবিয়েত ইউনিয়ন গঠনের কথা। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংযুক্ত সাধনের জন্য স্বাক্ষরিত হয় এক চুক্তি। এখানে একটি সর্বোচ্চ আইনসভা গঠিত হয় — যা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি বলে পরিচিত। এম, আই,

কালিনিন এই সভার সভাপতি এবং ভি, আই, লেনিন কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিশারের সভাপতি নির্বাচিত হন।

"ফলে পার্টির নেতৃত্বে যার নেতা ছিলেন লেনিন, একটি বহুজাতিক সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হল। এটা গঠিত হয়েছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে, প্রতিটি সোবিয়েত অঙ্গ রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে।

"সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সমূহের ইউনিয়ন গঠন লেনিনবাদী চিন্তাধারারই জয়লাভ সূচিত করে। এটি জাতি সমূহ সম্পর্কে লেনিনবাদী চিন্তারও বিজয় সূচিত করে। এই ঘটনাগুলি পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষের কাছে সকল অর্থেই এক পথ নির্দেশ করেছিল। জাতি সমূহের এবং জনসাধারণের ভিতর যে অসাম্য ছিল তাকে দূর করে জনসাধারনকে এক ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবারে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্যবাদ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার এটা ছিল পথ নির্দেশ।" (সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৩৭০) এই নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে। এতে ছিল রাশিয়া, ট্রান্স ককেশিয়া, ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়া।

লেনিনের নাম করে এসব কথা পার্টির ইতিহাসে লেখা হলেও তা সত্য ছিল না। সোবিয়েত ইউনিয়ন গঠনকালে তিনি ছিলেন অসুস্থ। এবং সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অন্ধকারে।

**লেনিনের নামে মিথ্যাচার —**

যদিও লেনিনের নাম করেই তদানীন্তন পার্টি নেতৃত্ব সোবিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন কিন্তু শুনতে আশ্চর্য লাগলেও লেনিন ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিরোধী। এই রাষ্ট্রগঠনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২২-এ, আর ঠিক সেইদিনই লেনিন তার ডায়েরিতে লিখেছেন —

"আমার মনে হয় কুখ্যাত আংশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নটিতে যথেষ্ট প্রবলভাবে ও চূড়ান্তভাবে হস্তক্ষেপ না করে আমি রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করেছি। এটাকে সরকারিভাবে বলা হয়েছে 'সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়ন'।

"যখন এই প্রশ্নটি গত গ্রীষ্মকালে ওঠে তখন আমি অসুস্থ এবং শরৎকালে আমি আমার সুস্থ হয়ে ওঠা সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থাবান ছিলাম। অক্টোবর এবং ডিসেম্বর প্লেনারী মিটিং আমাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। আমি অক্টোবর প্লেনারী মিটিঙে (যেখানে প্রশ্নটি উঠেছিল) অথবা ডিসেম্বরের সভায় যোগ দিতে পারিনি, ফলে প্রশ্নটি আমার আড়ালেই থেকে যায়।"

সেই সময় সোবিয়েত ইউনিয়নে যোগদানের প্রশ্নে জর্জিয়ার পার্টির সঙেগ কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন ডায়েরিতে লিখেছেন: "কমরেড দ্জেরঝিন্স্কি, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান হিসাবে যাকে "তদন্ত করবার" জন্য পাঠান হয়েছিল, তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে যা বলেছেন তাতে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর এই সিদ্ধান্তে আমাকে আসতে হয়েছে। কমরেড দ্জের ঝিনস্কি আমাকে যা জানিয়েছেন তদনুযায়ী যদি অবস্থা এই পর্যায়ে এসে থাকে যে ওরজিনিকিদ্জেকে শারীরিক হিংস্র বল প্রয়োগের (Extreme of applying physical violence) মতো চরম পর্যায়ে যেতে হয়েছে তাহলে এর থেকে বুঝতে হবে আমরা আমাদের এক গভীর পাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি। স্বভাবতই এই আংশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারটা ভুল এবং অসময়ে ঘোষিত হয়েছে।

"একথা বলা হচ্ছে যে আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়াসাধক যন্ত্রের (Apparatus) প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, তার আশ্বাস কোথা থেকে পাওয়া গেল? এই আশ্বাস কি সেই একই রাশিয়ান প্রক্রিয়াসাধক যন্ত্র থেকে আসেনি, যার প্রতি আমার ডায়েরির পূর্ববর্তী অংশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, আমরা এই যন্ত্রটি জারের কাছ থেকে পেয়েছি এবং এর ওপর আমরা কেবল সোভিয়েতের ব্রাশ দিয়ে সামান্য এক পলেস্তারা চুনকাম করেছি (Tarred a little with soviet brash)?

"এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের নিজেদের যন্ত্র বলে বুক ঠুকে বলার মতো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আমাদের নিজেদের বিবেকের কাছে স্বীকার করতে হবে যে এর উল্টোটাই ঘটেছে। যে যন্ত্রটিকে আমরা নিজেদের বলে বলছি সেটা আসলে বুর্জোয়া জারতন্ত্রী ব্যবস্থারই জগাখিচুড়ি মাত্র, এই ব্যবস্থাটিকে গত পাঁচ বছরে, অন্য দেশের সাহায্য ব্যাতিরেকে বাতিল করা সম্ভব ছিল না; কারণ বেশির ভাগ সময়েই আমরা ব্যস্ত ছিলাম যুদ্ধের কারণে এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইতে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই অবস্থাতে সংযুক্তি থেকে আলাদা হওয়ার স্বাধীনতার যে কথা বলে আমরা আমাদের সাফাই গাইছি সেটা এক খণ্ড ছেঁড়া কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা অরুশদের বাঁচাতে পারবে না, সেই আসল রুশ মানুষটির হাত থেকে যে হল আসলে এক মহারুশ উগ্র স্বদেশভক্ত এবং হিংসাপ্রেমী বদমাস। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে অতি সামান্য সংখ্যক সোবিয়েত এবং সোবিয়েতজাত শ্রমিকেরা দুধে পড়া মাছির মতো ভেসে যাবে এই উগ্র রুশভক্তি ও মহারুশ আবর্জনার মধ্যে।"

লেনিন সংযুক্তিকরনের সমস্ত ব্যাপারটির জন্য দায়ী করেছেন স্তালিনের ব্যস্ততাকে। "আমার মনে হয় স্তালিনের ব্যস্ততা



এবং শুদ্ধ শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর মোহাচ্ছন্নতার সঙ্গে কুখ্যাত 'জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের' সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ এক্ষেত্রে এক সর্বনাশা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাজনীতিতে এই ধরনের বিদ্বেষ সাধারণত এক চরম নীচতার ভূমিকা গ্রহণ করে।

"আমি আরও ভীত এই কারণে যে কমরেড্ দ্জেরঝিনস্কি যিনি ককেশাসে গিয়েছিলেন 'জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী'দের 'পাপের' তদন্ত করতে সেখানে তিনি তাঁর অকৃত্রিম রুশ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর তদন্ত কমিশনের 'নিরপেক্ষতার' যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ওর্জিনিকিদ্জের 'রুক্ষ আচরণ' থেকে। (একথা সবারই জানা আছে যে অন্য জাতির লোকেরা যাঁরা এখন রুশ হয়েছেন তারা তাদের রুশ মানসিকতার পরিচয় দেন অত্যন্ত কুৎসিৎভাবে) আমি মনে করি কমরেড দ্জেরঝিনস্কিকে এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনাশূন্য মনোভাব গ্রহণের দায় থেকে কখনই মুক্তি দেয়া চলে না।"

সমস্ত ব্যাপারটি আলোচনা করে লেনিন প্রশ্ন তুলেছেন "এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন এসে যায়। সেটা হল আন্তর্জাতিকতাবাদকে কীভাবে বুঝতে হবে?" এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কমরেডরা এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্নটিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন কি না। (V.I. Lenin: Question of National Policy and Proleterian Internationalism . PP 188, 189, 190)

লেনিনের ভয় ছিল নানান অজুহাতে শোষিত জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পদদলিত করে মহারুশ জাতিয়তাবাদ আন্তজার্তিকতার নামে নিজেদের প্রাধাণ্যকেই মজবুত করে তুলবে। তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে লিখেছিলেন: "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্তমান যা চেহারা, তাতে রেল ব্যবস্থার ঐক্য, আর্থিক ব্যবস্থার ঐক্য এমনি সব নানা অজুহাতে যথার্থই বিপুল রুশি ধ্যান ধারণার অপব্যবহার অনিবার্য। এই সব অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ উদ্ভাবনী দক্ষতা দরকার, যাঁরা এই সংগ্রাম চালাবেন তাঁদের সবিশেষ আন্তরিকতার কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এর জন্য এক বিশেষ আচরণবিধির দরকার হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রগুলিতে যে সব জাতি বসবাস করছে একমাত্র তারাই পারবে এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে। সেক্ষেত্রে আমরা আগে থেকে নিশ্চিত হতে পারি না যে এই সমস্ত কাজের ফলে সোবিয়েত সমূহের পরবর্তী কংগ্রেসে আমরা পিছনের দিকে এক কদম এগিয়ে যাব না, অর্থাৎ শুধুমাত্র সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে আমরা সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়নকে বজায় রাখব এবং অন্য সমস্ত বিষয়ে আমরা আলাদা গণ কমিশারিয়েটগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেব।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। (Lenin. Ibid P. 192)

**মহারুশ জাতীয়তাবাদের প্রত্যাবর্তন:**

১৯২২ এর ২৬ ডিসেম্বর, অল রাশিয়ান কংগ্রেস অব সোবিয়েতে স্তালিন যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে আমরা দেখতে পাই যে পার্টি নতুন রাষ্ট্রের সভ্যদের মধ্যে কি ধরনের চুক্তির আশা করছিলেন। স্তালিনের এই রিপোর্টে বলা হয় "সংযুক্তি চুক্তি নিশ্চিতভাবে হবে নিম্নলিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে — বৈদেশিক বাণিজ্য, সৈন্য ও নৌ বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়, কূটনৈতিক বিষয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ডাক ও তার বিভাগ — এই সমস্ত দপ্তর স্থাপিত হবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল অব পিপলস কমিশারসের অধীনে। অর্থ, জাতীয় অর্থনীতি, খাদ্য, শ্রম ও ইনসপেকশন দপ্তরগুলি থাকবে চুক্তিবদ্ধ সাধারণতন্ত্রগুলির হাতে। কিন্তু তা এমনভাবে চালিত হবে যাতে তারা এই দপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশাবলী মেনে চলে। এটা প্রয়োজন যাতে ওই সাধারণতন্ত্রগুলির শ্রমজীবী জনতা খাদ্য, জাতীয় অর্থনীতি, শ্রম ও ইনশ্পেকশন প্রভৃতি ব্যাপারে সংযুক্তকেন্দ্রের ছত্রছায়াতে আসতে পারে। বাকি দপ্তরগুলি যেমন স্বরাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, কৃষি এবং আর সব মোট ছটি বিষয় যা ইউনিয়নগুলির জনজীবনের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত সেগুলি স্বাধীন দপ্তর হিসাবে থাকবে চুক্তিতে সামিল ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিসারিয়েটের অধীনে। এটা অবশ্য প্রয়োজন যারা সোবিয়েত সাধারণতন্ত্র গঠন করেছে তাদের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের রক্ষাকবচ হিসাবে।

(J.V. Stalin: Marxism and National colonial question: Burmon Publishing House P 107) এক কথায় স্বরাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি ছটি দপ্তর বাদ দিলে বাকি সব দপ্তরই স্বনামে অথবা বেনামে থেকে গেল কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের হাতে।

১৯২২ এর ৩০ ডিসেম্বর সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সমূহের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে চুক্তির বিশদ বিবরণ পেশ করেন স্তালিন। চুক্তির তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সোবিয়েতের সভা সংখ্যা হবে ৩৭১ এবং এরা নির্বাচিত হবেন শহর ও জেলা সোবিয়েতগুলির দ্বারা। শহরে পঁচিশ হাজার ভোটার প্রতি একজন এবং জেলা থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ভোটার প্রতি একজন প্রতিনিধি এই সোবিয়েতে নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ ভোটের অধিকারের মধ্যেও শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য করা হয়েছিল। এছাড়া এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন অপ্রত্যক্ষ ভোটে।

চুক্তির ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সোবিয়েত গঠিত হবে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যার অর্থ ছিল মূল রুশ ভূখণ্ডের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সোবিয়েতে হবেন

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রের সমস্ত ভিত্তি বা অর্ডিন্যান্স মেনে নেওয়া ছিল রাজ্যগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক, ২০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যগুলির বাজেট অনুমোদিত হতে হবে কেন্দ্রের দ্বারা। আয়ব্যয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই ঠিক করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আমরা সব চাইতে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে ভেবে এসেছিলাম অঙ্গরাজ্যগুলির পক্ষে, সেটা ২৬ নং ধারাতে বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের অধিকার থাকবে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। যদিও সেটা কীভাবে সম্ভব হবে তা চুক্তির কোথাও বলা হয়নি। আর তা সম্ভবও ছিল না। কমিউনিষ্ট ছাড়া আর কারুর কোনও অধিকারই ছিল না, এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের কথাই ছিল শেষ কথা, কারণ এটাই নাকি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার আসল কথা। যারা এর বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের কপালে অশেষ নিগ্রহ জুটেছিল, উদাহরণ জর্জিয়া।

**আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নতুন ব্যাখ্যা —**

সোবিয়েত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের মূলনীতিগুলিতে যে সাধারণ মানুষের এবং অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ কোনও অধিকার ছিল না এ কথা নেহাৎ সত্য। এবং এর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এতকাল ধরে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে যে কথা বলে আসা হয়েছিল তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রতিপদে লেনিনের নাম করে বিকৃত করা হয়েছে লেনিনের নীতিকে। ট্রাস্ন ককেশিয়ার ঘটনা সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য আমরা আগে দেখেছি। আর স্তালিন সেই প্রসঙ্গে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে ১৯২৩ এর ২৩ এপ্রিল যে রিপোর্ট পেশ করলেন তাতে বললেন, "জোরালো কারণ না থাকলে লেনিন কখনই ফেডারেশন গঠন করা সম্পর্কে বারবার এত চাপ সৃষ্টি করতেন না। সঙ্গত কারণ না থাকলে কেন্দ্রীয় কমিটি তিন তিনবার ঘোষণা করতেন না যে ট্রাস্ন ককেশিয়াতে ফেডারেশন গঠন করা দরকার, যেখানে থাকবে তার নিজস্ব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহি কমিটি, যার হাতে থাকবে নিজস্ব ক্ষমতা, যার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে অঙ্গরাজ্যগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক। সঙ্গত কারণ না থাকলে দ্জেরঝিনস্কি, এবং কামেনভ ও কুইবাশেভ এই দুটি কমিশনই মস্কোতে ফিরে এসে বলতেন না যে ফেডারেশন গঠন করা ছিল অপরিহার্য" (Ibid page 138) এখানে উল্লেখ্য যে ট্রাস্ন ককেশিয়াতে স্তালিন জবরদস্তি করে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে এক ট্রাস্ন ককেশিয়ান ফেডারেশন গঠন করেছিলেন। জর্জিয়ার কমিউনিষ্টরা এর তীব্র বিরোধী ছিলেন, কারণ এতে তাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার প্রশ্ন ছিল। লেনিনের কাছে সবটাই ছিল "এক মহারুশ জাতীয়তাবাদী" অভিযান। স্তালিনের অর্থনৈতিক নীতির মূলে ছিল জারের আমলের ভৌগোলিক অবস্থানে ফিরে যাওয়া, তাই অল রাশিয়ান কংগ্রেস অব সোবিয়েতের দশম অধিবেশনে তিনি তাঁর রিপোর্টে জানালেন, "আমাদের ফেডারেশনের বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক কারণে এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণে যে শ্রমবিভাগ গড়ে উঠেছে তাকে মনে রাখতে হবে। যেমন উত্তরের দেশগুলি দক্ষিণ ও পূর্ব দেশগুলিতে বস্ত্রজাত দ্রব্য সরবরাহ করে এবং দক্ষিণের ও পূর্বের দেশগুলি উত্তরের দেশগুলিকে তুলা, তেল এবং অন্যান্য সামগ্রী। কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এই যে শ্রমবিভাগ গড়ে উঠেছে তাকে কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ফেডারেশনের সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন গড়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক কারণে এবং এই অর্থনৈতিক শ্রমবিভাগ যতদিন থাকবে ততদিন বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রগুলির উন্নতি অসম্ভব। সেই কারণেই এই সব সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে আনা প্রয়োজন। তৃতীয়ত ফেডারেশনের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেটা হল যে কোনও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দাঁড়িয়ে থাকার মেরুদণ্ড ও উৎস। সেটা একটা ব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এই ধরনের বিভক্ত অবস্থায় রাখা চলতে পারে না কারণ এর ফলে এগুলি থেকে যাচ্ছে বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রগুলির হাতে এবং নিয়োজিত হচ্ছে তাদের স্বার্থে। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক জীবনের মূল শিরাটি অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থাটি হয়ে থাকবে আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কবহির্ভূত, বিভিন্নভাবে বিভক্ত একটি সংস্থা, এটাও একটি কারণ আমাদের একটি রাষ্ট্র গঠনের করবার। আর শেষ কারণ হল আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদের স্বল্পতা।" (Ibid; P. 103)

এইগুলিই ছিল তাড়াহুড়ো করে একটি মাত্র অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে সবাইকে নিয়ে আসার প্রধান কারণ। সোবিয়েত ইউনিয়নের শোষিত ও পদানত জাতিদের স্বার্থ রক্ষার কথা তাই এই কারণগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। সেটা থাকা কেন সম্ভব ছিল না তার উত্তর পাওয়া যাবে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনার উত্তরে স্তালিন প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে। স্তালিনের মতে "আমাদের বলা হয় যে আমরা যেন শোষিত জাতিগুলির স্বার্থকে আঘাত না করি। কিন্তু সেটা বলার জন্য একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করা হচ্ছে। যার অর্থ হল অতীতে শোষিত জাতিগুলির স্বার্থের নীচে স্থান দিতে হবে রুশ সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থকে। এটি একটি অবাস্তব প্রস্তাব। লেনিনের কাছে যেটা ছিল তাঁর প্রবন্ধের একটি বাক্যালঙ্কার মাত্র (figure of speech) বুখারিন সেটাকে পরিণত করেছেন একটি নিয়মিত শ্লোগানে। কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে সত্য যে সর্বহারার একনায়কত্বের রাজনৈতিক ভিত্তি হল প্রধানত এবং মূলত রুশকেন্দ্রের শিল্পাঞ্চলগুলি। রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চল



গুলি নয়। সেগুলি হল কৃষকের দেশ। যদি আমরা কৃষক অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে সর্বহারা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির চাইতে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করি তাহলে এর ফলে সর্বহারার একনায়কত্বে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফল হবে মারাত্মক, কমরেড।" (Ibid 143)

এখানেই এর শেষ নয়, "একথা মনে রাখতে হবে যে শোষিত জাতিগুলির যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর আছে তার ক্ষমতাকে গুছিয়ে তোলবার অধিকার এবং এই শেষোক্ত অধিকারের অধীন হতে হবে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সঙ্গেও অন্য অধিকারটির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় — যেটি অধিকার হিসাবে স্থান পাবে আরও অনেক উঁচুতে — সেটি হল শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার, যে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এই অধিকারকেই আরও সুসংহত করার জন্য। এক্ষেত্রে খুব খোলাখুলিভাবে বলা দরকার যে — জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কোনওভাবে, কখনই সর্বহারা একনায়কত্বকে কার্যকরী করার শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারের পথে বাধা হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে না। প্রথমটিকে নিশ্চিতভাবেই রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে দ্বিতীয় অধিকারটির কাছে" (Ibid P 143) এই সব কথার পর সমাজতন্ত্রই পারে শোষিত ও পদানত জাতিগুলির প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করতে এমন কথার কোনও অর্থ থাকল কিনা সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু ইতিহাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ১৯২২-তেই সোবিয়েত ইউনিয়নের পতনের বীজ রোপিত হয়েছিল তার প্রস্তাবিত সংবিধানে, তাই স্থায়িত্ব পেল না সর্বহারা বিপ্লব। পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ বিনাই তা হারিয়ে গেল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কিন্তু সেকথা এখন নয়।

**সোবিয়েত ইউনিয়ন মানেই হল রাশিয়া :**

এবং রাশিয়ার স্বার্থ বজায় রাখাই হল শ্রমিক আন্দোলনের মূল কথা। পরবর্তীকালে সোবিয়েত ইউনিয়ন চারটি রাষ্ট্র থেকে ষোলটি রাষ্ট্রের সংযুক্ত ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে কিন্তু মূল রুশ ভূখণ্ডে কোনও ভৌগোলিক পরিবর্তন হয়নি। যদিও রুশ ফেডারেশনে দ্বিতীয় সংবিধান গ্রহণ কালে ছিল একশটিরও বেশি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি। এতে ছিল ষোলটি অটোনোমাস রিপাব্লিক ও দশটি অটোনোমাস এরিয়া। পাঁচটি অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট। এই সব ছোট ছোট রাষ্ট্র ও জাতিগুলির সোবিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও সাংবিধানিক অধিকার ছিল না।

১৯৩৬ সালের সংবিধান গ্রহণকালে যে আলোচনা হয় তাতে প্রশ্ন উঠেছিল যে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্গত অটোনোমাস রিপাব্লিকগুলির যদি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের যথাযথ উন্নতি গত সতের বৎসরে ঘটে থাকে তাহলে তাদের ইউনিয়ন রিপাব্লিকের মর্যাদা দেওয়া হবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩৬ এর ২৫ নভেম্বর সোবিয়েত অব দি ইউ এস্ এস্ আর এর অষ্টম অধিবেশনে স্তালিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মর্মার্থ ছিল: এই প্রস্তাবটি কি মেনে নেওয়া চলে? আমার মনে হয় এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে না এই প্রস্তাবটি শুধুমাত্র তার বিষয়বস্তুর জন্য নয়, এটা ভুল তার শর্তগুলির জন্যও। অর্থনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক পরিপক্বতা অর্জনের ভিত্তিতে অটোনোমাস রিপাব্লিকগুলিকে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের স্তরে উন্নীত করার কথা বলা আর ঠিক হবে না। যেমন বলা ঠিক হবে না অর্থনৈতিক অথবা পশ্চাৎপদ তার ভিত্তিতে কোনও রিপাব্লিককে আবার অটোনোমাস রিপাব্লিকের স্তরে ফিরে যাওয়ার কথা বলা।

কোনও অটোনোমাস রিপাব্লিককে ইউনিয়ন রিপাব্লিকে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিষের। এক: একে নিশ্চিত ভাবে হতে হবে এক সীমান্তবর্তী রিপাব্লিক। কারণ এই সীমান্তবর্তী রিপাব্লিকগুলির সোবিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে। কাজেই তার ভৌগোলিক অবস্থান এমন হওয়া দরকার যাতে তাদের চারিদিকে সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্য কোনও রাষ্ট্র না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক বাম্‌কির অথবা তাতার রিপাব্লিকের কথা। যদি এদের ইউনিয়ন রিপাব্লিকের মর্যাদা দেওয়া হয় এদের পক্ষে কি তখন সোবিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করা সম্ভব? না, এদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কারণ এদের চারপাশে রয়েছে অন্যান্য সোবিয়েত রিপাব্লিক ও রিজিয়ন। সত্যি কথা বলতে গেলে এদের সোবিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। কাজেই এদের ইউনিয়ন রিপাব্লিকে পরিণত করা সম্ভব হবে না। দুই: যে জাতির নামের উপর ভিত্তি করে সেই রিপাব্লিকের জন্ম হবে, তাকে মোটামুটি সেই রিপাব্লিকের জনসংখ্যার অধিকাংশ হতে হবে। যেমন ক্রাইমিয়ান অটোনোমাস রিপাব্লিক। এটা একটি সীমান্তবর্তী রিপাব্লিক। কিন্তু ক্রাইমিয়ান তাতাররা এই রিপাব্লিকে জনসংখ্যার অধিকাংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা হল সংখ্যালঘু। ফলে এদের ইউনিয়ন রিপাব্লিকের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হবে ভুল এবং অযৌক্তিক। তিন: কোনও রিপাব্লিকের জনসংখ্যা যদি দশ লক্ষের বেশি না হয় তাহলে তাকে ইউনিয়ন রিপাব্লিকের মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে না। এই ছোট ছোট রিপাব্লিকগুলি তাদের সামান্য জনসংখ্যা ও ছোট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সম্ভব হবে একথা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই যে এরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তদের শিকারে পরিণত হবে। (J.V. Stalin: Problems of Leninism

P. 562 + 563) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে ১৯৩৬-এ এসে স্তালিনের এই অভিনব ব্যাখ্যা শোনার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে সমস্ত অঞ্চলগুলি পুনর্গঠন করা হল না কেন অথবা হবে নাই বা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন বলেন: "না, এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সোবিয়েত ইউনিয়নে এমন মানুষ রয়েছেন যারা সব সময় প্রস্তুত এবং নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে আগ্রহান্বিত যার ফলে এই ভূখণ্ডের ও অঞ্চলের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারটা চলতেই থাকবে। ফলে সৃষ্টি হবে বিভ্রান্তি এবং আমাদের কাজের মধ্যে এক অনিশ্চয়তার। প্রস্তাবিত সংবিধান এই সমস্ত মানুষদের কাজকে প্রতিহত করবে। এবং সেটা খুব ভাল, কারণ অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন এক নিশ্চয়তার পরিবেশ। প্রয়োজন স্থায়িত্বের এবং দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতার। (Ibid. P563)

এক কথায় ১৯৩৫৩৬-এ যে সংবিধান গৃহীত হয়। তাতে শোষিত ও পশ্চাৎপদ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার নিয়ে দুনিয়ার মার্ক্সবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে যে কথা বলে আসছিলেন তা অনুসরণ করা হয়নি। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ অধিকার এবং রুশ রাষ্ট্রের স্থায়ীত্বই ছিল মূল কথা। ফলে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, শোষিত ও পশ্চাৎপদ জাতির বিশেষ অধিকার এসব কথা চলে গেল পেছনে। সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে রুশদেশকে বাঁচিয়ে রাখার সমার্থক করা হল; সৃষ্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার নতুন ব্যাখ্যা।

**সাম্রাজ্যবাদী ভূত: সোবিয়েতের কাঁধে:**

এই নীতির প্রতিফলন আমরা প্রথম দেখতে পাই চিন দেশের সঙ্গে সোবিয়েতের সম্পর্কে। চিন ছিল তখন একটি পশ্চাৎপদ এবং আধা ঔপনিবেশিক দেশ। সেখানেও সোবিয়েত ইউনিয়ন চাইনিজ ইষ্টার্ন রেলওয়ের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৯২৪ সালের মে মাসে রুশচিন কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং চিনের সঙ্গে এমন একটা চুক্তি হয় যার ফলে চাইনিজ ইষ্টার্ন রেলওয়ে পরিচালনায় প্রকৃতপক্ষে রুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চিনারা সমস্ত ব্যাপারটাকে মোটেই ভাল ভাবে নেননি। ১৯২৯-এ চিন এই রেলওয়ে জোর করে দখলের চেষ্টা করে। প্রতিবাদে সোবিয়েত সৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে। ফলে চিন-সোবিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার ছিন্ন হয়।

এর সঙ্গে লেননবাদী নীতির কোনও সম্পর্কই ছিলনা, সবই হচ্ছিল রুশ রাষ্ট্রের স্বার্থে। এই নীতিরই চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখতে পাই রুশ-জার্মান চুক্তিতে, যেটা বাইরে থেকে ছিল দুই দেশের মধ্যে অনাক্রমন চুক্তি। কিন্তু আসলে ছিল নিজেদের মধ্যে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ভাগ করে নেবার চুক্তি।

যদিও কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে পুঁজিবাদী দেশগুলিকে শান্তিপ্রিয় ও আগ্রাসী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং জার্মানি ছিল আগ্রাসীর দলে কিন্তু মিউনিখ চুক্তির পর দেখা গেল রুশ-জার্মান সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি। ১৯৩৯-এর মে মাসে লিটভিনভ্ বিদায় নিলেন। হয়ত জাতিতে ইহুদি ছিলেন বলেই। নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলে এলেন মলোটভ। মে মাসেই নতুন বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু হয়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯ আগষ্ট। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। এবার শুরু হল দুই দেশের মধ্যে অনাক্রমন চুক্তির আলোচনা। ২৩ আগষ্ট রিবেনট্রপ এলেন মস্কোয়। অনাক্রমন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। রিবেনট্রপ জার্মানি ফিরে গেলেন। গলায় তাঁর 'অর্ডার অব লেনিন'-এর মালা। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আর এক নতুন উদাহরণ সৃষ্টি হল।

এই চুক্তির ফলে জার্মানি ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, পূর্ব পোল্যাণ্ড এবং বেসারবিয়ার উপর রুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। জার্মানির ভাগে পড়ে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের বাকি অংশ। সেপ্টেম্বরের শেষে রিবেনট্রপ আবার মস্কোয় যান এবং পোল্যাণ্ডের আরও কিছু অংশের বিনিময়ে লিথুয়ানিয়ার উপর রুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর। জার্মানি পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করল। বাদিয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ে এবং নিজেদের অংশ বুঝে নেয়। এবার এল বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি দখল করার পালা। প্রথমেই রুশ সৈন্য এই রাষ্ট্রগুলি দখল করেনি। চাপ সৃষ্টি করে সামরিক ঘাঁটি গড়ার অধিকার প্রথমে আদায় করা হয়। এস্তোনিয়ার সঙ্গে চুক্তি হয় সেপ্টেম্বরে। লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়ার সঙ্গে অক্টোবরে। এরপর এল ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া দাবি জানাল সীমান্ত পুনর্নির্ধারনের। ফিনল্যাণ্ড রুশ দাবি অগ্রাহ্য করায় নভেম্বরের শেষে রুশ সৈন্য আক্রমন করল ফিনল্যাণ্ড। ১৯৪০-এর মার্চে ফিনল্যাণ্ড নতি স্বীকার করল। তাকে হারাতে হল রাজ্যের এক দশমাংশ এলাকা সোবিয়েতের কাছে। আমরা কাগজে দেখলাম ফিনল্যাণ্ডের উপর সোবিয়েতে বোমাবর্ষনের ছবি। সে বোমার নামও ছিল কাব্যময় 'মলোটভ ব্রেড বাস্কেট'; আর রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেন সোবিয়েতকে ধিক্কার জানিয়ে।

এবার দখল করার পালা বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে। ১৯৪০ এর জুনমাসের মধ্যে এই রাষ্ট্রগুলিকে দখল করা হল। প্রথমে লিথুয়ানিয়া পরে এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া। রুমানিয়াও বাদ গেল না রুশ আগ্রাসনের হাত থেকে। ১৯৪০-এর জুন মাসে চরমপত্র দেওয়া হল রুমানিয়াকে দখল করে নেওয়া হল বেসারবিয়া



এবং বুকোভিনা। আবার পরিবর্তন হল সোবিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে একযোগে পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারাতে সোবিয়েত ইউনিয়নের কোনও অনীহা ছিল না। যদিও ১৯১৭-তে লিনিনের শান্তি নীতির মূল কথা ছিল — শান্তি। কিন্তু পররাজ্য গ্রাস বা ক্ষতিপূরণ নয়। অথচ পটসডামে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্কে স্তালিন বল্লেন, "স্বাধীন নির্বাচন হলে এর যে কোনও দেশে যে-সরকার গঠিত হবে, তা হবে সোবিয়েত বিরোধী, আর আমরা তা হতে দিতে পারি না।" (St. Petersburg & Moscow: Barbara Lelvik: Indiana University Press. P 367) শুধু তাই নয়, এই সম্মেলনেই সোবিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির কাছে ২০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি জানায়। যার অর্দ্ধেক পাবে সোবিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিমি শক্তিগুলি এই দাবি স্বীকার করেনি। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে শিল্পের যন্ত্রপাতি জার্মানি থেকে নেবার দাবি মেনে নেয়। যুদ্ধের পর জার্মানির সামরিক ও বেসামরিক জাহাজগুলিকে বিজয়ী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পটসডাম সম্মেলনে সোবিয়েত ইউনিয়ন তুরস্কের কাছ থেকে কারস এবং আর্দাহান ফিরে পাওয়ার দাবি জানায়, যেগুলি লেনিন বিপ্লবের পর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তুরস্ককে।

ইয়াল্টাতেও আমরা দেখি সোবিয়েত ইউনিয়নের একই চেহারা। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের শর্ত হিসাবে তার দাবি ছিল, ১৯০৫ সালে জারের হাত থেকে যে সব অঞ্চল জাপান ছিনিয়ে নিয়েছিল সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। এতে ছিল ডালনিও এবং পোর্ট আর্থার বন্দর, সাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশ, কোরিয়ার উপর কর্তৃত্ব, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের উপর কর্তৃত্ব এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ। তাই ১৪ই আগস্ট ১৯৪৫-এ জাপান যখন আত্মসমর্পণ করে। তখন মাঞ্চুরিয়া, সাখালিন, উত্তর কোরিয়া এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে আত্মসমর্পণ করেছিল লাল ফৌজের কাছে। বিপ্লবপূর্ব রুশ সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল লাল ঝাণ্ডার নীচে।

একই ছবি আমরা দেখি ইউরোপে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে এক জোট হয়েই ভাগ করা হয়েছিল ইউরোপকে নিজের নিজের প্রভাবিত এলাকাতে। চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি রুমানিয়া, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোলাণ্ড ও পূর্ব-জার্মানি চলে এল সোবিয়েত প্রভাবিত এলাকাতে। নির্বাচিত সরকারগুলি ভেঙে দিয়ে লাল ফৌজের ছত্রচ্ছায়ায় তৈরি হল একের পর এক রাষ্ট্র। রুশ প্রভাবিত এলাকাতে লাল ফৌজের ঘাঁটি গড়া হল, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির নাকের ডগাতে এক রকম বিনা প্রতিবাদেই। বাকি সব রইল পশ্চিমি প্রভাবিত এলাকা হিসাবে। হাঙ্গেরি, চেকোস্লভাকিয়া ও বার্লিনে লাল ফৌজের হস্তক্ষেপ অথবা গ্রিসের কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানকে যখন ব্রিটিশ সৈন্যরা কচুকাটা করেছিল (কারণ গ্রিস ছিল, ব্রিটিশ প্রভাবিত এলাকার মধ্যে) তখন কোনও পক্ষই এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়নি, কারণ ছিল এই গোপন ভাগাভাগির চুক্তি।

**মধ্য এশিয়া এবং সোবিয়েত রাশিয়া:**

মধ্য এশিয়ার যে রাষ্ট্রগুলি পরবর্তীকালে সংগঠিত হয়েছিল, তারা ছিল প্রধানত তুর্কি ভাষাভাষি অঞ্চল। তুর্কমেন, উজবেকিস্তান, কাজাক, তাজিকিস্তান, কিরগিজিয়া এর অন্তর্গত। এদের আলাদা রাজ্য গঠন করার পিছনে কোনও বৈজ্ঞানিক নীতি ছিল না। সুবিধে ছিল যে এরা তখন ছিল মধ্যযুগে তাই এদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব যতটা ছিল জাতীয়তার প্রভাব ততটা ছিল না। স্বাধীনতার বেশির ভাগটাই ছিল রুশদের হাতে কারণ স্থানীয় লোকরা শিক্ষদীক্ষায় ছিল অনেক পেছিয়ে। ১৯২৫-এ যখন এই সব রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয় তখন ওই সব স্থানের পার্টিতে ছিল রাশিয়ানদের প্রভুত্ব। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ১৯২৫ সালে উজবেকিস্তানের মোট পার্টি সভ্যের মধ্যে রাশিয়ানরা ছিল শতকরা ৪০ জন। ১৯৩৪-এ তা কমে আসে ১৬.৮ এ আবার যুদ্ধের সময় তা বেড়ে হয় ৩৪.৪-এ। এরপর ক্রুশ্চেভের আমল থেকে তা কমতে আরম্ভ করে — ১৯৯০ সালে তা হয় ১৩.৬।

[Source for 1925-79, KOMMUNISTICHESKAYA UZBEKISTANA V TSIFRKH (The Communist Party of Uzbekistan in figures) Tashkent, Uzbekistan, for 1981-90, Partinaya Zhin (Moscow), No.4, 1990 PP 69-70.]

শহরের জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ ছিল রাশিয়ান। উজবেকরা প্রধানত ছিল গ্রামাঞ্চলে চাষবাস নিয়ে। যে শিল্পাঞ্চলগুলি গড়ে উঠছিল সেখানে রাশিয়ানরাই কর্তৃত্ব করত এমনকি এখনও এখানের সুতাকলগুলির শ্রমিকরা হচ্ছেন রুশ মহিলা। এত বছরেও মুসলিম মহিলাদের শিল্পের কাজে টেনে আনা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৩ সালে উজবেকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.৬ জন ছিল রাশিয়ান। ১৯৩৯ তে ১১.৫। ১৯৫৯ তে ১৩.৫। ১৯৭০ তে ১২.৫। ১৯৭৯ তে ১০.৮। ১৯৮৯ তে ৮.৩। কমার কারণ, ততদিনে উজবেক জাতীয়তার জন্ম হয়েছে এবং রুশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে বাধা হয়ে চলে গিয়েছেন মূল রুশ ভূখণ্ডে। সংখ্যার দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে ১৯৮৯ সালের উজবেকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় দু কোটি এবং এর মধ্যে রাশিয়ানদের সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ।

উজবেকিস্তানের স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের ভাগ্য সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্য রাষ্ট্রের কমিউনিষ্টদের মতোই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। সবই নির্ভর করত কেন্দ্রের কমিউনিষ্ট নেতাদের মর্জির উপর। বিপ্লবের সময়কার নেতা ফয়জুল্লা খোজ্জায়েভ ও আক্‌মল ইকরামভকে মস্কো বিচারের শিকার করে বুখারিনদের মতোই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে উজবেক পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির মোট ২৬১ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ৬২ জনের স্থান হয়েছিল ১৯৯০ এর পার্টি কংগ্রেসে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ এর ভেতর ৫৮,০০০ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি বিতাড়িত হয় দুর্নীতির অভিযোগে। সোবিয়েত আমলে অন্য সব রাষ্ট্রের মতোই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের সর্বত্র।

মধ্য এশিয়ার এই রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ গবেষণার অন্ত নেই। এর প্রধান কারণ এরা মুসলিম। প্রশ্ন উঠেছে এরা সত্যিই পাকিস্তান বা ইরানের ধর্মীয় গোঁড়ামির পথে যাবে কি না। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এরা মূলত তুর্কি ভাষাভাষি এবং এদের নাড়ির টান রয়ে গিয়েছে তুরস্কের সঙ্গে এবং তুরস্ক আতাতুর্কের আমল থেকেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এসেছে। কমিউনিষ্ট প্রভাবের সঙ্গে এই ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের প্রভাব এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কম নয়। জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ এই মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে ভবিষ্যতে যদি কোনও তুর্কিস্থানি ফেডারেশনে আবদ্ধ করে তা হলে চমকে ওঠার কিছু নেই, কারণ অর্থনৈতিক ভাবেও এরা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। এত কথা উজবেকিস্তান সম্পর্কে বলা হল কারণ উজবেকিস্তানই ছিল স্তালিনের কাছে "Beacon for the East", (উজবেকিস্তান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য Problems of Communism সাময়িক পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধের নাম: Uzbekistan and Uzbeks by Donald. S. Carlisla)

**ইতিহাসের শিক্ষা :**

আজকে যে কথা সকলের সামনেই পরিষ্কার তা হল শুধু বিপ্লবী ঘোষণাতেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, শুধু সোবিয়েত ইউনিয়নই নয়, অন্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেমন হয়নি চিন অথবা যুগোস্লাভিয়াতে। উগ্র জাতীয়তাবাদের হাত থেকে কমিউনিষ্টরা নিজেদের আজও মুক্ত করতে পারেনি। চিন এখনও তার পুরনো সাম্রাজ্যের সীমানা উদ্ধারের প্রচেষ্টায় রত। যুগোস্লাভিয়া তার সার্বিয়ান উদ্ধত বাদ দিয়ে চলতে নারাজ। আর আমাদের দেশও তার হাত থেকে মুক্ত নয়।

যেটা প্রয়োজন সেটা হল গণতন্ত্রের প্রসার। প্রসার সাংস্কৃতিক মানের। গণতন্ত্র মানে যদি শুধু ভোটের অধিকার হয়, যদি শুধু নিজের কথা ভাবা হয় তাহলে এর হাত থেকে পৃথিবী মুক্তি পাবে না। যেদিন মানুষ অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াতে শিখবে। সেদিনই সত্যিকারের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জমি তৈরি হবে। তা যতদিন না হবে তা হয়ে থাকবে প্লেখানভের ভাষায়: The battle cry of World Social-Democracy, 'Workers of all countries unite' would be a shameful lie upon our lips. আর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বার বার ডুবে যাবে অন্ধ জাতিয়তাবাদের পাঁকে। যেমনভাবে ডুবেছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা প্রথম মহাযুদ্ধের কালে, যেমনভাবে ডুবে গেলেন লেনিনের উত্তরসূরিরা অক্টোবর বিপ্লবোত্তর কালে। □

# ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

(১০)

সম্ভবত সাঁওতাল সমাজে হিন্দু-প্রভাবের এ সীমাবদ্ধতার জন্যই ১৮৬০'এর দশকে সাঁওতালদের নিয়ে দুই সরকারী আমলা — মান (Man) এবং হাণ্টার (Hunter)-এর লেখা দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থে[১০৮] এ প্রভাবের উল্লেখ প্রায় নেই বল্লেই চলে। মানের লেখায় সাঁওতাল জগতের দুটি দিক্ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে — সাঁওতাল সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা, এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত সাঁওতাল গোষ্ঠীদের মধ্যেও গভীর সাযুজ্যবোধ।[১০৯] হাণ্টার তো সাঁওতাল সংস্কৃতিতে হিন্দু প্রভাবের অস্তিত্বই সরাসরি অস্বীকার করেছেন; আরও বলেছেন, হিন্দুদের কোনও কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুষ্ঠান ও আচারের ক্ষেত্রে সাঁওতাল প্রভাব অনস্বীকার্য।[১১০]

ধরতে গেলে ১৮৭০'এর দশক থেকে হিন্দু-প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর পরিচয় মেলে তখনকার সরকারি দলিলে, বিশেষ করে খেরওয়ার আন্দোলন[১১১] সংক্রান্ত নানা প্রতিবেদনে। বস্তুত, খৃষ্টান মিশনারিদের অল্প সংখ্যক চিঠিপত্র ছাড়া এ আন্দোলন বোঝার জন্য আমাদের প্রধান নির্ভর সরকারি দলিল। এ দলিল অবশ্য শুধুমাত্র সরকারি আমলাদের বিবরণ নয়। প্রশাসন-বহির্ভূত স্থানীয় নানা জনের কাছেও সরকার এ আন্দোলনের পটভূমিকা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। আন্দোলনের জটিল প্রকৃতি বোঝার জন্য এদের পাঠানো উত্তর বিশেষ মূল্যবান উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়।

এ আন্দোলনে হিন্দু-প্রভাবের নিদর্শন হিসাবে সরকারি দলিলে উল্লেখিত নানা তথ্য আমরা আগেই জেনেছি।[১১২] হিন্দু-প্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে সরকারিমহলে ব্যাপক এক ধারণা ছিল। আদিবর্ষ ছেড়ে সাঁওতালরা 'হিন্দু হয়ে যাচ্ছে।' তারা 'চারপাশের হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে'। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য দুটি প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। হিন্দু-প্রভাব বিস্তারের আসল প্রেক্ষাপটটি কি? সাঁওতালরা হিন্দু হয়ে যাচ্ছে — এ ধারণা কি যথার্থ?

অল্প সংখ্যক সরকারি আমলা এ প্রেক্ষাপটের জটিলতা বুঝতে চায়নি। তাদের মতে আগের অনেক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মতো খেরওয়ার আন্দোলনও নেতাদের (এ ক্ষেত্রে ভগীরথ মাঝির) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র।[১১৩] আন্দোলনের পেছনে বিপুল গণ-সমর্থনের কথা তারা অস্বীকার করেনি। কিন্তু তাদের ধারণা জনসাধারণ আসলে বিভ্রান্ত; নেতাদের কথা তারা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে।

এ ব্যাখ্যা কিন্তু সব আমলারা মোটেই মেনে নেয়নি। তাদের প্রতিবেদনে নানা স্ববিরোধ অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার কারণ অন্য। আন্দোলনের জটিল প্রকৃতি তারা বুঝতে চেয়েছে; এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যাও করতে চেয়েছে। আসল সঠিক ব্যাখ্যা সহজ ছিলনা; কারণ এ আন্দোলনে হিন্দু প্রভাবের বিশিষ্ট রূপ আগে কখনও এত স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। এই সময় হিন্দু প্রভাব বিস্তারের বিশিষ্ট পটভূমিকার একটি দিক্ আমলাদের অনেকেই মেনে নিয়েছিল। তা হল, এ প্রভাব স্বল্প সংখ্যক বিচ্ছিন্ন সাঁওতাল পরিবারের স্বতন্ত্র উদ্যোগের ফলে ঘটেনি;[১১৪] উদ্যোগ এখানে ছিল যৌথ। প্রাথমিক উদ্যোগ কয়েকজন নেতার, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতে সাড়া মিলেছে বহু জনের; এ উদ্যোগে যেন প্রতিফলিত হয়েছে অনেকের আশা ও স্বপ্ন। আমরা পরে দেখব, সরকারি প্রতিবেদনে এ আশা ও আকাঙ্ক্ষার আসল রূপ কদাচিৎ ধরা পড়েছে।

হিন্দুজীবন-চর্যার কোনও কোনও দিক্ গ্রহণে সাঁওতালদের একাংশের গভীর আগ্রহ এবং উৎসাহের কারণ সম্পর্কে একটা বিশেষ সরকারি ধারণা আসলে এ সম্পর্কে জমিদার, মিশনারি

এবং অন্যান্য স্থানীয় লোকের মতের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। নানা জনের সঙ্গে কথা বলে সাঁওতাল পরগনার সহ-কমিশনার ক্যাপ্টেন কার্‌নাকের (Carnac) ধারণা হয়েছিল, সাঁওতালদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্লেষ ও বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য তাদের মনে এক তীব্র গ্লানিবোধের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা তাদের হামেশাই বলত, 'বোকা সাঁওতাল', 'বন্য সাঁওতাল'। এ হীনম্মন্যতার ভাব দূর করার জন্যই সাঁওতালরা নিজেদের ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের কথা ভেবেছিল। সাঁওতালরা নাকি বিশ্বাস করত এ সংস্কার ছাড়া তাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা এর ফলে 'রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের' কথাও বলেছে।[১১২]

খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কে পরবর্তী কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদের ধারণার সঙ্গে এ মতের খানিকটা মিল লক্ষ করা যায়। হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ে পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণে নানা প্রবণতার কথা আমরা পরে আলাদা ভাবে আলোচনা করব। তবুও সাঁওতাল-হিন্দু সাংস্কৃতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের নিদর্শন হিসাবে নৃতত্ত্ববিদ মার্টিন ওরান্সের খেরওয়ার আন্দোলন বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।[১১৩] হীনম্মন্যতার ভাব থেকে সংস্কারের মাধ্যমে সাঁওতালরা নানা আচার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমগোত্রীয় হবার এবং নিজেদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল — আগে উল্লেখিত এ মতের সঙ্গে ওরান্সের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর বিশ্লেষণের রীতি আলাদা এবং এর পরিধিও অনেক ব্যাপক।[১১৪]

ওরান্সের মতে, 'হুলের' আগেও হিন্দু-প্রভাব লক্ষ করা গেলেও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে হুলের পরে। এর সরল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ওরান্স হুলের ব্যর্থতার তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এ ব্যর্থতা থেকে সাঁওতালদের নতুন এক উপলব্ধি ঘটল। তা হল, সহিংস্র পথ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক উপায়ে তাদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। তাই রাজনৈতিক পথ বর্জন করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাদের পদ-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হল। হুলের 'ঠিক পরেই' তাই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু। যার মূল লক্ষ্য এ বিশেষ ধরনের উন্নয়ন (rank improvement) সাধন। হিন্দুদের মূল্যবোধ গ্রহণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। সাঁওতালদের এ ধারণার একটা বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে, তারা মেনে নিয়েছে হিন্দু-দিখুরা পদমর্যাদায় উন্নততর।[১১৫] এ মতের আলোচনায় দুটি প্রশ্ন বিচার্য। এক: হুলের ব্যর্থতার ফলে বিদ্রোহী সাঁওতালদের আশা-ভঙ্গ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা কি 'রাজনৈতিক পথ' সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল? দুই: 'পদ-মর্য্যাদার উন্নয়ন'— হিন্দু-প্রভাব স্বীকারে ও গ্রহণে সাঁওতাল মানসিকতার এই কি আসল চরিত্র? সাঁওতালরা 'হিন্দু হয়ে যাচ্ছে', বা 'হিন্দু-সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে' —সরকারি মহলের এ ধারণার সারবত্তা বিচারে এ আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

ব্রিটিশ পুলিশ এবং সামরিক শক্তির ভয়াবহ অমোঘতা সম্পর্কে বিদ্রোহী সাঁওতালদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আন্দোলনের কৌশল হিসাবে আবার হিংসার পথ বেছে নিতে তারা নিঃসন্দেহে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু তার অর্থ 'রাজনৈতিক পথে'র নির্বিচার বর্জন নয়। সংঘবদ্ধ হিংসা নানা 'রাজনৈতিক পথের' অন্যতম মাত্র। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠেনা, কারণ ছিল পরবর্তী সাঁওতালি মানসিকতার মূল লক্ষণ এই যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা না হলে হিন্দু-প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা তখন দিখুদের সঙ্গে জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক।

এ বিশিষ্ট রাজনৈতিক মেজাজ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু থেকে (১৮৭৪); কিন্তু ১৮৬০ এর দশকের নানা আঞ্চলিক আন্দোলনেও এ মানসিকতা লক্ষণীয়। ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহী চেতনার বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি বার বার ফিরে আসছিল।[১১৬] এ চেতনার দুটি প্রধান দিক: সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, আর এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনও নেতার উপর নির্ভরশীলতা। যেমন ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে গুজব রটল, হাজারিবাগের শ্রীরামপুর অঞ্চলে এক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে; ফলে দলে-দলে সাঁওতালরা এ দেবতার দর্শনের জন্য যাচ্ছে। পরে জানা গেল, এ দেবতা আর কেউ নয়, ও সময়কার সাঁওতাল আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা, কারু মাঝি। কারুকে তার অনুগামীরা 'গোসাঁই' বলে ডাকত। কারু সম্ভবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত।

খেরওয়ার আন্দোলন প্রধানতঃ সামাজিক পদ-মর্য্যাদা উন্নয়নের আন্দোলন, রাজনৈতিক পথ বা সংগঠনের সঙ্গে তার যোগ নেই — ওরান্সের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়। সরকারি সূত্রে পাওয়া নানা মূল উপকরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাজনৈতিক লক্ষ্য-সিদ্ধিই এ আন্দেলনের আসল রূপ। সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি এ সিদ্ধির একটা উপায় মাত্র। তাছাড়া আমরা দেখব শুধুমাত্র এ পদ-মর্যাদা বাড়ানোর জনাই সাঁওতালরা হিন্দু-বিশ্বাস, আচার ও রীতি-নীতি গ্রহণে উন্মুখ হয়নি।

এ আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের অনেকেই এর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ঝোঁকের — কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনওবা অতি প্রকট — কথা বলেছে।[১১৭]



এ আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান নেতা ভগীরথ মাঝির নানা ঘোষণায় এ ঝোঁক সুস্পষ্ট। সাঁওতাল-'রাজনীতি'র সঙ্গে তার যোগ এ আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই ছিল। ১৮৬৮ সাল থেকেই এ যোগের প্রমাণ মেলে। ওই বছরই তাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। সে নাকি রটনা করে বেড়াচ্ছিল, ব্যাপক এক সাঁওতাল বিদ্রোহ আসন্নপ্রায়। বিহারে ১৮৭৩-৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ভগীরথের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল অনেক বেশী ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সরকার থেকে পাওয়া চালের বন্টন সম্পর্কে সাঁওতালদের তীব্র অসন্তোষ ছিল। দুর্ভিক্ষের পর এ চালের কিছু মূল্য সরকার ফেরৎ চাইলে এর বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রায় বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছয়। অবশ্য 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' ভঙ্গের ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। 'ভগীরথ তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, এ চালের দাম তারা ফেরৎ দেবেনা কারণ এ শস্য তাদের পিতৃপুরুষের সম্পত্তি; তাদের আদি নিবাসের অঞ্চল থেকে এ চাল আনা হয়েছে'।

খেরওয়ার আন্দোলনের গোড়া থেকেই এর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে ভগীরথের বিন্দুমাত্র কোনও গোপনীয়তা ছিল না। বাউসি নামক জায়গার এক হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের 'অভিষেক'[১১৮] থেকে এ আন্দোলনের শুরু বলা যায়। এক খ্রীষ্টান মিশনারীর সাক্ষ্য অনুযায়ী এ মন্দিরে ভগীরথকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করা হয়। ধরেই নেওয়া যায়, স্বাধীন সাঁওতাল-রাজের স্বপ্ন অনুগামীদের উদ্দীপিত করেছিল। বস্তুত, ভগীরথের এ 'অভিষেকের' সময় নতুন সাঁওতালরাজের সাফল্য কামনায় 'প্রার্থনা'ও করা হয়ে।

এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সাঁওতালদের অতীত ইতিহাসচেতনা জাগ্রত করার একটা উপায় হিসাবে নেতারা সাঁওতালদের পুরনো 'জাতীয়' নাম 'খেরওয়ার' কথাটা চালু করে। স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে এটাই ছিল তাদের আদি নাম।

আসলে বাউসির মন্দির থেকে ফেরার পর সাঁওতাল মানসিকতার আমূল রূপান্তরের কথা স্থানীয় মিশনারীরা বিশেষভাবে বলে। 'ভগীরথের শিষ্যরা অনবরত বলছিল, তাদের সুদিন আবার আসছে; তাদের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে; সাহেবদের সব খতম করা হবে বা এ মুল্লুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে'।

ভগীরথের গ্রেপ্তারের পর (১৮৭৪?) আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তার দুই প্রধান শিষ্য — জ্ঞান মাঝি ও ধোনা মাঝি। তাদের নানা ঘোষণা এবং কাজ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, গুরুর নির্দেশ এবং আদর্শ থেকে তারা এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি। জ্ঞান মাঝি এক 'দুঃসাহসিক কাজের' পরিকল্পনা নেয়। এক পরোয়ানা মারফত সে সবাইকে বলে, খাজনার নতুন হার চালু না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতালরা কোনও খাজনা দেবেনা; তার ধারণা এ পরোয়ানা জারি করার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তার ছিল; সে বলল 'বড়ো সাহেব' (কমিশনার) তাকে এ অধিকার দিয়েছে। এ 'ধৃষ্টতা'য় তাকে জেলে পোরা হল। ধোনা মাঝির রাজনৈতিক ঘোষণা আরো উঁচু গ্রামের। 'রাজমহলের বড়তলা অঞ্চলে সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সারা দেশে সাঁওতালরাজ কায়েম হয়ে গেছে'। এ ঘোষণার অনিবার্য ফল, তার হাজতবাস।

খেরওয়ার আন্দোলনের এ রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সরকারি আমলাদের মনেও আর কোনও সংশয় থাকলনা। সাঁওতাল পরগনার কমিশনার বার্লোর নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল (৯ মার্চ, ১৮৭৫): 'শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ভগীরথের আন্দোলন শুরু হয়েছে কি হয়নি তা আসল কথা নয়; গোড়া থেকেই এর সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরণের আপত্তিজনক রাজনৈতিক বোধ...আন্দোলনের শুরুতে ভগীরথ নিজে বা তার নিকট অনুগামীরা বলত, এমন সুদিন আসবে, যখন 'রাজ' এবং জমি হবে সাঁওতালদের'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৮৮১–৮২) খেরওয়ার আন্দোলনে এ রাজনৈতিক সুর আরো তীব্র; এবং 'সংস্কার' আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আরো নিবিড় হয়েছে। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সঙ্গে সে সময়কার বিদ্রোহী আইরিশ-কৃষক মানসিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পান (১৮৮১): আইরিশ কৃষকদের মতো 'সাঁওতালদেরও স্বপ্ন এমন দিন আসবে, যখন তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; কোনও খাজনা তাদের দিতে হবে না...একটা জিনিষ আগে অত ভাল করে খেয়াল করিনি, বাইরে হাবভাব যাই থাকুক, ভেতরে ভেতরে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ; বড় একটা পরিবর্তনের জন্য তারা উন্মুখ। 'খেরওয়ার' নাম আসলে সম্পূর্ণ নতুন এক সংগঠনের ইঙ্গিত দেয়; বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ধারণা তাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিলে গেছে'। খ্রীষ্টান মিশনারী কোলের (Cole) ধারণাও (১৮৮১) প্রায় অভিন্ন: 'খেরওয়ার আন্দোলন আসলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন। [আয়ারল্যাণ্ডের] ফেবিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর বহু বিষয়ে মিল।' অবশ্য কোলের একটা ধারণা বিচার-সাপেক্ষ। তাঁর মতে, 'ধর্ম এখন আবরণ মাত্র'। আমরা আগে বলেছি, সামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সংগঠনে ধর্ম মোটেই 'আবরণ', অর্থাৎ বহিরঙ্গ জাতীয় কিছু নয়; এটা আন্দোলনের মূল এক প্রেরণা।

খেরওয়ার আন্দোলনে সাঁওতাল 'রাজনৈতিক পথ' পরিহারের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে ওরান্সের এ ধারণা তাই সমসাময়িক নানা ধরণের মূল উপকরণের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এ আন্দোলন সর্বতোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন।

আসলে এ আন্দোলনে ধর্ম ও রাজনীতির যোগ অবিচ্ছেদ্য।

সাঁওতাল পরগণার সহ-কমিশনার এ যোগের মূল বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন: 'গোড়ায় খেরওয়ার আন্দোলন লক্ষ্যে ছিল শুধুমাত্র ধর্মসম্পর্কিত'; ভগীরথের আমলে 'তা এক রাজনৈতিক রূপ নিল; আন্দোলনের শক্তি যোগাল খেরওয়ার স্বর্ণযুগের কল্পকাহিনী; যেখানে তারা পাবে তাদের মনোমত নেতা [শাসক], আর পাবে অপর্যাপ্ত জমি, যার জন্য কোনও খাজনা দিতে হবে না; থাকবে না শাসানি দেবার জন্য কোনও হাকিম'। সহ-কমিশনার এখানে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক-বিকাশে রূপান্তরের কথা বলেছেন: ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মানসিকতা আগে থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছিল; সংগঠিত খেরওয়ার রাজনীতি এ প্রবণতাকে একটা সুনির্দিষ্ট, যৌথ উদ্যোগের রূপ দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খেরওয়ার আন্দোলনের একটা বিশেষ অঙ্গ 'শুদ্ধি'। কোনও কোনও ঘটনা — যেমন শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলা — আগেই ঘটছিল কিন্তু সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে এর দ্রুত প্রসার এবং ব্যাপকতা এ আন্দোলনের ফল। কারণ, শুদ্ধির কর্মপন্থা ছিল আন্দোলনের নেতা নির্দেশিত, এবং এক্ষেত্রে নেতা ভগীরথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী সাঁওতাল গুরুর মতো তাঁকেও সাঁওতালরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। বাউসির হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের 'অভিষেকে'র (২৪ জুলাই ১৮৭৪) পর তার এ নির্দেশ লঙ্ঘন তার অনুগামীদের কাছে আন্দোলনের পরিপন্থী আচরণ বলেই গণ্য হত। সেখানে প্রায় বারোশ' সাঁওতালের জমায়েতে ভগীরথ এ শুদ্ধির কথা বলে। এক খ্রীষ্টান মিশনারীর বিবরণ অনুযায়ী, যারা 'শুদ্ধ' হয়নি, তাদের বাউসির মন্দিরে এবং তালদিহার নতুন সাঁওতাল মন্দিরে উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হত না। সাধারণ সাঁওতালের পক্ষে শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিলনা, কারণ বহুক্ষেত্রে এদের প্রতিপালন সাঁওতাল-জীবিকার একটা অঙ্গ ছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে এ শুদ্ধি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বলে সাংগঠনিক দিক থেকেও এর বিশিষ্টতা ছিল। শুদ্ধি-কর্মপন্থায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত এক অনুগামী, সম্ভবত ক্ষুদ্র, গোষ্ঠী এ কর্মপন্থার প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তাছাড়া রাজরোষ এড়ানোর জন্য এ সংগঠনকে যথাযথ গোপনীয় রাখার চেষ্টা ছিল। সমসাময়িকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রধানত জনবিরল অঞ্চলে রাত্রে অনুগামীদের বৈঠক বসত।

শুদ্ধি আন্দোলনের মূল প্রেরণা প্রধানত রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বলেই এর লক্ষ্যকে শুধুমাত্র 'সামাজিক পদ-মর্যাদার উন্নয়ন' বলা অসঙ্গত। এ আন্দোলনের ফলে সাঁওতালরা হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে এ ধারণাও ভ্রান্ত। তখনকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক মেজাজের জন্যই হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস আর আচারের কিছু-কিছু গ্রহণ করলেও সাঁওতালরা মনেপ্রাণে সাঁওতাল থেকে গেছে। বস্তুত তারা হিন্দু হতে চায়নি। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, হিন্দুমূল্যবোধ গ্রহণের ফলে হিন্দুদের প্রভুত্বের বদলে সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

'সংস্কার' আন্দোলনের ফলে সাঁওতাল সমাজে এক ধরণের সামাজিক বৈষম্য আর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। যারা শুদ্ধির কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে, তারা আলাদা ভাবে চিহ্নিত হল — 'সাফা হোর' (শুদ্ধ মানুষ)। যারা তা গ্রহণ করেনি তাদের পরিচয় ছিল 'ঝুটা' সাঁওতাল বলে। কিন্তু এ বৈষম্য বা ব্যবধান হিন্দুজাতিভেদপ্রথা-প্রসূত নয়। এ ব্যবধানের কারণ 'ঝুটা'দের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে 'সাফা'দের তীব্র অসহিষ্ণুতা; তাদের ধারনা ছিল, ঝুটাদের 'সংস্কার' বিরোধিতা নতুন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার পথে বড় এক অন্তরায়। তাছাড়া 'সাফা'দের কেউ-কেউ উপবীত ধারণ করেছিল; কিন্তু তাও হিন্দু বর্ণবৈষম্যের দ্যোতক নয়। খেরওয়ার নেতারা কেউ কখনও বলেনি যে, উপবীত ধারণের অধিকার সবার নেই। রাজবংশী আন্দোলনের সঙ্গে সাঁওতাল শুদ্ধি আন্দোলনের একটা মৌলিক তফাৎ এখানেই। বিত্তশালী এবং উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী রাজবংশী নেতারা সর্বস্তরের রাজবংশীদের উপবীতধারণের অধিকার অস্বীকার-ই শুধু করেনি; এ অধিকারের দাবিকে তারা ধৃষ্টতা মনে করেছে, এবং সর্বতোভাবে এ দাবিকে বাধা দিয়েছে।[২১৯]

রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার পরও 'সাফা' ও 'ঝুটা' সাওতালদের মধ্যে বৈষম্যবোধ কোথাও কোথাও স্থায়ী হয়ে গেছে; এ বৈষম্য আসলে এক ধরণের দূরত্ব; তা হিন্দু সমাজের উচ্চ-নীচ বর্ণভেদ বোধের সমার্থক নয়।

## (১০.১)

১৮৮২ সালের পর থেকে খেরওয়ার প্রতিবাদী আন্দোলনের সংগঠিত রূপ আর দেখা যায় না। সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হলেও এটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ব্যাপকতা কমে আসে; সাঁওতাল জগতের কয়েকটা মাত্র এলাকায় তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। মহামারী, ব্যাপক শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ — এ ধরণের বড় বিপর্যয়ের সময়ে এ আন্দোলনের আদর্শ এবং লক্ষ্য আবার সাঁওতালদের অনুপ্রাণিত করেছে।[২২০] আবার তারা ভাবে, এ সব নিত্য-আবৃত্ত দুর্দশা ও 'জাতীয়' গ্লানির অবসান ঘটবে কেবল মাত্র নতুনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। আর খেরওয়ার আন্দোলনই এর উপযোগী ভাবাদর্শ জুগিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটা বিশেষ পর্যায় — যেমন অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য



আন্দোলন বাদ দিলে, এ প্রেরণা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কোথাও আগেকার মতো বড় আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

খেরওয়ার আন্দোলনোত্তর সাঁওতাল জগতের ইতিহাসও আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরের জন্য। ব্যাপক আন্দোলনের তীব্রতার মুহূর্তগুলিতে হিন্দু প্রভাবের যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা আগে বিশ্লেষণ করেছি, পরে এতে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল কি? আমরা দেখেছি, হিন্দু প্রভাব, অর্থাৎ হিন্দুদের কোনও কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ধারণা, সামাজিক আচার ও রীতিনীতির স্বীকৃতি এবং অনুসরণ সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্য-চেতনার পরিপন্থী মোটেই ছিলনা। এ প্রভাবের ফলে তারা দৈনন্দিন জীবন-চর্যার কোনও কোনও দিক বর্জন করেছিল ঠিকই; কিন্তু এর অর্থ তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের বিস্মরণ নয়। বরং তারা নিজেদের সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়; এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা বাড়ে; নতুনভাবে তাদের ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যার একটা প্রধান দিক সামগ্রিকভাবে তাদের ইতিহাসের নতুন মূল্যায়ন। এ নিবন্ধের পরবর্তী অংশে, মুন্ডা-ওরাঁও ও হো'দের আন্দোলন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, আমরা দেখব, এ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য-চেতনা সৃষ্টির জন্য নেতাদের বিশেষ উদ্যোগ ছিল। 'শুদ্ধি'র মানসিকতার দিক থেকে বিচার করলে, খেরওয়ার আন্দোলনের পরবর্তী সময়কার ইতিহাসে কয়েকটা প্রবণতা ও ধারা উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটা এলাকা যেমন পাকুড়, দুমকা এবং গোদা মহকুমার কিছু অংশ বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই 'শুদ্ধি' আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। আমরা দেখেছি, আন্দোলনের সময়েও নেতাদের নির্দেশিত নতুন জীবন-চর্যার কোনও কোনও বিধি বিধান অনেক সাঁওতাল স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়নি। আসলে মানা সহজ ছিলনা। কারণ, এতে বহু সাঁওতালের জীবিকাই বিপন্ন হয়ে পড়ত। যেমন, একটা বিশেষ নির্দেশ ছিল, তারা তাদের পোষা শূয়ার, মোরগ-মুরগি মেরে ফেলবে। অনেক সাঁওতাল পরিবারের রোজগারের একটা বড় অংশ আসত এখান থেকে। তাছাড়া, নেতাদের সব নির্দেশ মানতে গেলে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার বহু দিক হঠাৎ বাদ দিতে হয়। অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল সহজাত; এতদিন তা নিয়ে সংশয় ছিলনা, কোনও প্রশ্ন উঠেনি। আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে এদের বিকল্পগুলির তাৎপর্য সম্পর্কেও অনেক সাঁওতালের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। ফলে আন্দোলনের বিরুদ্ধতা না করলেও নতুন বিশ্বাস এবং নৈতিক ধারণা মেনে নিতে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না।

পুরনো জীবন-যাত্রায় ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষেও অত সহজ হত না, যদি না আন্দোলনের লক্ষ্য বিফল হত! কিন্তু আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত হতাশা এবং বিভ্রান্তির মুহূর্তে তাদের কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। ১৮৮২ এর পরবর্তী বছরগুলিতে এ প্রবণতা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদি এ পরিবর্তন সর্বব্যাপী এবং সম্পূর্ণ হত তাহলে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের সাম্প্রতিক ধারাটা হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। এমনকি খেরওয়ার আদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান সাঁওতালরাও সবাই এ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সাঁওতাল মানসিকতায় এ বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বৈষ্ণব গুরুদের (যাদের সাঁওতালরা 'বাবাজি' বলত) সম্পর্কে তাদের মনোভাব আলোচনা করতে পারি। বহুজায়গায় এই গুরুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক টিকে ছিল। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে তাদের ভূমিকার রূপ পাল্টে গেল। গুরুদের নির্দেশ আগে ছিল নতুন নৈতিক জীবন এবং আদর্শ সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা। এখন তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল সাঁওতালদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের আশু প্রয়োজন মেটানো, বিশেষ করে আধি-ব্যাধির নিরাময়। এটা লক্ষণীয় এ ক্ষেত্রে সচরাচর বাবাজিদের কোনও বিশিষ্ট এবং স্বীকৃত ভূমিকা ছিল না। সাঁওতালরা এর জন্য নির্ভর করত প্রধানত দু'ধরনের কুশলী ব্যক্তির উপর। Bodding এর গবেষণা[২২১] থেকে জানতে পারি, একদল ছিল 'প্রাকৃতিক' চিকিৎসায় নিপুণ। রোগ-সারানোয় নানা গাছ-গাছড়া, লতা পাতার গুণাগুণ সম্পর্কে তাদের ছিল বিশেষ জ্ঞান।[২২২] আর এক দলের পরিচিতি ছিল 'ওঝা' বলে। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে 'প্রাকৃতিক' উপায়ের স্থান অবশ্যই ছিল। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ছিল, তাদের প্রধান নির্ভর ছিল তুকতাক এবং মন্ত্র শক্তির উপর অধিকার। এখন সাঁওতালরা ধরে নিয়েছিল, বাবাজিদের রোগ-সারানোর ক্ষমতা তাদের অতিপ্রাকৃত শক্তির ফল। আসলে এ ক্ষমতা বহুলাংশে সাঁওতালদের দ্বারা আরোপিত।

সাঁওতাল পরগনা জেলার গ্যাজেটিয়ার (১৯১০) সংকলনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের পাঠানো প্রতিবেদনে বাবাজিদের এ ভূমিকার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।[২২৩] তাদের উপর সাঁওতালদের বিপুল আস্থা সম্পর্কেও কোনও সন্দেহ থাকে না। 'বাবাজিরা যা বলে, সাঁওতালরা তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। ফলে রোগ-সারানোর অন্য প্রচলিত উপায়গুলি কাজে না এলে তারা বাবাজির আশ্রয় নেয়। বাবাজির প্রধান আস্তানা যে গ্রামে, সেখানে অগণিত লোক রোগ নিরাময়ের জন্য তার কাছে যায় — শুধুমাত্র তাদের নিজেদের এবং আত্মীয় পরিজনের জন্য নয়, বাড়ির গবাদি পশুর জন্যও। এখানে রাজনীতির কোনও ভূমিকাই নেই। ১৯২১ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে[২২৪] খারওয়ারদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর গুরুদের সম্পর্কেও Badding একই কথা বলেছেন: 'তারা এক ধরণের ভূতের রোজা'।[২২৫]

বাবাজিদের আসলে সাঁওতালি ওঝাদের সমগোত্রীয় ভাবা হয়েছে। ওঝাদের রোগ-সারানোর কৌশল সম্পর্কে আগেই

উল্লেখ করেছি। বাবাজিদের এ ধরণের ভূমিকার কথা বোঝানোর জন্য ওঝাদের কায়দা কানুনের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক হবে। Bodding এর ধারণা আদিতে ওঝাতন্ত্র মোটেই সাঁওতাল সমাজের প্রথা নয়; কারণ সাঁওতালি ভাষায় 'ওঝা' বলে কোনও শব্দ নেই; হিন্দিভাষী অঞ্চল থেকে এ শব্দ নেওয়া; ওঝানকার হিন্দু ওঝারা যে ধরণের তুক্‌তাক্‌ ও মন্ত্র ব্যবহার করে, সাঁওতালি ওঝারা প্রায় তাই করে। Bodding আরও বলেছেন, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে হিন্দু ওঝারা যে সব দেবদেবীর নাম নেয়, সাঁওতালি ওঝার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনও পার্থক্য নেই। অবশ্য সাঁওতাল ওঝারা তাদের কোনও কোনও আঞ্চলিক বোঙ্গাকেও স্মরণ করে।

সাঁওতাল জগতে ওঝাতন্ত্রের প্রচলন সম্পর্কে এ বিতর্ক অর্থহীন।[২২৯] এর উদ্ভব যে ভাবেই ঘটুক না কেন, তা সাঁওতাল ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে। রোগ সারানো পদ্ধতি বিষয়ে বাবাজিদের সঙ্গে সাঁওতাল ওঝার বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। ওঝাতন্ত্রের একটা প্রধান ভিত্তি মন্ত্রশক্তির বাবহার। এ সম্পর্কে মূল যে ধারণা, তাহল — ব্যাধির উৎপত্তি সবক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণে নয়, বাইরের কোনও অদৃশ্য অশুভশক্তির হস্তক্ষেপের ফলে; তাই এ শক্তির বিনাশ না ঘটলে ব্যাধির কোনও প্রতিকার সম্ভব নয়। ওঝাদের নানা রীতিনীতি এ বিনাশের প্রস্তুতি মাত্র। কিন্তু এ বিনাশের কৌশল শুধুমাত্র বিশেষ কুশলী এক ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টায় সফল হবেনা। ওঝার নির্দেশিত অনুষ্ঠানে সাঁওতাল সমাজের বহু মানুষের সম্মিলিত যোগদান এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অশুভশক্তিবিরোধী মন্ত্রোচ্চারণে ওঝার গানে অনেকে যোগ না দিলে তাতে কোনও ফল হবে না।

আগেই বলেছি, এখানে দুটো পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে ওঝা হিসাবে বাবাজিদের ভূমিকা একেবারেই ছিল না বলা ভুল হবে। এখন এ ভূমিকার ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। Bodding বলেছেন, সাঁওতাল ওঝার কারিকুরি বহুক্ষেত্রে বিফল হত বলেই বাবাজিদের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আগে বাবাজিদের অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলেও রোগ সারানোর ব্যাপারে এ বিশ্বাস অত ব্যাপক ছিল না। খেরওয়ার আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেও বাবাজিদের সম্পর্কে সাঁওতালদের আগেকার সম্ভ্রম নষ্ট হয়নি। সাঁওতালরা গুরুর ওপর এ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকার বিনা দ্বিধায় আরোপ করেছেন।

সাঁওতাল ওঝা এবং বাবাজিদের পদ্ধতিতে Bodding কিন্তু একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। অশুভ বোঙ্গাদের বিরুদ্ধে বাবাজিদের প্রধান নির্ভর ছিল 'রামচান্দো'র (রামচন্দ্র) করুণা।[২২৯] নানা হিন্দু আচার গ্রহণ করলেও সাঁওতাল ওঝাদের ক্ষেত্রে এ দেবতার স্মরণ প্রথাসম্মত ছিল না।

খেরওয়ার আন্দোলনের পরবর্তী সাঁওতাল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা ধারার মধ্যে একটা মাত্র আমরা উপরে আলোচনা করেছি। আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, যারা খেরওয়ার আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তারা এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। বৈষ্ণবগুরুদের সম্পর্কে তাদের মনোভাবকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়েছি। এ গুরুদের সঙ্গে তাদের পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তবে সাঁওতাল গ্রামে গুরুদের ভূমিকা এখন কোনও বিশেষ অর্থে হিন্দু প্রভাবের সমার্থক নয়। নিত্যন্ত ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই সাঁওতালরা বাবাজিদের স্বীকার করে নিয়েছে। তবে একটা প্রধান পরিবর্তন লক্ষণীয়। রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রেও বাবাজিদের অতিপ্রাকৃত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সাঁওতালরা এখন তাদের উপর আরোপ করল।

সাঁওতাল ইতিহাসের অন্য কয়েকটা ধারা এবার আমরা আলোচনা করব। এখানে আমরা একটা ভিন্ন চিত্র পাই। সাঁওতালরা এখনও খেরওয়ার গুরুনির্দেশিত জীবন-চর্যা অনুসরণ করে চলেছে; অবশ্য তাদের সংখ্যা কম, এবং কয়েকটা মাত্র অঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। এখানেও কিন্তু দেখা যায়, হিন্দু প্রভাব যেভাবে সক্রিয় থেকেছে, তার দুটি স্তর। একদিকে গুরুরা বারবার বিশুদ্ধ খেরওয়ার আদর্শের কথা বলেছে; ফলে সাঁওতালি ঐতিহ্যসম্মত অনেক আচার, প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান বাদ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে কিন্তু খেরওয়ার আচার অনুষ্ঠানের নানা অংশে বহু সাঁওতাল বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে।

খেরওয়ার সংগঠন টিকে থাকলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে এ সংগঠন নানা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। আলাদা আলাদা এলাকায় তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে Bodding এ রকম তিনটে গোষ্ঠীর কথা জানতে পারেন: সাফাই, সামরা, বাবাজি।[২২৯] প্রথম এবং তৃতীয় নাম আগে থেকে প্রচলিত ছিল। আমরা আগেই বলেছি, খেরওয়ার আদর্শে দীক্ষিত সাঁওতালদের পরিচিতি ছিল 'সাফা হোর', অর্থাৎ বিশুদ্ধাচারী সাঁওতাল। বৈষ্ণবগুরুদের সাঁওতালরা বাবাজি বলে ডাকত। এ নাম্‌গুলি আগে থাকলেও এ নামের কোনও গোষ্ঠী আগে ছিলনা। 'সামরা' আসলে গোদা (Godda) মহকুমার একটা গ্রাম। তা থেকেই ওখানকার খেরওয়ার সংগঠনের নামও হয়েছে 'সামরা'। Bodding এর মতে 'বাবাজি' গোষ্ঠী আদি খেরওয়ার সংগঠনের ভগ্ন অবশেষ মাত্র। অন্য দুটি গোষ্ঠী নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে।

এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘোগ মোটেই ছিল কিনা, বা থাকলেও এর সাংগঠনিক কোনও ভিত্তি ছিল কিনা, তা



জানা নেই। সম্ভবতঃ এরা বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক গোষ্ঠী। কিন্তু যেটা বিশেষ লক্ষণীয়, তা হল এদের মধ্যে বিশ্বাস এবং আচারগত সাদৃশ্য। মূলতই, এ বিশ্বাস ও আচার আদি খেরওয়ার আদর্শেই গড়ে উঠেছে। তবে আমরা আগেই বলেছি, এ সব গোষ্ঠীগুরু নির্দেশিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে খেরওয়ার আচার বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়নি; প্রচলিত কোনও কোনও সাঁওতালি, বিশ্বাস, প্রথা এবং আচার তার সঙ্গে মিশে গেছে। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে এ সব অনুষ্ঠান মোটেই ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক নয়; বহু গ্রামবাসীর যৌথ অনুষ্ঠান। তাই এতে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

এ সব নানা গোষ্ঠীভুক্ত সাঁওতালদের জীবন-যাত্রার যে বর্ণনা Bodding দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় অনেক আদি খেরওয়ার বিধান তারা পরম নিষ্ঠায় মেনে চলেছে; কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুনত্বও দেখি। আগেকার বিধানের মূল দিকগুলি আমাদের জানা — যেমন, রোজ স্নান করতে হবে; শূয়োর-মুরগি পালন নিষিদ্ধ; হাঁড়িয়া এবং মরা গরুর মাংস সর্বথা পরিহার্য; অন্যান্য আহার বিষয়েও শুদ্ধাচার পালনীয়; বোঙ্গা পূজা পরিত্যাগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক বিধান সম্পূর্ণ নতুন; আগেকার সরকারি বা বেসরকারি প্রতিবেদনে এদের উল্লেখ মেলেনা। কয়েকটা প্রধান পরিবর্তনের কথা মাত্র এখানে বলছি। (১) আগে হরেক রকমের বোঙ্গা পূজা বাতিল করে এক ঈশ্বরের নাম নেওয়ার কথা বলা হত। এখন এ ঈশ্বরের একটা নাম প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হল: 'রামচান্দো'। সাঁওতালি উপাখ্যানে 'চান্দো' বা চন্দ্রের উল্লেখ আছে। 'রাম' সম্ভবত: নতুন সংযোজন। (২) আগে খেরওয়ার সংগঠনের ধর্মগুরুরা ছিল প্রধানত অন্য অঞ্চল থেকে আসা হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু এখন সাঁওতাল গুরুরও উল্লেখ পাই। যেমন 'সাফাই' গোষ্ঠীর গুরু ছিল এক সাঁওতাল; পরসদ পরগনার এক গ্রাম আম্বাদিয়া নিবাসী রামজিৎ। (৩) বাবাজিদের ভূমিকায় বিশেষ এক পরিবর্তনের কথা আগেই বলেছি। তাদের নতুন ভূমিকা — রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অশুভশক্তি বোঙ্গা বিতাড়নের জন্য ওঝার ভূমিকা। (৪) সাঁওতাল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের — যেমন জন্ম, কিশোরত্বলাভ, বিবাহ, মৃত্যু — সঙ্গে যুক্ত নানা অনুষ্ঠানে[২২৮] আগে গ্রাম-প্রধান (মাঝি) বা গ্রাম-পুরোহিতের (নায়কে) ভূমিকা ছিল সাধারণত অপরিহার্য। জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে সন্তানের নামকরণ[২২৯] এবং সাঁওতাল বালক বা কিশোরকে গ্রাম-সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুষ্ঠান[২৩০] মাঝি বা নায়কের পৌরোহিত্য ছাড়া অকল্পনীয় ছিল। Bodding লক্ষ্য করেছেন, দীর্ঘদিনের এ প্রথা বাতিল হয়ে গেছে নতুন খেরওয়ার সংগঠনপ্রভাবিত গ্রামে। গোষ্ঠীগুরুরাই এখন এ ব্যাপারে সর্বেসর্বা। বাইরের কোনও ব্যক্তির ভূমিকা এখানে নিষিদ্ধ ছিল[২৩১]। (৫) অনুসৃত আদর্শের বিশুদ্ধতা এবং গোষ্ঠীর সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশাসন আগের থেকে অনেক বেশি কঠোর করা হয়। যেমন সামরা গোষ্ঠীতে কোনও সাঁওতালের যোগদান ছিল শর্ত সাপেক্ষ। তাকে শপথ নিতে হত, বোঙ্গা পূজা সম্পূর্ণভাবে বাদ দেবে, আর গুরুর নানা নির্দেশ নিষ্ঠাভরে পালন করবে। এ শপথ শুধুমাত্র গুরুর কাছে নয়; বহুজনের উপস্থিতিতে এবং নানা আচারের মধ্যে এ শপথ নিতে হত। আগেও নিয়ম ছিল, খেরওয়ার আদর্শ লঙ্ঘন করলে অন্যান্যরা তাকে ঝুটা সাঁওতাল বলে দূরে সরিয়ে রাখত। এ ব্যবধান আসলে ছিল সামাজিক ব্যবধান। কিন্তু খেরওয়ার সম্প্রদায়ে ঢোকার জন্য এখনকার মতো এ সব শপথ নিতে হত না। (৬) খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু থেকে গুরু নির্দেশিত শুদ্ধাচারের একটা প্রধান ছিল মুরগি বা শূয়োর না পোষা। এখন একটা নতুন নিয়ম দেখা যায়। যেমন চাষবাসের কাজে গরুর ব্যবহার নিষিদ্ধ হল। এ নিয়মের ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। সম্ভবত এ নিয়ম স্বল্প-সংখ্যক সাঁওতালদের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল। যদি গরুর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় তাহলে চাষবাসের জন্য অন্য কী বিকল্প ছিল, তাও আমরা জানিনা। এই ধরনের নিষেধ ওঁরাও আন্দোলনে (১৯১৪–২২ সালে) দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত সাঁওতাল জগতে এর প্রভাবই সক্রিয় হয়েছিল। (৭) নানা অনুষ্ঠানে সমবেত গানের ব্যাপকতর ব্যবহারও সম্ভবত ওরাঁও আন্দোলনের প্রভাবে ঘটেছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে এত বিধিবিধান সত্ত্বেও এসব গোষ্ঠীভুক্ত সাঁওতালগ্রামে নানা ধরণের অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যসম্মত নানা প্রথা এবং আচার কিন্তু গুরুদের অননুমোদিত ছিল না। বিশেষ করে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নানা আচারের যে বর্ণনা Bodding দিয়েছেন, তা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।[২৩২] যে-নিয়মগুলি এখানে মানা হত, সেগুলি সাঁওতাল সমাজে দীর্ঘকাল প্রচলিত।

এ তিন খেরওয়ার গোষ্ঠী সম্পর্কে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর Bodding দেননি। হয়ত, তা তাঁর প্রশ্নে সম্ভবও ছিলনা। তা হল — অন্তত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, যখনকার কথা Bodding লিখেছেন — খেরওয়ারপন্থী সাঁওতালদের সংখ্যা কত ছিল? একটা অনুমান, সংখ্যায় তারা কম। কিন্তু এত কম যে এ সংখ্যাকে আমরা নগণ্য বলতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলে হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যেত।

আসলে পরেও হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতা বা গুরুত্বকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। ১৯২১ এবং ১৯৩১ এর আদমশুমারীতে দেখা গেল 'হিন্দু' সাঁওতালের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এর

ভিত্তিতে কেউ কেউ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সাঁওতালরা ক্রমেই তাদের আদিধর্ম ছেড়ে 'হিন্দু' হয়ে যাচ্ছে। ১৯৩১ এর আদমশুমারীর অধিকর্তা (Census Commissioner) এ সিদ্ধান্তের সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণা, সাঁওতাল অঞ্চলে নানা হিন্দু সংগঠনের অবিরত প্রচার কার্যের একটা ভূমিকা এতে রয়েছে। এ সব সংগঠন সাঁওতালদের বুঝিয়েছে, তারা যাতে লোকগণনাকারীদের কাছে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়।[১০৩]

অবশ্য উনি নিজেই স্বীকার করেছেন হিন্দুপ্রভাব বেড়েছে। বিহারের ১৯৩৯–৪১ এর আদমশুমারীর অধিকর্তা (Superintendent) উইলিয়ম আর্চার একটু ভিন্নভাবে এই তথা কথিত 'হিন্দু' সাঁওতালদের সংখ্যাবৃদ্ধির ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন। "আদিবাসীদের ভাষায় এমন কোনও শব্দ ছিল না, যাতে তারা তাদের ধর্ম কী, তার সঠিক নামকরণ করতে পারত... যখন কোনও উপজাতি বলে তার ধর্ম 'হিন্দু', সে শুধুমাত্র বলতে চায়, সে ক্রিশ্চান বা মুসলমান নয়। তার কখনও এ ধারণা ছিল না যে সে তার আদিবাসী জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এসেছে, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের নির্দেশিত আচার আচরণ তার বদলে গ্রহণ করেছে... যদি দেখাও যায়, সে হিন্দুদের কোনও কোনও উৎসব পালন করছে, তার কারণ, এর ফলে নতুন আনন্দ পাবার উপলক্ষ্য পাওয়া গেছে। তাছাড়া...হিন্দুধর্মর সব সময় বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। হিন্দুধর্মতত্ত্ব বা হিন্দু আচারে এমন কিছু নেই, যাতে একজন আদিবাসী হিন্দু বলে স্বীকৃত হলে তার পুরনো জীবনচর্যা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতেই হবে'।[১০৪]

উপরের আলোচনা থেকে একটা মূল সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হবে। তা হল সাঁওতাল সমাজে 'হিন্দু-প্রভাব' সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার পরিপন্থী নয়। আমরা দেখেছি, কোনও কোনও বিশেষ সময়ে এ প্রভাব দ্রুত বেড়েছে। এটা সাঁওতাল সমাজের সচেতন গ্রহণ এবং এর পটভূমিকা তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী আন্দোলন। স্বাতন্ত্র্য-চেতনার অর্থ এ নয় যে তারা তাদের ঐতিহ্যের সবটুকু বজায় রাখতে চেয়েছে। অনেক কিছুই তারা বর্জন করেছে কিন্তু একটা বৃহত্তর লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য। মুন্ডা, ওরাঁও এবং হো'দের ক্ষেত্রেও এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। পরবর্তী সংখ্যায় এ সব আদিবাসি জনতের কথা বলব। □

পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য

**পাদটীকা :**

১০২. E.G. Man, **Sonthalia and the Sonthals** (1867) এবং W.W. Hunter, **The Rural Annals of Bengal** (১৮৬৮) (পুনর্মুদ্রন, কলিকাতা ১৯৬৫)

১০৩. সাঁওতাল জগৎ সম্পর্কে মানের পরিচয় গোড়ায় বাগমহল পাহাড় এবং তার পাশাপাশি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। মানের বই এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। পরে মেদিনীপুর এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালি জীবনযাত্রা দেখার সুযোগ ঘটে। অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও 'জাতি সম্পর্কে ধারণা' 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান' এবং সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে মেদিনীপুর এবং প্রায় তিনশ মাইল দূরে অবস্থিত ভাগলপুরের সাঁওতাল সমাজের মধ্যে 'অভিন্নতা' দেখে তিনি বিস্মিত হন। Man, **op. cit** পৃ: ২–৩

১০৭. Hunter, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ৭৩; ১০৫

১০৮. সংগঠিত আন্দোলনের সময়কাল ১৮৭৪–১৮৮২। বিক্ষিপ্তভাবে এ আন্দোলন পরেও হয়েছে, প্রধানত সাঁওতাল জগতে কোনও দুর্বিপাক বা বিপর্যয়ের সময়ে।

১০৯. চতুরঙ্গ, মাঘ ১৪০১; পৃ: ১৬২–১৬৫

১১০. তদেব; পৃ: ১৬৩। ভাগলপুর কমিশনের চিঠি, ৯ মার্চ, ১৮৭৫ **সাঁওতালপরগনা ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার** এ O Malley বর্ণনাযও এ ধরণের ইঙ্গিত আছে। (পৃ: ১৪৫–১৫১)

১১১. এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা ওরাঁও সমাজের কথা বলতে পারি। এ সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরে করব। সংগঠিত 'টানা ভগৎ' (১৯১৪–২২) আন্দোলনের সময় আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রবণতা লক্ষ করি। এক্ষেত্রে আমরা তখন দেখি, প্রায় গোটা ওরাঁও সমাজের উদ্যোগ।

১১২. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি। ধর্ম ও পূর্ব ভারতে কৃষক আন্দোলন...', **চতুরঙ্গ**, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯; পৃ: ৮৫৩–৫৭

১১৩. Martin Orans, **The Santal: A Tribe in Search of a Great Tradition** (Detroit, 1965), পৃ: ৩০–৩৯

১১৪. ওরাদের মতের আলোচনার জন্য, **চতুরঙ্গ**, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯; পৃ: ৮৬৩–৮৬১

১১৫. এ মেনে নেওয়াকে ওরাঁও বলেছেন 'Rank Concession Syndrome'

১১৬. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি। **'চতুরঙ্গ'**, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

১১৭. তদেব। বর্তমান আলোচনার ভিত্তি এ বিশ্লেষণ।

১১৮. প্রথম কিস্তি দ্রষ্টব্য: চতুরঙ্গ, মাঘ ১৪০১

১১৯. দ্বিতীয় ,, ,, ,, জৈষ্ঠ, ১৪০২



১২০. P.O. Bodding, 'The Kharwar Movement Among the Santals', **Man in India**, Sept. 1921। '...it has always been so that the Kharwar movement has been stirred into new life when a great Calamity affecting the whole people has occurred in the country, The cause being that such Calamities are considered to be signs of the displeasure of God'. পৃ: ২২২

১২১. P.O. Bodding. 'Studies in Santal Medicine and Connected Folklore', **Memories of the Asiatic Society of Bengal**, Vol. X, 1927, Nos. I & II.

১২২. Bodding তাদের 'herbal doctors' বলেছেন। সাঁওতালদের দ্বারা ব্যবহৃত নানা গাছ-গাছড়ার গুণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'There is just the possibility that among the many ingredients used by them some few might be found that are not known to western Science as medicines'

১২৩. L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazetteers. Santal Parganas (Calcutta 1910), পৃ: ১৪১ এটা পড়ে সহজেই বোঝা যায়, প্রতিবেদক বাবাজিদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ।

১২৪. পাদটীকা নং ১২০ দ্রষ্টব্য।

১২৫. তদেব; পৃ: ২১৭। এই গোষ্ঠীগুরুর নাম Samra। Bodding এর ধারণা: 'The **Samras** have developed into a kind of exorcisers' ১২৬. ওঝাপ্রথা সম্পর্কে P.C.Biswas ও আলোচনা করেছেন Santals of the Santal Parganas (Delhi, 1956) বইতে। পৃ: ১২০–১৩৪; ২১৬–১৭

১২৬. ওঝা প্রথা সম্পর্কে P. C. Biswas ও আলোচনা করেছেন Santals of the Santal Parganas বইতে (Delhi, 1956)। পৃ. ১২০–১৩৪; ২১৬–২১৭।

১২৭. পাদটীকা নং ১২০ দ্রষ্টব্য। পৃ ২২৯–২৩০ বাবাজিদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বের একটা বিশেষ অংশ ছিল সিদুর মাখানো এক শূয়োরকে জ্যান্ত কবর দেওয়া। মনে করা হত, মাটির তলায় শূয়োরের অবলুপ্তি অশুভ বোঝার বিনাশের প্রতীক। এরপর বাবাজীরা বলত: "আজ আমরা সব বোঝা এবং ডাইনি তাড়িয়েছি... দিনগুলো সুখের বা দুঃখের যাই হোক, রামচান্দোর নাম নাও'

১২৮. নৃতত্ত্ববিদরা এর নাম দিয়েছেন 'rites of passage'

১২৯. এই অনুষ্ঠানের নাম 'Janam Chatiar'

১৩০. এ অনুষ্ঠানের নাম 'Caco Chatiar', এ দুই অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ বর্ণনার জন্য: W. J. Culshaw, **Tribal Heritage: A study of the Santals** (London, 1949); ch. 10: 'Birth and Initiation'; W.G. Archer, **The Hill of Flutes** (London, 1974); Ch. III: 'Induction to the Tribe'. 'Caco Chatiar' উৎসব সম্পর্কে Archer এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: '... adolescence makes even more necessary a sense of tribal disciplene ...in their early youth children grow accustomed to village manners and to certain prohibitions. They must now be instructed in the tribal tradition and made to realise what it means to be a Santal. The ceremony that combines these various functions is known as Caco Chatiyar'. পৃ: ৫৮

১৩১. 'সাফাই' গোষ্ঠীভুক্ত গ্রামে এ সব অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে Bodding বলেছেন: 'At the name-giving festival, which is an obligatony village festival among the Santals where the headman and other village officials have to be present, the Sapai do not call in any outsiders, but perform the Ceremony among themselves, only people of their own Sect being present. They act in the Same way at marriages' পাদটীকা নং ১২০; পৃ: ২২৫

১৩২. তদেব; পৃ: ২২৭–২৩০

১৩৩. 'The Census figures of 1931 were to extent vitiated by a communalist campaign to return all tribal religions as Hindu? J.H. Hutton. 'Primitive Tribes', in O' Malley(ed). **Modern India and the West** (O.U.P, 1968, 2nd Edn). P. 437

১৩৪. Archer, **Tribal Law and Justice: A Report on the Santal** (Three Voumes). New Delhi, 1983. (এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছিল ১৯৪৬ সালে). পৃ: ৬৫৫–৬৫৬

## ধম্মের নাম মহাশয়। যা কওয়াবে তাই কয়।।

(মকবুল ফিদা হুসেন — শ্রদ্ধাভাজনেষু)

সুধেন্দু মল্লিক

নেংটা শিব? আপত্তি নেই। ভোলা দিগম্বর!
ভূতের দলের অট্টরব — ব্যোম ব্যোম হর হর।
নেংটা কালী? লজ্জা কিসের! সৃষ্টিকালে কাপড় থাকে?
ভূতের দলের অট্টহাসি — প্রাণভরে দ্যাখ্ শ্যামা মা'কে।
কিন্তু, বীণাবিহীন হংসহারা নেংটা সরস্বতী!!!
যবন হাতে ধম্মোবাবার এম্‌নি অধোগতি!

পোড়াও পোড়াও জ্বালাও জ্বালাও — ভূতের পাল ছোটে।
রঙ তুলিতে আগুন লাগাও। ধম্মো শিকেয় ওঠে।
হুসেন প্রিয় হুসেন আমার, বৃথাই তোমার ক্ষোভ
শিল্পী যখন, সইতে হবে ভূতের উপদ্রব।
তাই বলে কি ছাড়বে ছবি ছিঁড়বে রঙের মালা?

এ আমাদের কুরুক্ষেত্র, শিল্পের কারবালা।

## বাবুসমাজ

সমীর রায়চৌধুরী

ক্যানিং স্ট্রীটে দেখেছি উদ্দেশ্যমূলক মোমবাতি
জন্মদিন বিষয়ক ছিল রঙিন ও সংখ্যার অধীন
কিছু শুভ্র মসৃণতায় ছিল লোডশেডিঙের প্রতীক্ষা
যেভাবে প্রেমের একদা বিবাহবার্ষিকী খোঁজে ভিকটোরিয়া চত্বরে
একটি টুথপেস্টের গন্ধে ছিল চুম্বনের মৃদু সম্ভাবনা
জুতোর কালো পালিশ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল অহংকার
ফটকের দুপাশে ছিল আসন্নপ্রসবা কৃষ্ণচূড়া
বোটানিস্ট দেখে বলেছিলেন লাবণ্যের অভাব
শিকড়ে রংমশলার সংকেতে পড়েছে টান
যে কারণে শিউলি গাছের নীচে জড়ো হয় রাত শেষের অভিমান
কবি জানালেন প্রেফ উপমার প্রয়োজনে
সব কৃষ্ণচূড়া মেয়েদের ক্লাসে প্রতিদিন দিয়ে আসে প্রক্সি
ভোরবেলা মেখে আসে ল্যাকমে প্রসাধন-প্রণালী
পেপারওয়েটের মধ্যে ঘুমোয় নীহারিকা
টাইপমেশিনের যন্ত্রকৌশলে বৃষ্টি পড়ে
রবিবারের সূর্যোদয় দেখতে গাঙ্গুলিরা যায় দার্জিলিং
যেভাবে প্রত্যেক পেনসিল থেকে অহরহ উঁকি দেয় জ্যামিতির ক্লাস
কিছু অসমাপ্ত হোমওয়ার্ক কিছু মেডইজি
হিন্দি ফিল্মের টু-ইন-ওয়ান আর মিনিবাসের উপকথার সঙ্গে
ইস্টার্ন বাইপাসে দেখা হয়ে যায় অল্পবয়সী সিটিসির
সমাজবিদ বলছেন সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস
একটি টুথপেস্টের গন্ধ এনেছে চুম্বনের মৃদু সম্ভাবনা —

# ফাঁসীর আসামী

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমার প্রতিমা জানে
দু বাহুর আড়ালে আমি এক বরাভয় পুরুষের ঢাল
সন্তান সন্ততি জানে
বিনাশী দহনে আমি এক অবিনাশী বটের আড়াল
স্বজন পড়শি জানে
প্রতিকূল অভিঘাতে আমি এক অর্জুনের খাড়া শিরদাঁড়া
পদাতিক পথ জানে
যে কোনও আর্তির সামনে আমি এক জঙ্গী পাহারা!
প্রকাশ্য ভূগোলে আমি এমনই সম্ভ্রান্ত আকাশ...
তবু হায়! দীর্ঘশ্বাস — পথবাসী ভিখিরির নিঃস্ব দীর্ঘশ্বাস
আমাকে দখল করে ফালাফালা ছিঁড়ে ফেলে নকল পোশাক
যখনই বিনিদ্র রাতে অট্টহাসে দুই চার প্রসিদ্ধ পাপোষ
যেইখানে হাঁটুগেড়ে কৃপাপ্রার্থী আমি এক শ্রীমান তাপস
যেইখানে সঁপেছি আমার গান্ডীব, আমার দীক্ষিত বিদ্রোহ...
অথচ বিমুগ্ধ মণ্ডল জানে আমি এক কুরুক্ষেত্রী অর্জুন বিগ্রহ!
এরকম তাপে কাঁপে নিহিত গোপনে আমি এক দণ্ডিত আসামী
ভৌতিক আঁধারে শুধু আমাকে ছোবল মারে আমরাই ভণ্ডামী!

# টান

অজিত বাইরী

নদীর উপর বিছিয়ে আছে ধোঁয়াশা।
তার ভেতর থেকে
ইসারায় কাঁপছে
নৌকোর গলুইয়ের লণ্ঠন।

রহস্য আর মায়ায় মোড়া সেই আলো —
সুদূরের হাতছানি।

সুদূরকে চিনতে চেয়েছি, পারিনি।

পাড় থেকে যতদূরে যায়
টিমটিম লণ্ঠন,
ততই বুকে লাগে টান।

# প্রতিদান

গৌতম ঘোষদস্তিদার

তারপর রাস্তা পেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে সেই গভীর ময়ূর। অলঙ্কৃত আঁচলের মতো তার পেখম, আচ্ছন্নতা। দূর থেকে আমি তার মেঘগুলি দেখি! অনন্তের দিক থেকে উড়ে আসে একটি-দুটি হলুদ পাতা, বৃষ্টির গুঁড়ো। পালকের আড়ালে আমি তার হৃদয়ের কথা ভাবি!

অরণ্য ছেড়ে সম্প্রতি শহরে এসেছে সেই সবুজ ময়ূর। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তিনহাজার বছরের বিষাদ সে এইমাত্র মুছে নিল নিবিড় আঁচলে। এলোমেলো জল তার পায়ের পাতার উপর দিয়ে চুম্বনের মতো বয়ে গেল পূর্ণতার দিকে। আমি অপলক তার ভেসে-যাওয়া ডানাগুলি দেখি, আততায়ী-চোখে!

অন্ধকারের গহ্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমি সেই বিব্রত ময়ূরের জন্য সারা দুপুর ওঁত পেতে বসে ছিলাম, যেন নিরবধিকাল, ময়ূরের ছায়া পাব বলে! আর জিঘাংসাবশত সেই বিষণ্ণ ময়ূর প্রতিবার উড়ে গিয়েছিল ভুল বাতাসের দিকে!

আজ, রবিবারের সব মেঘ ছিঁড়ে ফিরে এল সেই চিত্রিত ডানা, অবিনশ্বর, ঝলমল। দেখে পুনরায় গা ছমছম করে ওঠে!

রাস্তা পেরিয়ে ময়ূরের মুখোমুখি হই, যেন শেষবার, যেন ওই একাকী ময়ূর উড়ে যাবে আবারও সেই ঘনঘোর বিস্তৃতির দিকে!

ময়ূরের পাশে বসে আমি হ্রদের কথা ভাবি। হ্রদ ও হৃদয়দুটি পাশাপাশি বসে থাকে বিকেল ও সন্ধ্যার মতো, চুপচাপ, পারিপার্শ্বহীন। হাওয়া উড়ে যায়।

তারপর অনন্তের আগে, হঠাৎই, পেখম মেলে আমার উপর পরম আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই তীব্র ময়ূর, নিজেকে অপচয় করে, হ্রদের কিনারা থেকে উড়ে এসে ডানায় আচ্ছন্ন করে আমার সর্বস্ব, আলজিভ! প্রতিহিংসাবশবর্তী ঠোঁটদুটি দিয়ে মুহূর্তে উপড়ে নেয় শিকারির দুই চোখ, আমার!

# ভুল ঠিকানা

অসীম রেজ

সারাদিন ঘুরিফিরি,
পিছু পিছু কেউ হাঁটে,
নির্জন এ পান্থনিবাসে
বেলা বাড়ে,
আলো আর পাতার ঝলকে।
দু'দিনের জন্যে আসা,
সময়ের আঁচলে বাঁধা
কিছু স্মৃতি, কিছু উপহার,
ল্যাণ্ডস্কেপ ভরে ওঠে
রঙ আর গানে।
এখানে গাছেরা অন্যরকম,
ফুলেরা, পাখিরা,
নদী দুলে দুলে ওঠে,
অচেনা সবের মধ্যে
সারাদিন খুঁজে ফেরা
অবিকল তোমার মতন,
আকাশের গায়ে খসে পড়ে তারা।
ছবি ও ছায়ার ভিতর
কেউ চেনা, কেউবা অচেনা,
কবিতার খাতা ভরে আছে
মিথ্যে আর ভুলে;
ভালবাসার টানে যে গিয়েছে চলে,
তাকে আর
ফেরাতে পারি না।

## দ্বিপ্রহরে

উমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কি করে এই সকাল এবং
দীর্ঘ দীর্ঘ দুপুরগুলো
জড়িয়ে গেছে জেলের জালে
খুকির নরম মুখের তিলে
ঝাপ্‌টা হাওয়ায়
না-ই বা হল পাথরকুচির বিচিত্র রং
মুখ ফেরানো গোপন অসুখ
নীরব চাওয়ায়
মিলিয়ে নেওয়া নিজস্ব মুখ।

একাকী চিল শহর ঘোরে
শবের ঘ্রাণে, ঘ্রাণের মায়ায়
একাকী চিল শহরতলির বাজার ঘোরে
তীক্ষ্ণ চোখে বাড়ায় ক্ষত
আগুন-রঙা তরুণ দিনের
ডানায় ভাসে কঠিন এবং নগ্ন
মুখের আলো ছায়ায়
অপার্থিব মগ্ন খেলা
দীর্ঘ দীর্ঘ দুপুরবেলা।

## অথচ জীবন

ডলি দত্ত

আজকাল সন্ন্যাসীরাও নাকি
ফিনফিনে পালকের মতন
বিদেশি জ্যোৎস্নার বাউল; আর
পার্থিব প্রার্থনা বুকে নিয়ে
শুধু ভারাক্রান্ত।
জন্ম থেকে মৃত্যু, এই পর্যন্ত গৃহীর
অতিসূক্ষ্ম কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া;
তবু জীবন খুঁজতে খুঁজতে সমতল ভূমি
সমতল ভূমি থেকে খাড়াই
জীবন কতটুকু?

তুমি জানই না জীবন কতটুকু?
নৈঃশব্দ থেকে প্রথাসিদ্ধ আয়োজন
জরায়ুর গভীর পর্যন্ত ছড়ানো
এর আদিম সন্তান
ভূগর্ভস্থ ফুটন্ত লাভায় মোচড়ানো
অপাপবিদ্ধ শরীর
অথচ জীবন খুঁজতে খুঁজতে সমতলভূমি
সমতলভূমি থেকে খাড়াই
এবং

# বনলতা সেন : সময়ের দর্শন এবং বিজ্ঞানবোধের নিরিখে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

জীবনানন্দ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লিখছেন বাংলা ১৩৩২ সন থেকে ১৩৪৬ সনের মধ্যে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর পটভূমি তৈরি হচ্ছে সে সময়। আসলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে অন্য এক অনুসন্ধান অন্য এক দর্শনের কাল শুরু হল। এই সময়ের দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে সময়ের বিজ্ঞানবোধ। বাহ্যিক জীবনের প্রাতিস্বিকতায় বৃহৎ প্রকাশশীল বিশ্বে নিউটনীয় বিজ্ঞানের প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলিকে মেনে নিয়েও, আর একটা বোধের বিকাশ হচ্ছে তখন — যে বোধ দেখতে পাচ্ছে বিশ্বরহস্যের অন্তঃপুরে অন্য এক নিয়মের খেলা, অন্য এক জটিলতা, যার সঙ্গে নিউটনীয় দর্শনের আমূল পার্থক্য। সে সময়ের দার্শনিকেরা, বৈজ্ঞানিকেরা সেই অন্য নিয়মগুলিকে অন্য জটিলতাকে ধরবার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তখন। ধরতে পারছিলেনও কিছু কিছু — যা পরবর্তীকালে স্থির দর্শনে পরিণত হবে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আবার নতুন করে ভাবতে শেখাবে। জীবনের মূল্যবোধগুলি আমূল পাল্টে দেবে এবং আমাদের মানবিকতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে নতুনভাবে আবার মানবিকবোধকে উদ্ভাসিত করে তুলবে। তাই এই সময়টা একটা সন্ধানের সময়। গভীর অনুসন্ধানের কাল। পাওয়া/না-পাওয়ার সীমার মধ্যে অবস্থান এই কালের। সামনে একটা ভয়াবহ অন্ধকারের আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে অথচ সেই অন্ধকারের ভেতর মাঝে মাঝে নক্ষত্রোজ্জ্বল সময়েরও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বোধ হয়। গভীর সন্ধানের সময়ে, না পাওয়ার অবসাদ, ক্লান্তি এবং অসহায়তাও থাকে। জীবনানন্দের বনলতা সেনের কবিতাগুলি এই অনুসন্ধানকালের কবিতা — একটা ক্রান্তিকালসন্ধানী সময়ের কবিতা ; তাই এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির অধিকাংশেরই পটভূমি সন্ধ্যা বা রাত্রি। সে রাত্রি মাঝে মাঝে অসহায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন আবার কখনও কখনও নক্ষত্রকরোজ্জ্বল। যখন পুরোনো পাদপীঠের ওপর সন্দেহ জাগে অথচ নতুন পাদপীঠ সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয় না এবং পা বাড়াতে ভয় লাগে অথচ সন্ধানের প্রেরণা তাড়িত করে, তখন কবি কোথায় আশ্রয় পাবেন? আশ্রয় হতে পারে পুরাণকথার অবস্থানভূমি অথচ যা প্রকৃত রূপকথা নয়। তাই জীবনানন্দের মতো কবিকে বনলতা সেনের কবিতাগুলিতে 'মিথ' তৈরি করে নিতে হয় নতুনভাবে, খুঁজে নিতে হয় নতুন নয় অথচ নতুনভাবে সৃষ্ট, সন্ধানের উপযোগী একটা সুস্থির ভূমিরেখা যেখানে দাঁড়িয়ে কবি কবিতা রচনা করতে পারবেন। এবং সময়ের কথাও ভাবায় তাঁকে বারবার। সময় থেকে সময়ান্তরে চলেছি আমরা সান্ধ্যকুয়াশায়। এই সময়ের স্বরূপ কি? এই চিন্তাও দার্শনিক কবিকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ইলিয়টকেও এই সময়চিন্তা আচ্ছন্ন করেছিল। ইয়েট্স্‌কেও করেছিল। কোন্ কবিকে কীভাবে করেছিল সেটা অন্য কথা। কিন্তু করেছিল। বনলতা সেনের কবিতাগুলিকে তাই অনিবার্যভাবে সময়ের চিন্তা প্লাবিত করে তোলে। সময়, সময়ের মধ্যে জীবনের ব্যাপ্তি, সময় প্রকৃত প্রত্যাবর্তিত হয় কিনা এই ভাবনা আবশ্যিকভাবে মৃত্যুচিন্তাকেও প্রশ্রয় দেয়। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে অতএব চারটি উপাদান প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয় ; যেমন — (১) অন্ধকারের, রাত্রির, সন্ধ্যার ও কুয়াশার পটভূমি (২) নতুন মিথ সৃষ্টি করার প্রয়াস (৩) সময়চিন্তা (৪) মৃত্যুচিন্তা।

যদিও কোনও মহৎ কবির কাব্যগ্রন্থকে বা কোনও একক কবিতাকে এভাবে সরলীকৃত করে আলোচনা করা যায় না, সম্ভবও নয়, কারণ কবির মানসিক প্রক্রিয়া আরও অনেক



বেশি জটিল, তবু, কোন কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ বুঝতে গেলে আমাদের এছাড়া গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না। প্রকরণবাদীরা কবিতাকে বা কবিতাংশকে ভাষাব্যবহারভিত্তিক প্রকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে একটা জায়গায় পৌঁছতে চান। অবশ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁদের বিচার করা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কতটা সহজ হয় বুঝতে পারি না। 'ডি-কন্‌স্ট্রাকটিভিস্ট্' জ্যাক ডেরিডা যা বলেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে তাকেই আমরা সম্ভবত ব্যঞ্জনা বলি। হয়ত ইউরোপীয় প্রকরণবাদীরা বা নব্যপ্রকরণবাদীরা নতুন কথা কিছু বলছেন না। তবু এ ধরনের বিচারও একটা উপায়। অথবা বাখতিনের 'ডায়ালজিক তত্ত্ব' (অনেকে বাংলা করেছেন দ্বিবাচনিক) প্রয়োগ ডস্টয়েভসকির উপন্যাসের চেয়ে কবিতাতে আরও সার্থক হতে পারে হয়ত। কিন্তু সম্পূর্ণ সার্থক নয় কখনই। বস্তুত কোনও আলোচনার ক্ষেত্রই কখনও এমন হতে পারে ন, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, যাতে কবিতাটিকে বা কাব্যগ্রন্থটিকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায়। অন্তত এখনও এমন কোনও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। কখনও হবে কি না কে জানে। তাই আমার এ প্রয়াসও অবশ্যই আংশিক প্রয়াস। আবার, নতুন যে বিজ্ঞানদর্শনের কথা বলে শুরু করেছিলাম এই নিবন্ধটি, সেই দর্শন অনুযায়ী কোনও কিছুর স্বরূপই প্রকৃত বোঝা যায় কি না সন্দেহ। সবই অনিশ্চয়তার আবরণে আবৃত। তবু, এভাবেই আমাদের যেতে হবে। আমরা বিস্ময়ে নতজানু হতে পারি যে-কোনও সৃষ্টি অথবা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সম্মুখে বা স্রষ্টার সম্মুখে। কিন্তু তা বলে বিস্মিত হয়ে নিশ্চল স্থানুবৎ বসে থাকব না তো। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বোঝার। সেই সাধনাই তো অনন্তকাল ধরে মানুষের সাধনা। আমরা কতদূর কৃতকার্য হতে পেরেছি বা পারব সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চেষ্টাটাই মানবিক। তাই আমার প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও এক ধরনের প্রয়াস অবশ্যই জীবনানন্দকে বুঝে নেবার। যে উপাদানগুলিকে আমি চিহ্নিত করেছি সেই উপদানগুলিকে আর একটু বিস্তৃততর করার চেষ্টা করা যাক। ওই চারটি উপাদানকে পৃথকভাবে আলোচনা না করে যতটা সম্ভব একত্রে আলোচনা করাই ভাল মনে হয়।

নাম কবিতাটি সম্পর্কে পৃথকভাবে বলার হয়ত কোনও প্রয়োজন নেই — দ্বিতীয় লাইনেই নিশীথের অন্ধকারের কথা, তৃতীয় লাইনে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের কথা, চতুর্থ লাইনে আবার অন্ধকার বিদর্ভের কথা। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকেও তাই। বিদিশা অন্ধকার, আবার বনলতা সেনের সঙ্গে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর দেখা হবার সময়টিও অন্ধকার। শেষ স্তবকেও ধীরে ধীরে শব্দহীন অথবা শিশিরের শব্দের মতন অন্ধকার নেমে আসছে আর সমস্ত কিছু বিলুপ্ত করে দিয়ে থাকছে অন্ধকার আর বনলতা সেন। ক্লান্তিহীন পরিক্রমা শেষে যখন পুরনো বোধগুলি, 'প্যারাডিম' গুলি ভেঙে যাচ্ছে, তখন কি শুধুই বিশ্রাম, আর কিছু করার নেই ভেবে? এই বিশ্রামের পটভূমি রচনা করছে একটা 'মিথ' সৃষ্টি করার প্রয়াস। এরকম নতুন 'মিথ' সৃষ্টি করার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে আগে দেখা যায়নি। এই বিশ্রাম ও ক্লান্তি অন্য ধরনের বিশ্রাম ও ক্লান্তি। আধুনিক 'মিথ' সৃষ্টি করার জন্য যেমন তিনি এমন একটি নাম গ্রহণ করছেন যা আধুনিক ও বর্তমানকালের ইঙ্গিতবাহী তেমনই এই বর্তমান কালকে দেশকাল ব্যাপ্তির ভূমিকায় স্থাপন করে মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধানের ক্লান্তিকে স্ফুটতর করে তোলেন কবি। লক্ষণীয়, পো কিন্তু কোনও আধুনিক নাম ব্যবহার করেন নি। অবশ্য জানিনা তাঁর কালে আধুনিক নাম কি ছিল, তবে 'হেলেন' অবশ্যই প্রচিন নাম এবং পো লিখিত কবিতাটির প্রেক্ষিতও অন্যরকম। পুরাণকথা, রূপকথা বা 'মিথ' যাই বলা হক না কেন শব্দগুলির কাজই হচ্ছে একটা নস্টালজিয়াকে জাগ্রত করা, সে নস্টালজিয়ার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য থাকুক বা না থাকুক বা সম্পূর্ণই কাল্পনিক হক না কেন। পরবর্তী কবিতাতেও সন্ধ্যার, কুয়াশার পটভূমিকা এবং গ্রাম জীবনের ফেলে আসা একটা ছবি আমাদের নষ্টালজিয়া জাগ্রত করে ; বিশেষ করে আমাদের মতো শহুরে মানুষদের। সময়ভাবনাও এই দুটি কবিতায় শুরু হয়ে পরবর্তী 'হাওয়ার রাত' কবিতায় একটা স্পষ্ট অবয়ব পায়। 'হাওয়ার রাত' কবিতাটিতে রাত্রি, অন্ধকার, নক্ষত্র, এমন এক যাদু পটভূমি, প্রায় আরব্যোপন্যাসের পটভূমি রচনা করে, যাতে মনে হয় আমরা আবার পুরোনো সময়েই ফিরে গেছি যেন। এবং ধীরে ধীরে এমন একটা পৌরাণিক সময়ের সৃষ্টি করেন যা হঠাৎ আসে না। যখন রাত্রির বর্ণনা দিচ্ছেন তখন কেবল পৌরাণিক সময়ের উপমা!

"অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশিরভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্ররা/জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল আকাশ।"

কিন্তু এই রকম যাদুপ্রেক্ষিতের ওপর এশিরিয়, মিশরের বা বিদিশার সময় প্রকৃতই এসে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তিত হয়ে যায় সময়। ফিরে আসতে পারে পুরোনো দিন ; পৃথিবী কক্ষপথে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেমন বারবার একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসে। নিউটনীয় বিজ্ঞান দর্শনে মনে করা হত সময় এভাবেই প্রত্যাবর্তিত হতে পারে। তখনকার সাহিত্যেও টাইম মেশিনে চেপে পিছনের দিকে চলে যাওয়া যেত। সময়ের তীরের ভাবনা (Arrow of time) সে সময় শুরু হয়েছে মাত্র। আজ সময়ের একমুখী তীরের কথা অবশ্য স্বীকৃত। তবু, একথাও মনে হতে পারে, যদি 'বিগ্ ব্যাঙ্গ'-এর মতো

কখনও 'বিগ্ ক্রান্চ্' হয় তাহলে আবার সময় ফিরে আসতে পারে কি না পুরোনো পথে ; সময়ের একমুখিনতা ঠিক থাকলেও বা ঠিক উল্টে গেলেও। তবু হকিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, তা ঘটলেও, পুরোনো কাল ফিরে আসবে না, কারণ সময়ের একমুখী ধাবমানতার তীর তখন অন্য 'স্পেসের' উপর দিয়ে ছুটে যাবে। অর্থাৎ সময়ের ও দেশকালের বুনোনের অন্য দিক দিয়ে ধাবমান হবে সেই তীর। জীবনানন্দ অবশ্য 'হাওয়ার রাতে' কবিতায় রূপকথার পটভূমি সৃষ্টি করে পুরোনো কালকে ফিরিয়ে আনলেন নিউটনীয় দর্শনের অনুসরণ করে। এরকম ছবিতে নক্ষত্রখচিত রাত্রি ও কুয়াশা থাকলেই মায়াবী হয়ে ওঠে। কবিতাটিতে আছেও তাই। 'যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায়, মরে যেতে দেখেছি/কাল তারা অতি দূরে আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে/কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন ...'

এভাবেই দেশকাল ও সময় ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তিত হয়ে আসে 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটিতেও। বিলুপ্ত সময় যেন আসলে সিনেমার দৃশ্যের মতো অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ স্পষ্ট, স্পষ্টতর হতে হতে বাস্তব হয়ে যায়। অপরূপ খিলান গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে — 'পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ/রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ/তোমার নগ্ন নির্জন হাত...''। কবি তখন আর বর্তমানে অবস্থান করছেন না। টায়ার সিন্ধুর পারে কোনও এক রাজ প্রাসাদে সম্রাটের মতো বিরাজ করছেন। ইলিয়টও এরকম ভাবছেন তখন। অতীতের সময় এবং বর্তমানের সময়, ভবিষ্যতের সময়ে সর্বদাই বিরাজমান আছে এরকম ইঙ্গিত তিনি কবিতাতে দিচ্ছেন। যদি এমনও মনে করা যায় যে এভাবে সময়ের প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোনও দার্শনিকতা নয়, অকারণ রোমান্টিকতার উদ্ভাসন মাত্র, তাতেই বা ক্ষতি কি? তখন ইয়েট্স্ও এমন কবিতা লিখছেন যখন বৃদ্ধ বয়সের অবস্থানটি স্থির করার জন্য পিছন ফিরে বাইজানটাইন সৌন্দর্যে অবগাহন করতে চাইছেন। মূল কথা হচ্ছে সে সময়, সময় ভাবনা (প্যারাডিমগুলি বদলে যাচ্ছিল বলেই হয়তো) বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল সাহিত্যে। সময়ের একমুখিনতার কথা বলা না থাকলেও, সময় প্রত্যাবর্তিত হয় বলে মনে করা হলেও, সময় যে স্থির নয় তীব্রভাবে গতিশীল — এই বোধ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের অন্য কবিতাতেও লক্ষণীয়। যেমন, 'সুদর্শনা' কবিতায় — ''তবুও সময় স্থির নয়/আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে/দেখেছে সে তোমার বলয়।'' এই বলয় কার? 'তুমি' কে? এ সব প্রশ্ন আসতেই পারে। তবে প্রত্যাবর্তিত হয়ে সময়ই যে বলয় সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে কবির চিন্তা স্বচ্ছ; যেমন, 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি। গতিশীল সময় বলয়ের মতো যেন হাজার বছর ধরে খেলা করছে, ঘুরছে। সময়ের এই বহমানতা, গতিশীল বলয়ধর্মিতা, এই প্রত্যাবর্তনধর্মিতাই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বনলতা সেন, সুদর্শনা, সুচেতনা কেউই প্রকৃত অর্থে নারী নয়। তারা সময়েরই এক একটা রূপ যেন। সময়ের সংকেতে মেধাবিনী এই রমণীরা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। 'শ্যামলী' কবিতাতেও এরকম গতিশীল সময়ের কথা — 'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;/মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময়।' এই রমণীরা যে সময়ের সাংকেতিক মূর্তিসব, জীবন চালনাকারী শক্তিসব, তা স্পষ্ট হয় খানিকটা 'শ্যামলী' কবিতায় এবং আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'দুজন' কবিতার শেষ কয়েক লাইনে —

> ''প্রেমিকের মনে হল : 'এই নারী অপরূপ — খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
> যখন রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
> কুয়াশা রবে না আর — জনিত বাসনা নিজে — বাসনার মতো ভালোবাসা
> খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতেরে তার।'''

অর্থাৎ এই রমণীরাই জীবনসন্ধানী। সব কিছুই হয়ত চলে যাবে। কিন্তু থাকবে সময় আর বাসনা আর আকাঙ্ক্ষা আর ভালবাসা — যা এই রমণীদের মতোই সন্ধান করে ফিরছে ইপ্সিতকে। 'তুমি' কবিতাতে তাই দেখছি এই রহস্যময়ী 'তুমি'-ই হয়ত সময়ের উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে।

এতক্ষণ আলোচনা করার পরে তাহলে এবার আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে অন্ধকারের রাত্রির পটভূমিকায় একটা প্রাচীন রহস্যময় যাদু পরিবেশ সৃষ্টি করে কবি রূপকথার বা 'মিথের' পরিমণ্ডলে সময়ের উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন, সাংকেতিকভাবে ; যে-সময় খানিকটা রহস্যময়ী কিন্তু নিউটনীয় বিজ্ঞান দর্শনের অনুসারী — গতিময় অথচ প্রত্যাবর্তনশীল। প্রায় সব কবিতারই অবস্থানভূমি রাত্রি বা সন্ধ্যার আঁধার বা কুয়াশা ; কিন্তু 'শিকার' ও 'ঘাস' কবিতাদুটির পটভূমি ভোর। 'হায় চিল' এবং 'আমাকে তুমি' কবিতাদুটির প্রস্থানভূমি দুপুর। 'সুচেতনা' কবিতাটিতেও রূঢ় রৌদ্রের কথা আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাব্যগ্রন্থটির মূল রঙ কালো রাত্রির বা সন্ধ্যার। আধুনিক 'মিথ' সৃষ্টি করতে করতে কখনও কখনও তিনি প্রকৃত রূপকথার রাজ্যেই ফিরে যান — যেমন 'শঙ্খমালা' কবিতায়। তখন শঙ্খমালার যে বর্ণনা আমরা পাই তা সেই প্রাচীন রূপকথারই বর্ণনা। তার চোখ বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত। তার মুখ কড়ির মতন সাদা। 'দুইখান হাত তার হিম/চোখে তার



হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে/দক্ষিণ শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে আগুনে হায়।' আবার কখনও বনলতা সেন বা শ্যামলীর মতো আধুনিক মহিলারাও ঠাঁই পায়। কোনও সময় আবার 'মিথিক্যাল' পটভূমিকায় অকস্মাৎ বাস্তবের আঘাত এসে পড়ে। তখন আর 'মিথের' পরিমণ্ডল থাকে না। 'আমি যদি হতাম' কবিতাটি 'এক ছিল রাজা, এক ছিল রাণীর' ঢঙে আরম্ভ হয় — 'আমি যদি হতাম বনহংস/বনহংসী হতে যদি তুমি' — ইত্যাদি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রূঢ় আঘাতে স্বপ্নের ছবি চুরমার হয়ে যায় — 'হয়তো গুলির শব্দ : আমাদের তির্যক গতিস্রোত/আমাদের পাখায় পিসটনের উল্লাস/আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান।' অথবা 'শিকার' কবিতাতেও সেই একই কথা। মৃত্যুর কথা এসে পড়ে। বস্তুতপক্ষে জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যকৃতিতে মৃত্যুচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটিও কিছু ব্যতিক্রম নয়। যদি কোনও বিশিষ্ট সমালোচক জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনার ওপর কাজ করেন তাহলে ভাল হয়। কারণ তাঁর মৃত্যুচেতনার মধ্যে আমি এমন এক ধরনের চিন্তা দেখেছি যা মাঝে মাঝে জীবন ও মৃত্যুকে একাকার করে দিয়েছে। অথবা কখনও কখনও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে অনাবিল এক প্রশান্তির কথা বলছেন (অথবা ইঙ্গিতে বলছেন) যা না কি জীবনেও প্রাপ্য। জীবনের প্রশান্তি আর মৃত্যুর প্রশান্তি কি একই? 'শিকার' কবিতায় যে হরিণটি নিস্পন্দ নিরাপরাধ ঘুমে ঢলে পড়ে তার প্রশান্তি আর 'আমাকে তুমি' কবিতার শেষে যে মরণের কথা বলা আছে সেই মৃত্যুর প্রশান্তি কি একই? 'আমাকে তুমি' কবিতাটির শেষে দুটি চমৎকার লাইন আমাদের দারুণ ভাবিয়ে তোলে —

> ''মরণের পরপারে বড় অন্ধকার
> এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো''

মরণের পরপারে যে অন্ধকারে, যে 'বড় অন্ধকার' তা যদি 'আলো প্রেমও নির্জনতার মতো' হয় তাহলে তা অবশ্য কাব্য। তার প্রশান্তি জীবনের মতোই বরণীয়। 'মিতভাষণ' কবিতাটিতে যে-জীবনের কথা আছে তারও বর্ণনা তো একইরকম প্রায়। 'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো :/এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।'

তাহলে জীবন ও মৃত্যুতে কি কোনও পার্থক্য নেই? এই চিন্তা তো নিউটনের পরবর্তী পর্যায়ের তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শনের চিন্তা। 'এনট্রপি'র চিন্তা। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলাতে পৌঁছনোর কথা অথবা আবার শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায়। এই যে যাতায়াত, এরই নামই তো জীবন অথবা মৃত্যু। তাপগতি বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে উচ্চ তাপমাত্রা বা বলা ভাল উচ্চতর এনার্জিক্ষেত্র থেকে তাপ, নিম্নতর তাপমাত্রায় সব সময়েই প্রবাহিত হচ্ছে, সেই বিগ্ ব্যাংগের সময় থেকে। তখন থেকেই এই সমতায় আসার চেষ্টা যাতে তাপমাত্রা বা এনার্জিক্ষেত্র সমান হয়। এরকম যদি কখনও ঘটে বাস্তবিক, তখন তা হবে তাপমৃত্যু বা 'Heat Death'। কিন্তু অদ্যাবধি তা কখনও ঘটেনি। তাহলে মানুষ বা প্রাণীর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এনার্জিগুচ্ছ কেন্দ্রভূত হয়ে জটিল জটিলতর বস্তু বা জীবন তৈরী করছে — যেমন, পাথর, গাছপালা, নদনদী, অন্যান্য বস্তু, সাপ, বানর, গেরিলা, শিম্পাঞ্জি, মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু ইত্যাদি। সেটাই প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা বলছি জীবন। কোনও জড়বস্তু আরও নিম্নতর তাপমাত্রার এসে, প্রায় সমতায় এসে পুনরায় তার এনার্জি কেন্দ্রীভূত করে প্রাণেরও সৃষ্টি করতে পারে অনুকূলে পরিবেশে। বস্তুত জড় ও জীবনে আজকাল কোনও পার্থক্য নেই। কিংবা বলা ভাল জড় থেকে জীবনে বা জীবন থেকে জড়ে যাতায়াত এখন আর 'মিথ' নয়। বৈজ্ঞানিক সত্য। আবার ব্যক্তিমানুষ বা নির্দিষ্ট কোন প্রাণী যখন পারিপার্শ্বিক এনার্জিবলয়ের সঙ্গে ক্রমশ মিশে একটা সমতায় চলে যায়, তখন 'মৃত্যু' নামে অভিহিত করি তাকে আমরা। এই ব্যাপারটি অর্থাৎ 'এনট্রপি' কোনও নিয়মানুসারে কোনও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে হয় না বলেই প্রিগোজিন মনে করেন। অর্থাৎ এনার্জির বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকেই এনার্জি যেন কোনও যাদুবলে কোনও আকার গ্রহণ করে শৃঙ্খলায় আসে। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা। অর্থাৎ মৃত্যু থেকে জীবন আরও জীবন থেকে মৃত্যুতে এই যে যাতায়াত, এটা চলছেই। অথবা জড় থেকে জীবনে যাওয়া, — তাও ঘটছে। এ ধরনের জীবনবোধ বা মৃত্যুবোধ তাঁর 'অন্ধকার' কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কবিতা কমলালেবুতে তা আরও স্পষ্ট। 'অন্ধকার' কবিতাটি সম্বন্ধে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন, ''এই কবিতাটিই তাঁর 'জীবন পলাতক' অপবাদের মূলে''। এমনকি স্বয়ং জীবনানন্দও পরবর্তীকালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে বলছেন, ''অন্ধকার কবিতাটি প্রায় সতেরো বছর আগে ১৯৩৯-৪০-এ লেখা হয়েছিল। সতেরো বছর আগেকার ঠিক সেই মনোভাব এখন নেই আমার ; এ রকম কবিতা আজ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।'' কবি বা দীপ্তি ত্রিপাঠী যাই বলুন, যদি উপরোক্ত চিন্তাধারার আলোকে আমরা কবিতাটি পড়ি তাহলে — ''আমি অনেকদিন — /অনেক অনেকদিন/অন্ধকার সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে/হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে বুঝতে পেরেছি আবার ;/'' — এই সব লাইনগুলি অন্য ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এইরকম বিশৃঙ্খল উদ্দেশ্যবিহীন গতির সমারোহযাত্রাকে, আর তার মধ্যে হঠাৎ সংঘর্ষের জন্য, গতি বা স্পন্দনের জন্য হঠাৎ আমাদের অকারণ আবির্ভাবকে, কলরোলে কোলাহলে কোটি কোটি নক্ষত্র সমবায়ের অকারণ ধ্বনিময় যাত্রাকে, যদি কেউ বিস্ময়ের চোখে না দেখে

অকস্মাৎ ভয়ের চোখে দেখে ফেলেন, যেমন এই কবিতাটিতে জীবনানন্দ দেখেছিলেন, তাহলে তাঁকে কি অপবাদ দেওয়া যায়? যদি এই অর্থহীন আড়ম্বরকে কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদ মনে হয় বা এই আরতিকে, অনন্ত লক্ষাহীন প্রদক্ষিণকে ভয়াবহ মনে হয়, তাহলে সেই দ্রষ্টা কবির বোধকে অস্বীকার করা যায় কি করে? কেন তাঁকে জীবনপলায়ক বলব? জীবনের এই বোধ, মৃত্যুর সঙ্গে একাকার করে জীবনকে দেখে ভয় পাওয়া এও একটা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি যা আজকাল আমরা অবশ্যই পলায়ক মন করি না। পরবর্তী কবিতাতেই আবার এই মৃত্যু ও জীবনবোধ অত্যন্ত প্রশান্তভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে। কবিতাটির নাম 'কমলালেবু'। এই কবিতাটিতে ভয় তো নেই-ই কবির, বরং জীবনকে ভালবাসাই আছে। তিনি যেভাবেই পৃথিবীতে আসুন না কেন, মৃত্যুর পরে যেভাবেই থাকুন না কেন, তা এক শান্ত অথচ বিষণ্ণ গরিমায় আচ্ছন্ন। কমলালেবু কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে পুরোটাই। ব্যাখ্যার বোধ হয় প্রয়োজন হবে না।

"একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।"

'শিরীষের ডালপালা' নামক কবিতাটির শেষ কয়েকটি লাইন স্মরণ করা যেতে পারে—

"....চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।"

তাহলে কি আমরা চমৎকার মৃত্যু ও ভ্রান্তির মধ্যেই আছি? মৃত্যু ও ভ্রান্তি কি একই জিনিস? এবং তা-ই আমাদের জীবন? কারণ দয়া তো জীবনেই প্রাপ্য। আসলে হয়ত জীবনানন্দ মানুষের সনাতন মনকে মৃত্যুতে স্থির থাকতে দেখছেন এবং জীবনেও থাকে; আবার সময়ের গতিকেও অপার ও সনাতন মনে করছেন। 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায়—

"...সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কথা
ধরে আছে বলে সেও সনাতন.....॥

প্রেম, আশা, চেতনা তো জীবনকেও ধরে আছে। সময়, মৃত্যু, জীবন সবই কবির চোখে একাকার হয়ে যায়। হয়ত আরও বেশি স্পষ্ট হলে ভাল হত, 'বনলতা সেন'র কবিতাগুলিতে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর এই বোধ। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে, সাতটি তারার তিমিরে, ধূসর পাণ্ডুলিপিতে, বেলা অবেলা কালবেলায়, শুধু এই বোধ কেন, নিউটন-পরবর্তী পর্যায়ের তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শনের আরও অনেকগুলি বোধের বিকাশ আমরা দেখেছি। সে আলোচনা বা আলোচনার সূত্রপাত্র আমি পৃথকভাবে করেছি অন্যত্র। যে 'স্পষ্ট নিলিপ্তিতে 'নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব' আছে, সেই স্পষ্ট নিলিপ্তি'তে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে তিনি নিখিলবৃক্ষের বিকাশের স্বরূপটি ধরবার চেষ্টা করেছেন। □

### লেখক কর্তৃক ভ্রম সংশোধন

চতুরঙ্গের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রসঙ্গ: হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়" শীর্ষক বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধে আমার অনবধানতাবশত পাণ্ডুলিপিতেই দুইটি ভুল থেকে গিয়েছিল।

প্রথমত, ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারায় ছাপা হয়েছে 'দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীলবাগানী ইংরাজদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণ' লিখেছিলেন, অনুরূপভাবে 'জমিদারদর্পণ' প্রকাশ করেছিল তদানীন্তন প্রভাবশালী হিন্দুরাই।" আমার বক্তব্য ছিল, "দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীলবাগানী ইংরাজদের বিরুদ্ধে 'নীলদর্পণ' লিখেছিলেন, অনুরূপভাবে বিভিন্ন নিবন্ধে, গল্পে, নাটকে, চিত্রকল্পায় জমিদারী অত্যাচারের আলেখ্য রচনা করেছিলেন মূলত তদানীন্তন প্রভাবশালী হিন্দুরাই, যদি-ও 'জমিদারদর্পণ' পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে মীর মোশারফ হোসেনও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পাঠকরা অনুগ্রহ করে বাক্যটি সংশোধন করে নেবেন।

দ্বিতীয়ত, ২১১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাতেও একটি ভুল থেকে গেছে। ছাপা হয়েছে, "সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় কোরাণের ৭: ১৭৯ সুরায় ইজতিহাদের (যুক্তিভিত্তিক বিচারের) উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে..." সংশোধনে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এইরূপ: "সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় কোরাণের ৭: ১৭৯ সুরা একেবারেই অবহেলিত হচ্ছে। এই সুরায় ইজতিহাদের (যুক্তিভিত্তিক বিচারের) উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে..."

এছাড়াও, ২১২ পৃষ্ঠায় ১ম প্যারার শেষভাগে ছাপা হয়েছে: "বেশির ভাগ দাঙ্গা শুধু হয়েছিল সংখ্যালঘু আগ্রাসন থেকে।" "শুধু" কথাটির বদলে "শুরু" শব্দ প্রযোজ্য।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

# অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

'জাপানে' গ্রন্থ লিখে অন্নদাশঙ্কর রায় অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬২ সালে। 'পথে প্রবাসে' লিখেছিলেন চার যুগেরও আগে, ১৯২৭–২৯ সালে, যে বইটিকে অনেকে 'ম্যাগনাম ওপাস' বলেছেন। তীক্ষ্ণ তীর্যক রসাত্মক গদ্যের সম্পূর্ণ নতুন এক স্টাইল তিনি প্রবর্তন করলেন বাংলা গদ্যসাহিত্যে—বীরবল প্রমথ চৌধুরীর আদলে পরিশীলিত এবং মৌলিকতায় গুণান্বিত। তাঁর এপিক উপন্যাস ছয়সত্তে 'সত্যাসত্য' সেই স্টাইলের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণও মূলত গদ্যরচনাশৈলী। উল্লেখ্য—'জাগনের দাঁত'।

ছড়া তাঁর নতুন জগৎ, বিচিত্র বিচরণক্ষেত্র। নির্দিষ্ট সীমার বন্ধনে পরিমিতির মধ্যে নিটোল ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ ক্রিটিকাল চিন্তা, উপলব্ধি বা মানসিক প্রতিক্রিয়ার। প্রকৃতি যেমন অনন্য লীলাময়তায় ফোটায় তার দুর্লভ অর্কিড। তাঁর হাতে এটাই আর্ট।

কবিতায় অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী শিল্পী। প্রেমিকের স্বপ্ন ও কল্পনা, শৈল্পিক ভাবনা ও ট্রাজিক চেতনার আশ্চিক মিলনে গঠিত তাঁর কবিসত্তা। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। শব্দসংযোজনে ছন্দ ও অন্ত্যমিল বাংলা কবিতায় সেই রসেরই যোগান দিয়ে এসেছে এই ভাষার সূচনাপর্ব থেকে। এই মনোগ্রাহিতা থেকে বিচ্যুতি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ছন্দ তাল লয় তাঁর নাড়িতে। উড়িষ্যার দেশিয় রাজা ডেন্‌কানলের বাড়িতে তাঁর বাল্যবয়স ও কৈশোর গড়ে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের পরিবেশে মৃদঙ্গ করতালের তালে তালে লীলাকীর্তন,—সেই ছন্দ-দোলার আনন্দ এখনও দেহে মনে অনুভব করেন সমানভাবে। কবিতায়ও তাই একান্তভাবে পেতে চান ছন্দ মিল। না পেলেই অতৃপ্তি। ছন্দ ও মিল থাকতেই হবে তাঁর নিজের কবিতায়। নিয়মের মধ্যেই বিকশিত হবার সঙ্কল্প,—আর্ট-এর এটাই শর্ত, নিজেই লিখেছেন তিনি—"আর্ট-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলা। যে কোনও একটি খেলার মতো তারও নিয়ম কানুন খুব কড়া। সে সব মেনে না নিলে খেলা জমে না। ... লীলা তখনি সার্থক হয় যখন সৃষ্টি একটা পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছয়। হয়ত চার লাইনের একটি কবিতা। চৌপদী যার নাম। জাপানী হাই-কুর মতো সতেরো সিলেব্‌লও হতে পারে। নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা।"

এই 'ক্ষণিকা' কবিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর 'জার্নাল' অন্তর্গত চৌপদীতে। 'দিতে কী চাই আমি / সে কথা আগে / পেতে কী চাই সেটা / দ্বিতীয় ভাগে।' (৬.২.৪৭)

কবিতায় তিনি ধরে রাখতে চেয়েছেন অধরা কোনও লীলাকে। ছন্দ মিল নিয়মের মর্যাদা বাঁচিয়ে। মননলোকের আহরিত রস অনুভূতি উপলব্ধি এসব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রূপে রসে বিকাশ লাভ করে। অবশ্য একটি প্রধান শর্ত পূরণ করতেই হবে,—উপলব্ধির শিল্প প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের শাসন থেকে মুক্ত রাখার শর্ত। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত যথেষ্ট স্পষ্ট—'বিশুদ্ধ আর্ট বলতে বুঝি সেই আর্ট যা শিল্পকে মুক্তি দেয়।' এর প্রতিফলন তাঁর একটি কবিতায়,—প্রায় ষাট বছর আগে :

'সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্যালোক সম
কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে
অদৃশ্য ছায়ার মতো সাথে থাক কলাবিদ্যা মম
সকলের চিত্ত আমি আকর্ষিব যে যাদু মন্তরে।'

[ ১৯৩৪ ]

রাবীন্দ্রিক ট্রাডিশন অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতায় উপস্থিত প্রায় ১৯৩৫ পর্যন্ত। ছন্দোবদ্ধ অক্ষরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্ত, অন্তামিল, কল্পনাশ্রয়ী উচ্ছ্বাস। প্রকৃতি, প্রেম, রূপের মধ্যে অরূপের অন্বেষণ—এসব মিলেমিশেই তাঁর কবিতার কাঠামো এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কবিতায় তিনি চান 'পাকা মিল'—রবীন্দ্রনাথের মতো। তাঁর প্রথম পর্বের, 'কৃষ্ণ' কবিতা একটি ভাল দৃষ্টান্ত :

সুন্দর তুমি খুঁজিয়া ফিরিছ কারে?
নাই সে খোঁজার আদি আর অবসান
সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে?
নাই সে জনের কোথা কোনো সন্ধান।
তুমি শুধু সুর তুমি পথে চলা সুর,
তুমি চলি যাও বাঁশীতে বাঁশীতে বেজে
দূর হ'তে আসি নিকট পালাও দূর
এক যুগ হতে আর যুগে চলা এযে।

১৯৩৫ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা রয়েছে লক্ষণীয়ভাবে, প্রেরণার উৎস প্রেম। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রেমের কবিতা উল্লেখযোগ্য। ভাষা, ছন্দ ও অন্ত্যমিল সব মিলিয়ে এ সময়কার কবিতায় রাবীন্দ্রিক প্রভাব সন্দেহাতীত। তখন তিনি ইংলণ্ডে, আই-সি-এস পরীক্ষার্থী। সেখানেই লিখেছিলেন পথে প্রবাসে, বাংলা গদ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন নতুন টঙ্কার। পাশাপাশি রেখে ওই সময়কার কবিতা (প্রধানত প্রেমের কবিতা) যদি বিশ্লেষণ করা হয় ত' আশ্চর্য লাগে তাঁর ভাষায় যেন নতুনত্ব বা আধুনিকতার প্রবেশ নিষেধ। কবিতায় ভাষার নতুনত্ব এনেছিলেন ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, অজিত দত্ত ও আরও অনেকে সচেতন প্রচেষ্টায়। য়ুরোপীয় সাহিত্য—বিশেষভাবে কবিতা তাদের প্রভাবিত করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় হয়েও এককভাবে ধরে রাখলেন আগলে রাখলেন রবীন্দ্রযুগের প্রেমের কবিতার আঙ্গিক ও রোমান্টিকতা। চিরন্তন সংশয় যৌবনের প্রেমে : কোন রমণী আমার একার / কোন রমণীর একা আমি / এই খুঁজেছি দিবসযামী / হায়রে হৃদয় ব্যর্থ বিবশ / হায়রে যামী শূন্যগামী / পেলেম কি তার দেখা আমি! [অতৃপ্ত, ইংলণ্ড—১৯২৯]

অনির্দেশ্য দুর্লভ সেই প্রেম হঠাৎ দেহে, রূপে ধরা দিয়ে কামনা পূরণ করে দেয়,—কবিতায় কিছু প্রগল্‌ভতাকেও ঠাঁই দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায় :

'না চাহিতে দিলে কেন দু'খানি চুম্বন—
লাজে করি নাই মানা
বলি নাই ছি ছি না না
কিছু কি ভাবিলে মনে পরে কিছুখন
হাতে মুখ ঢেকে?

[আকস্মিক]

কবিতায় এমন দেহাশ্রিত প্রেম মনে হয় কল্পনার বাস্তব :

'স্মরিতেও আজও প্রিয়ে, স্বপ্ন মনে হয়
কাল যে আনন্দ দিয়া পীড়িলে হৃদয়
বুক পেতে সাঁতরিনু বক্ষ পারাবার
দুলিনু তরঙ্গ দোলে লক্ষ শতবার
মরি মরি সে কি দোল পতনে উত্থানে
কী অশান্ত কলরোল তার মধ্যখানে।

[দোলা]

প্রথম প্রেমের সত্যিকার লক্ষণ 'পাব কি পাবনা' সংশয়,—'কতবার যে মনে হল এই বুঝি বা / এমনিতর রাত্রি দিবা।'

কিন্তু রূপগুণ ঐশ্বর্য—কিছুতেই তৃপ্তি নেই,—আপন মানুষের অপেক্ষায় থাকতে হয় কবিকে, বিশেষত কবি যখন 'মুক্তি-সুখ-লুব্ধ'!

প্রকৃতি বদলের ক্ষেত্র তৈরি হয় দুটো ঐতিহাসিক ব্যাপারে। ১৯৩৯-এ বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও ১৯৪০—৪২ কালপর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ব্যাপক গণউত্থান, গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ডাকের যাদু। অন্নদাশঙ্কর আন্তরিকভাবে মানুষের মুক্তির পক্ষে, মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ। গভীরভাবে প্রভাবিত গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের বাণীতে, কর্মে, জীবনচর্যায়। স্বভাবতই ১৯৩৯—৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিংসার ভয়াবহতা বিচলিত করে তুলেছিল কবিকে। এই পর্বের বিভিন্ন কবিতায় ধরা পড়েছে সেই মানসিক প্রতিক্রিয়া।

বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক ইতিহাসে 'রবীন্দ্র-যুগে'র ছায়াতলেই নতুন যুগের কবিদের 'আধুনিক' শিবির গড়ে উঠতে থাকে। সবুজপত্র, কল্লোল, কালি-কলম, পরে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'পরিচয়', হুমায়ুন কবিরের 'চতুরঙ্গ'—এছাড়াও আরও কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও জার্নাল। আধুনিক বাংলা কবিতার যে বেদী গড়ে তোলার সাধনা চলছিল এই সব শিবিরে তার উৎসাহ প্রেরণা এবং কিছু পরিমাণে মালমশলাও জুগিয়েছিল ইংরেজি ও ফরাসি কবিতা। ইংরেজি কবিতা থেকে যেমন এল টি. এস. এলিয়টের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তেমনি ঢেউ তুলল ফরাসি কবিতার সুর-রিয়লিজম্‌, এক্সিস্টেনশিয়লিজম্‌ রীতির চিন্তা ও মনন, আঙ্গিক ও চিত্রকল্প। সেই সঙ্গে এল মানুষ-জীবজগৎ-প্রকৃতির সংঘাত ও সম্পর্কবোধের এ্যাবস্ট্রাক্ট প্রতিবেদন। বাংলা কবিতার চিরায়ত ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য, চরিত্র, গীতিধর্মী সংবেদনশীলতা এসব থেকে ঘাটতি দেখা দিল। জীবনানন্দ কিছু পরিমাণে বজায় রাখলেন বাংলা কবিতার নিজস্ব ঘরানা, যদিও য়ুরোপীয় কবিতার প্রভাব





যথেষ্টই ছিল তার ওপর। অন্নদাশঙ্কর রায়ও তেমনি এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা ও সাযুজ্যবোধ সত্ত্বেও তিনি বজায় রেখেছিলেন কবিতার নিজস্ব ভাষা, ছন্দ ও কাব্যভাবনা। সৌন্দর্য, আনন্দ আর মানবপ্রীতি মিলিয়ে তাঁর আর্ট।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিচিত্ত গঠিত তিনটি প্রধান উপাদানে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমভাব, আনন্দরসলীলা এবং বৌদ্ধ ও খ্রিস্টিয় করুণাবোধ।

সত্তরের দশকে তাঁর হাতে এল কিছু অনবদ্য সনেট। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত (সংস্কৃতি পরিক্রমা) চারটি সনেট—'কুৎসার সোনাটা' সেই সময়কার সামাজিক রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও দমন নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রচ্ছন্ন শ্লেষবিদ্রূপ। এই সনেটগুচ্ছের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

'মহত্তেরও ক্ষণে চাঁদ ক্ষণে হাতে দড়ি
কেন তুমি আশা কর জীবনে অন্যথা?
পিঠে ছোরা বসানো তো সনাতন প্রথা
একাকার হয়ে যায় বন্ধু আর অরি।'

তবে, কবিতায় অন্নদাশঙ্কর রায় একান্তভাবেই রূপ-রস সৌন্দর্য আনন্দের সাধক। ১৯৫৪ সালে রচিত 'রাতের অতিথি'—বিশেষ ধরণের প্রশ্নোত্তর কবিতায় অন্নদাশঙ্কর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃত শিল্পীকে প্রেরণা যোগাচ্ছে আনন্দবেদনামাধুর্যভরা পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানুষ। শিল্পীর কাজ নব নব সৃষ্টির মধ্যে তারই রূপদান। শিল্পীর ধর্ম নান্দনিক শিল্পকর্মে, ছকে বাঁধা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার-আচরণে নয়। দুরূহ এক প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হচ্ছে কবিকে : 'পরলোকে যেতে নেবে কী পাথেয়? / শিল্প কি যাবে তোমার সাথেও!'

কবির উত্তর সরল ও সুন্দর : 'আমার মুক্তি নীরবে নির্জনে / অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে / ... আমি ধ্যান করি পরম রূপের / বীভৎসতাও তারই হেরফের। / তাকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে / তাকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।'

কবির মর্মকথা ধরা দিচ্ছে পরিচিত ছন্দে সুরে মিলে। এ যুগের কাব্যরসিক পড়ুয়ার মনে তবু অতৃপ্তি থেকে যায়। ছড়ার জন্য ভাষা ছন্দ বিষয়বস্তু অন্নদাশঙ্কর যেভাবে গেঁথে নিয়ে ব্যবহার করছেন, কবিতা সে আশা পূরণ করছে না। যেন স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের বন্ধনীর মধ্যে তিনি রেখেছেন তাঁর কবিতাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষা, নূতনত্বের চমক, বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও চিত্রকল্প নির্মাণের চাতুর্য—এসব থেকে তিনি সতর্ক থেকেছেন। কবিতায় 'আধুনিকতা' অর্জনের কোনও সচেতন চেষ্টা করেননি তিনি। —বিপক্ষেই রয়ে গেলেন।

অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস প্রেমই তাঁর শক্তির উৎস। অস্থায়ী অনিশ্চিত আমাদের জগৎ এবং তার মধ্যে ক্ষণেকের এই জীবন;—এসব জড়িয়ে নিয়ে চলছে নিত্য কোনও অপরূপ লীলা, যে লীলায় রয়েছে ছন্দ, রয়েছে নিয়ম, যে লীলার সার্থকতা সার্বিক মুক্তিতে। প্রেমিকের কাছেই সার্থক এই লীলাময়তা। অন্নদাশঙ্কর একথাই জানিয়েছিলেন তাঁর কবিবন্ধু 'বিষ্ণু'কে :

'তুমি চাও আর আমি চাই মহাজনতায়
অমিল তবুও আছে, হায়!
তুমি চাও তারা গান গেয়ে গেয়ে কাজ করে।
সম-সমাজের তাজ গড়ে।
আমি চাই তারা সৃষ্টির নব নব লীলায়
গান গায় আর হাত মিলায়।
তুমি কবি যত কর্মীর, যত শ্রমিকের।
আমি কবি যত প্রেমিকের।'

[বিষ্ণুকে, ১৯৪২]

# কবিতা ও কবিতার ব্যাখ্যা

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়, তার মধ্যে, সেই শিক্ষাদানের ফলে, যত ক্ষতি কবিতার বেলায় হয়, তত আর কোনও বিষয়ের বেলায় হয় কিনা সন্দেহ। আশাকরি কবিরা এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত হবেন। কবিতাকে একটি উপভোগ্য বস্তু বলে যদি মনে করি, যদি মনে করি তার সৌন্দর্য তার শক্তি, যতটা আমি গ্রহণ করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, আমার চিত্তের, আমার সত্তার আমার চেতনার, আমার স্মৃতি আর স্বপ্নের, আনন্দ আর বেদনার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যত চারিয়ে যায় তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, যত পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করতে পারি, ততই আমার লাভ, তা হলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কবিতার অনুরাগীরা এবং কবিরা এত কাল এ জিনিষ কী করে বরদাস্ত করে আসছেন। পাঠ্য পুস্তকের কবিরা প্রায় সকলেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন আগেই, তাঁরা আর কী করবেন, কিন্তু যে দু-চার জন এখনও বেঁচে আছেন, কিংবা কিছু দিন আগেও বেঁচে ছিলেন, তাঁরাও ক্লাস ঘরের শিক্ষনীয় এবং ব্যাখ্যানীয় বস্তু হিসাবে তাঁদের কবিতার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের আপত্তি জানিয়েছেন বলে কখনও শোনা যায় নি। হয়ত আশা করে থেকেছেন, ভবিষ্যতে কোনও দিন তেমন কোনও লোকের হাতে কবিতা পড়ানোর ভার পড়তেও পারে, তিনি তা কবিতা হিসাবেই পড়াবেন, ছন্দের ছদ্মবেশধারী উপদেশ বা নীতিকথা, কিংবা দার্শনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে নয়।

সে কেমন পড়ানো?

কবিতার ক্লাস নেওয়ার সার্থকতা যদি কিছু থেকে থাকে, তা হল কবিতার উপভোগের পথে যে-সব বাধা, তা সরিয়ে দেওয়া। একটা বড় বাধা হতে পারে অজ্ঞতা। 'ইরম্মদ' মানে কী? প্রভঞ্জন মানে কী? এই ধরণের অনেক শব্দের অর্থ না জানলে মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে পড়তে বারেবারে হোঁচট খেতে হয়, মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা অভাব, একটা অপূর্ণতার ভাব জমে ওঠে, মনে হয় কিছু একটা প্রাপ্তি আমার নাগালের বাইরে থেকে গেল, উপভোগ, উপলব্ধিতে বড় বড় ফাঁক থেকে গেল। এর ফলে বিরক্তি বোধ হতে পারে। মানে বলে দিলেও ছাত্র ভাবতে পারে এ বিড়ম্বনার দরকার কী ছিল, 'বিদ্যুৎ' কিংবা বড় জোর 'বজ্রাগ্নি', 'ঝড়', কিংবা বড় জোর 'ঝটিকা' লিখলে কী ক্ষতি হত? সে ভাবতে পারে, এ হল ইচ্ছে করে তার কাজটা কঠিন করে তোলা। এ ভুল যাদের কোনও দিনই ভাঙ্গে না, তারাই বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ছাত্রের, কিংবা পাঠকের এ রকম দু-একটা ক্ষেত্রে সাহায্যর দরকার হতে পারে। তাকে বলে দিতে হতে পারে, 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ রসনা'-তে 'রসনা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত, কিংবা নজরুল ইসলামের 'শাম্‌শের হাতে, আশুঁ আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর! / দজলা-ফোরাত-বাহিনী-শাতিল!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।" মতো আরবি-ফারসিবহুল রচনারও ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতে পারে। কিংবা রবীন্দ্রনাথের "তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ / পীড়ন করেছে তারে" পড়বার সময়ে বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়, "তরুণ-গরুড়"-এর ব্যাপারটা কী। অর্থাৎ, যেখানে কবি ধরে নিচ্ছেন, অমুক শব্দের অর্থ, অমুক ইতিহাস, অমুক পুরাণ ইত্যাদি পাঠকের জানা, কিংবা পাঠকের কথা ছেড়ে দিলেও, কবি নিজের প্রয়োজনে, নিজের মতো করে যখন কোনও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করেন, কোনও ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক ঘটনার কথা





মনে রেখে কিছু লেখেন যা পাঠকের নাও জানা থাকতে পারে, তখন সেই বাধাগুলো ডিঙোনোর কাজে অজ্ঞ পাঠককে একটু-আধটু সাহায্য করলে তাতে আপত্তির কিছু নেই।

তবে আবার এ কথাও ঠিক, ইতিহাসই বলুন আর পুরাণই বলুন, সে-সবের ব্যাখ্যায় হয়ত পাঠকের কৌতূহল মিটতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে তাতে কবিতাটি অধিকতর মূল্যবান, তার আবেদন, তার আঘাত প্রবলতর হয়ে উঠবে, এ ধারনা ভুল। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি; রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' (সাগর জলে সিনান করি) তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা অবশ্যই নয়, কিন্তু — পদলালিত্যের গুণে একের পরে এক মনোহর চিত্রের আকর্ষণের কারণে, কবিতাটি, বিশেষ করে অল্প বয়সে, অনেকেরই ভাল লেগে থাকতে পারে। তারপর, একটু বড় হয়ে যখন জানা যায়, সাগরিকা নাম্নী স্বপনচারিণী আসলে সিংহলদ্বীপ, তখন সে-একটা মোহভঙ্গের মতো ব্যাপার ঘটে কি ঘটে না? কবিতাটির আকর্ষণ তাতে কি কমে না বাড়ে? অন্তত একজন পাঠকের কথা জানি, যার বেলায় সে আকর্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ আন্তর্হিত হয়েছিল। প্রতীকের ব্যবহারে এ-রকম একটা বিপদ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রায়ই দেখা যায়, মূল বস্তুকে পিছনে ফেলে প্রতীক এত দূর এগিয়ে গেছে যে তাকে নিজের মতো করে জীবন ধারণ করবার স্বাধীনতা দেওয়াই ভাল! অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়ে; শেলির একটি বিখ্যাত কবিতা আছে, '১৮১৯ সালে ইংলণ্ড', নামে একটি সনেট। কবিতাটি যখন তিনি লিখেছিলেন, সেই ১৮১৯ সালে ইংলণ্ডের লোকের কাছে এর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু এখন যদি আমরা কবিতাটি পড়তে যাই, আমাদের জানা দরকার সেই সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা কেমন ছিল, কোন সব ঘটনা লোকের মন অধিকার করে ছিল। না হলে মনে হবে, বৃথাই কবি (ম্যাথিউ আর্নল্ড যেমন বলেছিলেন) শূন্যে ডানা ঝাপটাচ্ছেন।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে। কিছু কিছু তথ্য পাঠকের জানা না থাকলে তাকে সে বিষয়ে অবহিত করা কর্তব্য হতে পারে শিক্ষকের কিংবা কাব্যসমালোচকের। শিক্ষক এবং সমালোচকেরা যদি ওই পর্যন্ত গিয়েই থামতেন, কোনও হিসাবেই আপত্তির কিছু থাকত না। অন্তত এ-কথা বলবার কোনও কারণ থাকত না যে তিনি পাঠককে পথভ্রষ্ট করছেন, নিজেকে স্থাপন করছেন তিনি কবির জায়গায়, নিজে যা বুঝেছেন তাকে স্থাপন করেছেন মূল কবিতাটির জায়গায়।

ঠিক এই বিপত্তিটিই ঘটে যখন সমালোচনা বলতে তিনি বোঝান interpretation মর্মার্থ উদ্ঘাটন। অর্থাৎ, তাঁর মতে, কবিতাটির মর্মে গোপন একটি অর্থ নিহিত আছে, সেটিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা, ফাঁস করে দেওয়াও বলতে পারি, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সমালোচকের দায়িত্ব।

প্রথমে সমালোচকের কথাই ধরা যাক। সুদূর অতীতকাল থেকেই আমরা জেনে এসেছি, সমালোচনা বলতে আসলে বোঝায় দুটি কাজ, মূল্যায়ন এবং মর্ম উদ্ঘাটন। প্রাচীন গ্রীসে এই বিজ্ঞানটিকে তাঁরা বলতেন hermenentics, এর প্রয়োগ ছিল পাঠ্যবস্তুর অর্থ ব্যাখ্যায়। অ্যারিসটটলেরও একশ বছরের বেশি আগে অ্যানাক্সগোরাস মর্মার্থ-উদ্ঘাটন মূলক সমালোচনা করেছিলেন হোমারের চিত্রকল্পের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছিলেন, অ্যাপোলোর নিক্ষিপ্ত তীর আসলে সূর্যের রশ্মি। আসলে এ-সবই প্রতীক, প্রতীকী অর্থেই এ-সব বুঝতে হবে। যেমন হারকিউলিস এবং থিসউস, এঁরা হলেন নানা virtue-র প্রতীক। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক পণ্ডিত বুঝিয়ে বললেন, ভার্জিল-এর 'ঈনিড' আসলে মানবাত্মার রূপক। 'Interpretation''-এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেছেন S. E. Hyman তাঁর "The Armed Vision" (Greenwood Press, Publishers; West Port, Connecticut, 1948) গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, এই ধরনের মর্মোদ্ঘাটন চলে সারা মধ্যযুগ জুড়ে। গ্রেগরি দি গ্রেট বলেন, বাইবেলের অর্থের তিনটি স্তর আছে, "The literal or historical the allegorical or typical, and the tropological or moral" তাতেও শান্তি নেই, "and later theologians added a fourth, the anagogical or mystical। পূর্ণ উদ্যমে চলল এই রূপক ব্যাখ্যা, প্রায় রেণেশাঁসের শেষ পর্যন্ত। একেবারে ১৬০৫ সালে এসে মর্মব্যবচ্ছেদের এই পণ্ডিতি প্রবণতা একটি জোর ধাক্কা খেল স্যার ফ্রান্সিস বেকনের হাতে। "দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং"-এ তিনি বললেন, রচনা আগে হয়, তাতে অর্থযোজনা হয় পরে। অর্থযোজনা, "meaning added"। ভিতর থেকে টেনে বের করে আনা নয়, বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া। এই ধারণাটা কতদূর সত্য সে বিষয়ে সমালোচকেরা কোনও দিন একমত হবেন কিনা সন্দেহ। যেমন ধরুন, কবিতাতে প্রতীকের ব্যবহার। প্রতীকের অর্থ, কিংবা তাৎপর্য, কিংবা শক্তি, কিছুই সমালোচকের আরোপিত নয়, কীসে যে তার উৎপত্তি, কোথায় তার উৎস খুঁজতে গেলে অতলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। সে দিকে পা বাড়ানর চেষ্টা আপাতত না করাই ভাল। বরং বিনাবাক্যব্যয়েই স্বীকার করে নিতে পারি, কবিতায় যে শক্তি, তার অনেকখানিই নিহিত থাকে নানা শব্দের, নানা অনুষঙ্গের, নানা শব্দ সমন্বয়ের পিছনে চেতনার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত উপলব্ধি স্মৃতি বিস্মৃতির যে landscape, যাকে বলা যায় the landscape of the soul, তার উদ্ভাসনের ক্ষমতায়। প্রতীকের মধ্যে সংহত সেই-সব স্মৃতি, উপলব্ধি, আবেগ। কাজেই কবিতার আলোচনায় প্রতীকের

প্রতি মনোযোগ না দিলে কবিতার একটি আসল জোরের জায়গাই আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

কিন্তু সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সমালোচককে নিয়ে মুস্কিল হল, তিনি বসতে পেলে শুতে চান, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন। আবার, সাহিত্য ছাড়া তাঁর যদি অন্য কোনও 'মিশন' থাকে, সাহিত্য বহির্ভূত কোনও সামাজিক রাজনৈতিক কিংবা অন্যবিধ লক্ষ্য থাকে জীবনে , তা হলে তো কথাই নেই। তিনি ফ্রয়েডপন্থী হলে ফ্রয়ডীয় ব্যাখ্যা দেবেন কবিতার, মার্কসপন্থী হলে দেবেন তার মার্কসীয় ব্যাখ্যা। বুঝতেই পারা যায়, তাঁদের সকলেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কবিতার উপভোগে কিংবা মর্মগ্রহণে সাহায্য করা, তা নয়, অনেকেরই উদ্দেশ্য তাঁদের নিজ নিজ শাস্ত্রের মহিমা প্রচার।

কবিতার "অন্তর্নিহিত বক্তব্য" বা "ভাবার্থ" নামদেয় কোনও একটি বস্তুর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রধান আপত্তি, ব্যাখ্যা কবিতায় জায়গা জবরদখল করে বসে। কবিতার অর্থ যদি কবিতার দেহ থেকে আলাদা করে আনা যায় এবং সেই অর্থটির কবিতার বাইরে আলাদা কোনও অস্তিত্ব আছে, এমন কথা বলা যদি ভুল না হয়, তা হলে বুঝতে হবে, কবিতাটি আর যাই হক কবিতা নয়। রামবাবুর দেহকে বাদ দিয়ে তাঁর আত্মাটি রামবাবু নয়। কারো চোখে রামবাবুর যদি কোনও মূল্যে থাকে, সমগ্র রামবাবুটিরই আছে, তাঁর বিশুদ্ধ আত্মার নয়। আর কবিতা তো একেবারেই দেহ সর্বস্ব, বইয়ের পাতা থেকে কবিতাটি মুছে দিলে সাদা পাতাটিই মাত্র সেখানে পড়ে থাকে।

কবিতার সম্পর্কে এই কথাটিই আমি সার বুঝেছি, (আমি বুঝেছি, বলাই ভাল, কেননা তা না হলে লেখাটা ক্রমশ আপ্ত বাক্যের মতো হয়ে যাচ্ছে) শব্দ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে কবি যা রচনা করলেন, সেটাই আমাদের প্রাপ্তি, "এহো বাহ্য" বলে তাকে পেরিয়ে গিয়ে আর কিছু পাবার আশায় যে হাত বাড়ায়, কবিতা তার জন্যে নয়। মংপুতে মৈত্রেয়ীদেবীর সঙ্গে কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তার মত অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন :

> কবির বক্তব্য চুলোয় যাক, পাঠকের মনে সে অন্যায়সে নতুন রূপ নিতে পারে। বোঝা অনেক রকম আছে, যাঁরা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝেন, তাঁদের বোঝা কবিতা বোঝা নয়—কবিকে সত্যি বুঝতে হলে তাঁর সমগ্র রূপকে গ্রহণ করবার, ভাল লাগার বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষমতা থাকা চাই। মর্মব্যবচ্ছেদ যত প্রবল হয়ে ওঠে কবিতা তত ব্যর্থ হয়ে যায়। যত মাটি করে এই অধ্যাপকের দল, যারা কবিতার নোট লেখে আর ক্লাসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে। "কবি বলিয়াছেন....."। আহা, কবি যা বলিয়াছেন তা তো কবিতাতেই আছে, আর যদি না বলিয়া থাকেন তবে সেটা জুড়ে দিয়ে লাভ কি? প্রত্যেকটি কথা তারা খুঁটিয়ে দেখে, কোনটি কেন বলিয়াছেন, তার গূঢ় তাৎপর্য কি, যে তাৎপর্য একমাত্র তাঁর ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন রকমেই মনে আসত না, কী দরকার সে ব্যাখ্যা দিয়ে আমার? আমার কাছে আমার ব্যাখ্যা আছে। টীকা লেখবার কোনো দরকার হয় না। কবিতা যদি ভালো কবিতা হয়, সে আপনি সম্পূর্ণ, তার মধ্যেই আছে তার ব্যাখ্যা। তাকে গ্রহণ করবার জন্যে Scan করবার কিছুমাত্র দরকার নেই।
>
> (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী)

বরং, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যদি দেখতেই হয়, কবিতার "বক্তব্য" নিয়ে মাথা বেশি না ঘামিয়ে তার বহিরঙ্গ তার আঙ্গিক তার শব্দ নির্বাচন, তার ছন্দ, তার বিবিধ উপকরণ, যথা 'ইমেজারি', প্রতীক ইত্যাদির ব্যবহার, এ-সব নিয়ে কথা বলাই ভাল। তা না হলে আর কী নিয়ে শিক্ষক তাঁর ক্লাসে এবং সমালোচক তাঁর লেখায় বলবেন? এই একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, বিশ্লেষণ করে যে বক্তব্যটা পাওয়া গেল, সেটাই যদি কবির বক্তব্য হত, যদি সেইটেতেই নিজেকে তিনি ঠিক ভাবে প্রকাশিত বলে মনে করতেন, তা হলে সেটাই তিনি লিখতেন। এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা মিলটন কি শেলি কি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি এলিয়ট গদ্য লিখতে পারতেন না। তাঁরা কাব্য ছাড়া অন্যে লিখেছেন যে কাব্য যা পারে গদ্য তা পারে না। কাব্যের কথাটা গদ্যে লিখতে গেলে সেটা অন্য কথা হয়ে যায়।

যে মন নিয়ে আমরা প্রবন্ধ পড়ি সে-মন নিয়ে কবিতা পড়লে চলে না। অনাবশ্যক প্রশ্ন করা চলে না। আমাদের বাস্তব জীবন বস্তুর কঠিন নিগড়ে বড় আঁটসাঁট করে বাঁধা, কবিতা মুক্ত, কবিতা স্বরাট। এ দাবি করা চলে না যে তাকে পদে পদে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিল রেখে চলতে হবে, দাবি করা চলে না যে যেহেতু শ্রাবণ মাসে ফসল কাটা হয় না, অতএব 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'-র সঙ্গে "রাশি রাশি ভারা ভারা। ধান কাটা হল সারা", লেখা চলবে না। প্রশ্ন করা চলে না, "দুঃসময়" কবিতার পাখি কোথায় উড়ে চলেছে, "নিরুদ্দেশ যাত্রা"-র সুদর্শীটিই বা কে?

মনে রাখতে হয়, ওই যে অনির্দেশ্যতা যার ফলে আমরা, কবি যার কথা বলছেন, তাকে মুঠো করে ধরতে পারছি না, যার ফলে দেশে কালে তার আর কোনও শেষ থাকছে না, তাতেই কবিতার শক্তি তার অফুরন্ত প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমারে তুমি অশেষ করেছ/এই কি লীলা তব"। কবিও অশেষ করেন তাঁর সৃষ্টিকে।

তাকে খর্ব করবার আমরা কে? □



# স ও গা ত

শুচিস্মিতা সরকার

আভিধানিক অর্থে সওগাত শব্দের অর্থ হল আন্তরিকতার সঙ্গে উপহার প্রদান। সত্যিই সওগাত পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মোহম্মদ নাসিরুদ্দিন সাহিত্য ক্ষেত্রে আন্তরিক উপহারের ডালি সাজিয়ে দেন। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সওগাত এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারি। কেবলমাত্র মুসলমান মহিলাদের রচনা ও ছবিসহ প্রথম মহিলা সওগাত প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে। মনে রাখা দরকার ভারত তথা এশিয়ার কোনও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সে সময় পর্যন্ত বিশেষ মহিলা সংখ্যা প্রকাশের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। যে দেশে প্রতিবেশী শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনও সাময়িক পত্রিকা সেদিন পর্যন্ত মহিলা সংখ্যা প্রকাশ করে নি সেখানে শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত মুসলিম সমাজের অবরোধবাসিনী মহিলাদের রচনা ও তাঁদের নিজেদের ছবিসহ বিশেষ মহিলা সংখ্যা প্রকাশ করা সেই অন্ধকার গোঁড়ামির যুগে ছিল নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিত হিন্দু মহিলা ছাড়াও এদের পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্তা মহিলাদের দেখা পাওয়া যায় যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তাদের সচেতনতা ও লেখনীর দ্বারা সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। বামা বোধিনী, অবলাবান্ধব, বামা হিতৈষণা প্রভৃতি পত্রিকায় নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী, মানকুমারী বসু, কুলবালা দেবী প্রভৃতি মহিলারা বিগত শতকে রমণীদিগের অবস্থা, মহিলাদের হীনাবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে লেখনী ধরেন। বস্তুত অন্তঃপুরশিক্ষিত মহিলা কবি এবং লেখিকাদের যে গোষ্ঠী হিন্দু মহিলাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সে অর্থে আলোকপ্রাপ্তা প্রতিবাদী মুসলিম মহিলাদের কথা তখনও পর্যন্ত শোনা যায়নি। ব্যতিক্রমী হিসাবে বামাবোধিনী পত্রিকায় এ সময় তাহেরুন্নেসা নাম্নী এক মুসলিম মহিলার প্রকাশিত লেখার কথা উল্লেখ্য।

'সওগাত' ছিল সেই পত্রিকা যা মুসলমান মেয়েদের লেখার সুযোগ করে দিয়ে ব্যাপক অর্থেই তৈরি করেছিল মুসলমান মহিলা লেখিকাগোষ্ঠীর। সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ছিলেন নারী আন্দোলন যজ্ঞের অন্যতম হোতা। মহিলা সওগাতের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—'পুরুষেরা' আবহমান কালের ন্যায় বর্তমানেও নারীদের জীবনের গতিপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে..... আর নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সেই পথেই চলিয়া চলিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে।' নাসিরুদ্দিন সাহেবের নারীমুক্তি আন্দোলনের এ আয়োজন ব্যর্থ হয় নি। সওগাতের এই উদাত্ত আহ্বান অন্তঃপুরের স্রোতহীন প্রবাহে সৃষ্টি করে ঘূর্ণির, যে কয়জন মহিলা ইতিপূর্বে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁরা এই আহ্বানে সাড়া তো দিলেনই, সব থেকে বেশি উৎসাহিত হলেন সেই মহিলারা যারা এতদিন অন্তঃপুরের কোণে তাদের জ্বালা, যন্ত্রণা, আনন্দকে নিভৃতে ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। আশ্চর্যভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল তাদের বেদনার ইতিহাস।

বাংলার মুসলিম মেয়েরা এমন কিছু সমস্যা ও অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন—যা ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের অন্তরের কথা। সওগাত পত্রিকাতেই অগ্নিকন্যা এম. রহমান অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন তাঁর 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা' প্রবন্ধে। তিনি বললেন, "জ্ঞানত শুনে আসছি, মোসলমান জাতের মত পর্দা কোন জাতের নেই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইসলাম আমাদের জন্য কি রূপ পর্দার ব্যবস্থা দিয়েছে?

আবরু রক্ষা করা না অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় অবরোধে বাস করা? ...মোসলেম রমণী আমরা আমাদের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকার দাবী করছি। নারীর নবজাগরণের যুগে অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করে কোনও কাজ করব না। অন্ধভাবে ধর্ম্মশীলা হবোনা। ইসলাম আমাদেরকে কারাপ্রাচীরের ভিতর অবরুদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকার মত গৃহসজ্জার উপকরণ হয়ে থাকতে বলেনি, জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে। .....আমরা চাই—আমাদের ইসলাম দত্ত সম্মান স্বাধীনতা, চাই ইসলাম দত্ত অধিকার.....”[২]

এই জ্বালাময়ী ভাষা যে মহিলার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় তার জীবন ছিল মাত্রই ৪১ বছরে সীমায়িত। হুগলি জর্জ কোর্টের আইনজীবী স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মজহারুল আনওয়ার চৌধুরীর কন্যা হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও খুব গোপনেই তিনি তার চাচাতো ভাই এবং বাড়ির হিন্দু সরকারের কাছে বাংলা শেখেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে ফুরফুরার মাহমদুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ হলে শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার অনুকূল না হওয়ায় তাঁকে এই চর্চা গোপনেই অব্যাহত রাখতে হয়।

নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত বেগম রোকেয়ার লেখা এম. রহমানকে উৎসাহিত করে। সওগাত, ধূমকেতু, বিজলী, মহম্মদী, আত্মশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর তেজোদীপ্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। নারীজাতির প্রতি পুরুষের অবিচারের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, “জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গেই নারীকে পুরুষের মত গড়ে তুলতে হবে। পরানুগ্রহে প্রতিপালিত না হয়েও যেন সে বেঁচে থাকতে পারে, .....কেবল পুরুষই তাকে বিয়ে করবে কেন, নারীও যেন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে।”[৩]

ফরিদপুর জেলার উকিল আবদুর রহমানের কন্যা এবং নোয়াখালির মকবুলল হকের স্ত্রী আখতার মহল সৈয়দা খাতুনও ছিলেন নিতান্তই স্বল্পশিক্ষিত। গৃহশিক্ষকের কাছে আরবি, উর্দু ও সামান্য বাংলা শেখা তাঁর শিক্ষার আপাত সীমারেখা মনে হলেও তিনি তাঁর লিখিত প্রবন্ধে তাঁর মানসিক উৎকর্ষ ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পর্দানশীন অন্তঃপুরশিক্ষিত এই মহিলা মুসলমানদের জঘন্যতম তালাক প্রথার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি অভিযুক্ত করেন ভণ্ড মৌলবীদেরও। ১৯২৫ থেকে ২৭ এই অল্প সময়েই সওগাত, নওরোজ, মাতৃমন্দির প্রভৃতি পত্রিকায় আখতার মহলের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, যা ছিল তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারারই প্রতিচ্ছবি। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই এই লেখিকার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ‘নিয়ন্ত্রিতা’ ও ‘মরণবরণ’ উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। আখতার মহলের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁকে ভোরের পাখি হিসাবে উল্লেখ করে সঠিক মূল্যায়নই করেন।

বেগম আফসারুন্নেসা মন্তব্য করেন যে, অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল আগে এক মুসলিম অন্তঃপুরে একটি সম্ভাবনাময়ী সাহিত্য প্রতিভা মুকুলিত হয়ে অকালে ঝরে পড়েছিল। বেগম আখতার মহল, সৈয়দা খাতুন সেই অন্ধকার যুগে নৈরাশ্য ও বিহ্বলতার দিনে মুসলিম মহিলা সমাজে ভোরের পাখির মতই অনাগত দিনের শুভ সওগাত বয়ে এনেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু শোচনীয় যতিপতন। সঠিক অর্থেই আখতার মহলের মৃত্যু সাহিত্য ক্ষেত্রে শোচনীয় যতিপতনই ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্দানশীন রক্ষনশীল মুসলমান সমাজের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে যে সব সাহসী মহিলারা বাংলা ভাষায় তাদের প্রতিবাদী মতামত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা আজও আমাদের শ্রদ্ধার্হ। মুসলিম মহিলাদের বাংলা ভাষা চর্চাতেই ছিল বাধা। তৎকালীন বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ কর্মের প্রয়োজনে পুরুষদের বাংলা ও ইংরাজি শিক্ষা দিলেও নিজেদের বাঙালি বলে চিহ্নিত করতে এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করতে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে এই সব পুরুষগণ তাদের পরিবারস্থ মহিলাদের ইসলাম ধর্মগ্রন্থটুকু পাঠ করার জন্য কিঞ্চিত আরবি বা ফার্সি ভাষা শিক্ষা দিলেও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। আজন্ম বাংলায় লালিত অন্তঃপুরচারিনী এই সব মুসলমান মহিলারা কিন্তু বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা পারেননি বাংলা ভাষার দুর্দমনীয় আকর্ষণকে প্রতিহত করতে। গোপনে চর্চা করেছেন বাংলা। সেই ভাষাতেই লিখেছেন গল্প প্রবন্ধ। এই ভাষাই তাঁদের প্রাণের আকুতির সঙ্গে মিশে যেমন ফুটে উঠেছে কবিতা হয়ে তেমনই গর্জে উঠেছে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে।

যে-দেশে আজন্ম লালিত, সে দেশকে ভাল না বেসে, সে ভাষাকে বাদ দিয়ে কোনও জাতির পক্ষে যে টিঁকে থাকা সম্ভব নয় সে কথা বুঝতে অধিকাংশ মুসলমান পুরুষ অপারগ হলেও মহিলারা তা বুঝে ছিলেন। আর এই সরল সত্য প্রকাশ করেন তাঁর প্রবন্ধে নুরুন্নেচ্ছা বিদ্যাবিনোদিনী, তিনি বলেন, “পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তর ধরে বাঙ্গলাদেশের গন্ডীর মধ্যে বাস করে, আজন্ম বাঙ্গালার ফলে আর জলে কলেবর বৃদ্ধি করে, আর এই বাঙ্গলা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙ্গালি না হয়ে আমরা অপর কোনও একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তা হলে আমাদের আর কখনও উত্থান নাই, .....।”

..... “আমাদের জন্মগত এই অধিকারে অনাস্থাই আমাদের সমাজকে একরকম পঙ্গু করে রেখেছে। .....বুক ঠুকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে এখন জোর গলায় বলতে হবে—আমি বাঙ্গালী, আর এই বাঙ্গালা সাহিত্য আমার সাহিত্য।





সওগাত পত্রিকায় অপর এক লেখিকা ওমদাতুন্নেচ্ছা খাতুনের অভিযোগের তর্জনী উত্তোলিত হয় স্বার্থান্বেষী ইসলাম ধর্মগুরু মোল্লাদের বিরুদ্ধে। তিনি অসম সাহসিকতায় প্রশ্ন তোলেন, “কোন মোল্লায় আমাদের অভক্তি?” তিনি বলেন, “আমাদের অভক্তি কেবল অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লার প্রতি। .....মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও রাজভাষা ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে যে মোল্লা ফতোয়া দেয়—সে মোল্লায় আমাদের অভক্তি। মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষা দানের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সেই মহাপ্রাণ সৈয়দ আহমদকে, যাহারা কাফের বলিয়াছেন, আমরা সেই সব মোল্লার উচ্ছেদ কামনা করি”।[৪] “‘ভাই’ গিরীশ চন্দ্র সেন অতি কষ্টে বঙ্গভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করায় যাহারা বলিয়াছেন, ‘গিরীশ সেন কাফের হইয়া কোরান স্পর্শ করিয়াছে, বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছে, সুযোগ পাইলে আমরা তার মাথা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইব’—আমরা সেই সব মোল্লার ধ্বংস কামনা করি।” রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের এক মহিলার পক্ষে কঠিন সত্যকে প্রকাশ করা তার চূড়ান্ত সাহসিকতারই পরিচায়ক।

ওমদাতুন্নেচ্ছার পাশাপাশি আয়েশা আহমদ ‘মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়’ প্রবন্ধে সমাজে নারীর সঠিক স্থান নির্ণয়ের প্রয়াসে বলেন “...পুরুষের পার্শ্বে নারী সুস্থান অধিকার করিলে সমাজের উন্নয়ন গতি যে দ্বিগুন বর্ধিত হইবে ইহা প্রমাণিত সত্য,...।

...আমাদের নারীর অবস্থা আবহমান কাল হইতে একই রূপ আছে, নারী চিরকালই মূর্খ ও হেয়। জন্ম-জন্মান্তর হইতে পুরুষের অধীনতায় নারী এরূপ অভ্যস্থ হইয়াছে যে, তাহার স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য—তাহার স্বাভাবিক কোমলতা ও পবিত্রতা অক্ষত রাখিয়া, নারীত্বের, ব্যক্তিত্বের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করা”।[৫]

মিস ফজলতুননেসা, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম হন এবং উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যান তিনি সওগাত পত্রিকায়, “মুসলিম নারীর মুক্তি” নামক প্রবন্ধে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “...সমস্ত নারীমন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংগ্রাম করবার যে প্রধান অস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞান—তাই তাদের নাই। আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্ম্মভেদী একটা অনুশোচনা আর সর্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এর জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক শিক্ষা। ...যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় রাখার উপযোগী শক্তি দেয়, সেই শিক্ষা”।[৬]

“...শিক্ষা নেই তাই সাহসও নেই,—কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে”। ‘স্ত্রী শিক্ষা’ প্রবন্ধে বদরুন্নেসা খাতুনও নারীদের বিশেষত মুসলমান নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো প্রত্যেক পিতা মাতার অবশ্য কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন। প্রায় অশিক্ষিত বিবি আশরাফ উন্নিসাও বুদ্ধি ও বিদ্যার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বুঝতে অক্ষম হয়েছিলেন। ১৩২৫ পৌষ সংখ্যার সওগাতে তাঁর কাঁচা হাতের যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেটি ছিল—বুদ্ধি বলে, বিদ্ধা তব/হয় কি আদর,/আমি যদি নাহি রই/সংসার ভিতর।/বিদ্যা বলে, মুর্খ তুমি/শিখবে আর কবে/বুদ্ধির বিকাশ নাই/মম বিনা ভবে।

কবিতাটির গঠনশৈলী ও বানানে যে ত্রুটিই থাকুক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে কবিতাটির অন্তর্নিহিত আকুতিটুকু বুঝতে কিন্তু আমাদের এতটুকু ভুল হয় না। বস্তুত ‘সওগাতে’র লেখিকা গোষ্ঠীর বিভিন্ন লেখা থেকে একথা অক্লেশে উপলব্ধি করা যায় যে মুসলিম নারীসমাজের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত সর্ব স্তরের নারীর মধ্যেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আবহমানকালের পর্দা ও অবরোধ সক্ষম হয়নি নারীসমাজের বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে। ঘোমটা খসিয়ে কম্পমান পদযুগল অবরোধের বাইরে রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম নারীসমাজ। চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তাঁরা ইসলাম ধর্ম, কোরান হাদিস এবং স্বার্থান্বেষী মোল্লাদের যারা চিরকাল শাস্ত্রের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করে নারীদের চিরঅবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। অবরোধ, অজ্ঞতা, কুসংস্কারে নিমজ্জিত মুসলিম নারীসমাজের যন্ত্রনায় বিক্ষুব্ধ শামসুন নাহার মাহমুদ ১৩৩৩ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত তার ‘নারী জাগরনী’ প্রবন্ধে বলেন, “এই মহাজাগরণের যুগে ভুল ধারনার বশবর্তী হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে গৃহে বসিয়া থাকা আমাদের অনুচিত। ইসলামের বিধানানুসারে দেশের, জাতির ও ধর্ম্মের কাজে নিজেকে যথাশক্তি নিয়োজিত করাই কর্তব্য। এই জন্য আমরা অনৈসলামিক অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন করিতে চাই”। তিনি আরও বলেন—“বাংলার মুসলমান সমাজ নারীর স্কন্ধে অবরোধ ও অশিক্ষার যে বিপুল জগদ্দল শিলা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারই গুরুভারে বঙ্গনারী গৃহকোণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ...তাহাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদের মনোশ্চক্ষেও তদ্রুপ জ্ঞানালোকের প্রবেশ নিষেধ”[৮]। শামসুননাহারের এই প্রবন্ধটি তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন করে তোলে। গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ তাদের নির্মিত অচলায়তন ভেঙে পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। লেখিকার কোনও কোনও বক্তব্য ধর্মবিরোধী বলেও অভিযোগ করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের কুটিল ভ্রুকুটি লেখিকাদের বলিষ্ঠ লেখনীকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়নি।

'সওগাতে'র ছত্রছায়ায় শুধু যে প্রাবন্ধিকরাই তাদের প্রতিবাদী মতামত প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়। 'সওগাতে'র আন্তরিকতায় অনেক মুসলিম নারীই তাঁদের অনুভূতির ছন্দোবদ্ধতা প্রকাশ করে পেয়েছিলেন কবিত্বের সম্মান, যে অন্তঃপুরচারিনীরা অন্তঃপুরের অন্তঃকোণে তাদের একান্ত সুখ-দুঃখ প্রণয় বিরহের অনুভূতিগুলি নাড়াচাড়া করে কাটিয়ে দিত একটা অসফল জীবন, সওগাতের উদাত্ত আহ্বান তাদের আকৃষ্ট করেছিল। 'সওগাতে'র পাতায় পাতায় তাদের সেই অনুভূতি ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল কবিতা হয়ে।

সওগাত সম্পাদক মোঃ নাসিরুদ্দিন সাহেবের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় সুফিয়া কামালের কবিতার হাতেখড়ি হয়। ১৩৩৩ সনে সওগাত অফিসে নামহীন দাঁড়িকমাহীন যে কবিতাটি নাসিরুদ্দিন সাহেবের হস্তগত হয়, সেটিকে তিনি যথাযথ যতিচিহ্ন দিয়ে এবং লাইন ঠিক করে 'বাসন্তী' নাম দিয়ে ১৩৩৩-এর চৈত্র সওগাতে প্রকাশ করেন, সুফিয়া এন. হোসেনের নামে। এই কবিতাটিই সুফিয়া হোসেনকে কবিত্বের সম্মান এনে দেয় এবং কবিতাটি সমাদৃত হয় কবি ও সাহিত্যিক মহলে। রবীন্দ্রনাথও এই নবীনা কবিটির কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোরা উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন কবি সুফিয়া কামালকে।

১৩২৬-এর সওগাতের চৈত্র সংখ্যায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'খেলার সাথী' কবিতাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে মোতাহেরাবানুর কবিজীবনের সূত্রপাত হয়। স্কুলের শিক্ষায় বঞ্চিত মোতাহেরা বাড়িতেই তাঁর সুপণ্ডিত পিতা সি. আই. ডি. ইন্স্‌পেক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফ্ফরের কাছে আরবি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইউসুফ আলীর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং স্বামীর সহৃদয় সহযোগিতা ও উৎসাহ তাঁর কাব্যচর্চার পথ সুগম করে। সওগাতে কবিতা প্রকাশিত হবার পর মোসলেম ভারত, যুগের আলো, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। মোতাহেরাবানুর বিভিন্ন স্বাদের ১০০টি কবিতা তাঁর 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

'বৌ কথা কও' পাখি নিয়ে মোতাহেরা বানুর সুরঝংকৃত কবিতাটি আমাদের আবেশে মন ভরিয়ে দেয়। বৌ কথা কও পাখি নিয়ে রচিত তাঁর কবিতাটি সওগাতেই প্রকাশিত হয়—

বৌ কথা কও, বৌ কথা কও গান
আর কত কাল গাইবি বনের পাখি,
ব্যথায় ব্যথায় আকাশ হল নীল,
বাতাস কেঁদে দোলায় তরুর শাখি।

মোতাহেরা ছিলেন স্বভাবকবি। তাঁর কবিতার শব্দ চয়ন, ধ্বনি মাধুর্য ছিল অভূতপূর্ব, প্রকৃতাথেই কবিতার সুরমাধুর্য সহজেই অনুভূত হয় তাঁর কবিতায়, মোতাহেরার কবিতার এই অনির্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি সহজেই আকৃষ্ট করে সঙ্গীতপ্রেমী মোহিনী সেনগুপ্তকে মোহিনী দেবী মোতাহেরাবানুর 'অধীরা' এবং 'প্রতীক্ষা' নামক কবিতা দুটিতে সুরারোপ করেন। সুরারোপিত 'অধীরা' কবিতাটি তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক কাসেম মল্লিক কর্তৃক গীত হয় এবং তা রেকর্ডও করা হয়। তাহ্‌মিনা বানু, তাঁর 'কবি সৈয়দা মোতাহেরাবানু শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—সৈয়দা মোতাহেরাবানু কাব্য জগতে হারিয়ে যাওয়া একটি নাম। সবার অলক্ষ্যে নিঃশেষিত স্বেচ্ছা নির্বাসিত একটি কাব্য প্রতিভা। আপন ভুবনে আত্মসমাহিত, নির্জনতাপ্রিয় আত্মপ্রচার বিমুখ—" মোতাহেরা বেগম সম্বন্ধে এর থেকে ভালো বিশ্লেষণ বোধ আর হয় না।

সওগাতের অন্য আর একজন কবি মাহমুদা খাতুনের জীবনের গল্প একটু অন্যরকম। রাজশাহি বিভাগের ডিভিশন্যাল স্কুল ইন্‌সপেক্টর মহঃ সোলায়মান সিদ্দিকের কন্যা মাহমুদা প্রগতিশীল পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠেন। তিনি বাংলা শেখেন তাঁর আম্মা ও নানীর কাছে, তিনি 'আনোয়ারা' উপন্যাসের ঔপন্যাসিক নজিবর রহমানকে পেয়েছিলেন গৃহশিক্ষক হিসাবে। উপযুক্ত গৃহশিক্ষক এবং পিতার প্রেরণা তাঁকে অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে উৎসাহিত করে। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, "আমি যখন মিশন স্কুলে ক্লাস টু-তে পড়ি সে সময়ে কবিতা লিখতে শুরু করি। বার কি তের বছর বয়সে আমার প্রথম কবিতা পত্রিকায় ছাপা হয়।" 'সওগাতে' ১৩৩৬-এর বৈশাখ সংখ্যায় তাঁর বসন্ত বিদায় কবিতাটি ছাপা হয়। সওগাতে লেখা এটাই তাঁর প্রথম কবিতা। তিনি মননে, চিন্তায় এবং সাজসজ্জাতেও অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক ছিলেন। ঐ অবরোধের যুগেও তিনি পর্দাকে অস্বীকার করে বোরখা ত্যাগ করেন। প্রধানত সনেট রচয়িত্রী হিসাবে প্রশংসিত মাহমুদা খাতুনের বাংলা ভাষায় রচিত 'পসারিনী' কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মাহমুদা খাতুনের আত্মকথা থেকে তাঁর সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি কেবলমাত্র কবিই ছিলেন না। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মানসী ও মর্ম্মবানী, উদয়ন, বসুমতি, প্রদীপ, অগ্রগতি, সওগাত, বুলবুল, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বেগম, নবশক্তি, সত্যযুগ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতার সঙ্গে তাঁর লেখা ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ছন্দের বীজমন্ত্র মাহমুদার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। তিনি তার বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করে পাঠককুলের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। 'মন ও মৃত্তিকা' ও 'অরণ্যের সুর' কাব্যগ্রন্থটিতে মাহমুদার পরিণত কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত মাহমুদার মন ও মৃত্তিকা কাব্যগ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা এই বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করে, "কবিতাগুলির শীতল স্বভাব, ছন্দের কোমল



মাধুর্য মনকে পরিস্কৃত করে, বক্তব্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। স্বচ্ছ, সুন্দর একটি ভাবাবেশ প্রতিটি কবিতায় পরিব্যাপ্ত," কবি মাহমুদার সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তিনি ছিলেন মানবতার কবি। প্রেম বিরহ ছাড়াও এই সমাজ সচেতন মানুষটির কবিতায় স্থান পেয়েছিল সমাজ এবং সমাজের মানুষ। পরবর্তীকালে একুশে আন্দোলনের ওপর তিনি অনেক হৃদয়স্পর্শী কবিতা লেখেন। তাঁর কলমেই ফুটে ওঠে একুশে আন্দোলন সম্বন্ধে এক অনবদ্য লাইন—'প্রতি রক্তকণা যদি একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা বলে/তা হলেও কি বলা শেষ হয়?'

সওগাতের শ্লোগান ছিল, "নারী না জাগিলে জাতি জাগিবে না"। আক্ষরিক অর্থেই সওগাতের স্পর্শে ঘুমের দেশে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, উঠেছিল কলস্বর! মুসলিম সমাজ যে নারীদের মূক বধির গৃহব্যবহার্য সামগ্রী হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল, সেই জড় পুত্তলিকাবৎ নারীর মধ্যেই যে এত আগুন লুকিয়ে ছিল তা বোধ হয় সমাজপতিদের কল্পনার বাইরে ছিল। জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি প্রকাশের জন্য কত যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল নারীমন, সওগাতের এই উপহারের ডালি না পেলে কোনদিন আমরা জানতেও পারতাম না। সওগাত যেন ছিল সেই চাবি যা মুসলিম নারীমনে জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত অনুভূতির ঘরের তালা খুলে দিয়েছিল। যার ফলে যুক্তিবাদী প্রতিবাদী মনগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ধর্মাদেশের অন্যায় প্রয়োগের। কবিমনের প্রেম বিরহ মিলন সৌন্দর্যের অনুভূতিগুলো সওগাতের আহ্বানে হাঁফ ছেড়ে কবিতা হয়ে ফুটে উঠেছিল।

সূত্র

১. সম্পাদকীয় (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬)
২. মিসেস এম. রহমান—পর্দ্দা বনাম প্রবঞ্চনা (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬)
৩. নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী আমাদের কাজ (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬)
৪. ওমদাতুন্নেছা খাতুন—কোন মোল্লায় অভক্তি (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬)
৫. আয়েশা আহমদ—মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায় (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৬)
৬. মিস ফজিলতুন্নেসা—মুসলিম নারীর মুক্তি (সওগাত, ৭ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬)
৭. আশরাফ উন্নিসা—বুদ্ধি ও বিদ্যা (সওগাত, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫)
৮. শামসুন নাহার মাহমুদ—নারী জাগরনী (সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৩৩)
৯. সুফিয়া এন. হোসেন—বাসন্তী (সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩)

সহায়ক পঞ্জি

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন—বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ
মোরশেদ সফিউল হাসান—বেগম রোকেয়া—সময় ও সাহিত্য
গোলাম মুরশিদ—সঙ্কোচের বিহ্বলতা
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত
সুফিয়া কামাল—আমার কালের কথা
মাওলানা মোবারক করীম জওহর—কোরান শরীফ

# কলিকাতা পুলিশ মিউজিয়াম

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মানিকতলায় লোয়ার সারকিউলার রোডে একটি বাটী ইংরেজি প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করেন। উহা তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন রায় তাঁহার জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।' এই সেই বাড়ি যার বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, 'পৌত্তলিকতা ও সর্বপ্রকার উপধর্মের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের রণভেরী এই স্থান হইতে বাজিয়া উঠিল।' ১৯২৮ সালের মুদ্রিত গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, '১১৩ নম্বর বাটী। উক্ত বাটীতে এখন পুলিশ আছে।' কিন্তু কবে থেকে এই বাড়িতে পুলিশ আছে? জানি না। তবে এটুকু জানি যে ১৯৯৬ সালের ৩১ আগষ্ট সন্ধ্যায় এই বাড়িতে 'কলিকাতা পুলিশ মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন হয়েছে।

অবশ্য এই ক্ষুদ্র সংগ্রহশালাকে একেবারে 'কলিকাতা পুলিস মিউজিয়াম' বলে অভিহিত করা যায় কিনা তাতে একটু সন্দেহ আছে। মাত্র তিনটি মাঝারি মাপের ঘরে কলকাতা পুলিশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত কতকগুলি দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রদর্শনীকে একেবারে মিউজিয়াম নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ঘরে যথার্থ ঐতিহাসিক বস্তুর প্রদর্শনী এবং একটি ঘরে কলকাতা পুলিশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে দৃষ্টিগোচর করে তোলার প্রচেষ্টা। কলকাতা পুলিশের ইতিহাস প্রসঙ্গে এসেছে কলকাতার বন্দর ও শহরের জন্ম বৃত্তান্ত। বর্ণনার মাধ্যম আঁকা ছবির ছবি এবং সংক্ষেপে তথ্যপূর্ণ কিছু লেখা। অর্থাৎ ছবি ও লেখা। এই অংশ ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ভাসমান

নৌ সংগ্রহশালার দুঃখী বিকল্প। তবে কলকাতা পুলিশ বিভাগের প্রথম যুগে কর্মীদের পোশাক পরিচ্ছদ কীরকম ছিল, হাতিয়ার কীরকম ছিল, সে সবের বিবর্তন হতে হতে বর্তমান কালে কীরকম হল তার যেসব ছবি ও হাত দেড়-দুই মাপের মূর্তি এখানে রাখা হয়েছে সেগুলি সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। কলকাতা পুলিশ বাহিনীর পোশাক পরিচ্ছদের বিবর্তন থেকে সমাজ বিবর্তনেরও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুলিশের কাজও কত বহুবিস্তৃত ও জটিল হয়েছে তারও পরিচয় এই ঘরে দেওয়া হয়েছে।

মাঝখানের বড় ঘরটাতে দেখতে পাওয়া যায় ব্রিটিশ আমলের শেষ তিন-চার দশকে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কলকাতা পুলিশ বিভাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনীর কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দৃশ্য। আলিপুর বোমার মামলা হয় ১৯০৮ সালে এবং তার কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বোমার ছাঁচ কীরকম ছিল, মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য কোন্ রিভলবার ব্যবহার করা হয়েছিল এইসব প্রদর্শিত হয়েছে আলিপুর মামলার সূত্রে। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক একটা জিনিস হল বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য প্রেরিত বই-বোমা—একখানা মোটা বইয়ের ভেতরে খোপ কেটে বোমাটাকে এমনভাবে বসানো হয়েছিল যাতে বাইরে থেকে দেখে বা নেড়ে কিছু বোঝা না যায়, অথচ বইটা খুললেই বোমাটা ফেটে যাবে। কিন্তু কেন কিংসফোর্ড বইটা না খুলেই তাকে রেখে দিয়েছিলেন সেও এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। মাণিকতলার যে-বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির কারখানা খুঁজে পেয়েছিল পুলিশ তার একটা ছবি আছে। জানতে ইচ্ছে করে ঠিক কোথায় ছিল এই বাগানবাড়ি এবং এখন সেখানে কী আছে।

১৯১০ সালে পুলিনবিহারী দাস প্রমুখ ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের হেফাজৎ থেকে পাওয়া যায় নানা রকমের দা রামদা তরোয়াল ইত্যাদি হাতিয়ার। এই সংগ্রহ প্রদর্শনীতে সেইসব হাতিয়ার এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যার পেছনে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায় বিভলবারের সঙ্গে কার্তুজ সাজানোর কুশলিতায়ও। ১৯১৪ সালে আমেয়াস্ত্রের বিরাট দোকান রোডার অ্যাণ্ড কোম্পানির লুঠ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে এক দারুণ চাঞ্চল্যকর ঘটনা, আরও নাটকীয় ছিল কিছু অস্ত্রের পুনরুদ্ধার। ১৯৩২ সালে ষ্টার্লিং জ্যাকসনের উপর বীণা দাস যে রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়েন সেটি ছিল খুব ক্ষুদ্র আকারের কিন্তু খুব শক্তিশালী। আর তখন বীণা দাসকে দেখতে ছিল খুব উজ্জ্বল ও সুন্দর। অবশ্য প্রায় সত্তর বছর বয়সেও তাঁকে সুন্দরীই দেখেছি। এই প্রদর্শনীতে তাঁর তখনকার বয়সের ছবি আছে। ভাবতে অবাক লাগে এই মুখের পেছনে ছিল কী প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' ছিল তাঁদের কাছে। তাঁদের পথে নাকি অহিংসার পথে স্বাধীনতা এসেছে সে তর্ক অর্থহীন। তবে এটা ঠিক যে সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে কোনও ইংরেজ কর্মচারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে চলে যাননি। প্রকৃতপক্ষে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল। বিপ্লবী তৎপরতায় একেবারেই ভাটা পড়ল ১৯৩৫-এর নতুন ভারত আইনে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের উৎসাহে।

এই ক্ষুদ্র সংগ্রহশালার প্রধান আকর্ষণ মোটামুটি ১৯০৮ সাল থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছরের জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ঘটনা, ব্যক্তি ও হাতিয়ার সম্বন্ধে একটা দৃশ্যগত ধারণা দেওয়া। কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে নিশ্চয়ই আরও অনেক প্রসঙ্গ আছে যেগুলির মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হতে পারে অপরাধ জগতের কাহিনী। অর্থাৎ যারা ব্যক্তিস্বার্থে খুন লুঠ ইত্যাদি করে তাদের কাহিনী। প্রদর্শিত বস্তুগুলিও অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই অপরাধগুলির পেছনে কাজ করেছে আদর্শবাদ ও মর্যাদাবোধ। ব্রিটিশ আমলে জঙ্গি অভিযানগুলিকে 'ডাকাতি' বলে উল্লেখ করা হত। আমরা সেই ঐতিহ্য মেনে এগুলিকে 'ডাকাতি'র পর্যায়ভুক্ত করব কি? একই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে যে যদি কোনও মন্ত্রবলে এইসব ঐতিহাসিক চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতেন তাহলে আজকের জীবনে ও সমাজে তাঁরা কী করতেন? তাঁরা কি নতুন কোনও সংগ্রাম শুরু করতেন?

তবে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ছাড়াও শুধু ইতিহাসের তথ্য জানাবও একটা মূল্য আছে। শুধু রিভলবার বোমা রামদা তরবারির বিরুদ্ধেই ব্রিটিশ আমলে নিষেধের কড়াকড়ি ছিল না, আধুনিক তরুণ সমাজের কাছে এটাও একটা তথ্য যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকার বহু গ্রন্থ, নাটক ও কবিতাকেও বোমা বারুদের মতই বিস্ফোরক পদার্থ বলে মনে করত। সেজন্য বহু গ্রন্থকে তারা নিষিদ্ধ করেছিল, বহু নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে বৈধ বাধা প্রদান করেছিল। সাহিত্য-শিল্পের উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকেই শুরু হয়ে যায়। নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সেনসরশিপের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। এই প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ সেনসরশিপের সম্বন্ধে ধারণা করা যায় এমন কিছু বস্তু বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রদর্শনীর কৌটো পড়েছে ব্রিটিশ শাসনের শেষ চার দশকের উপরেই বেশি। স্বাধীনতার পরে দেশের শিল্পকলা বিদেশে পাচার করার বিষয়ের উপরেও কিছুটা দৃষ্টি পড়েছে। পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধারকরা বহু শিল্পনিদর্শন এই সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে। পুলিশের কাজ যে চোর-ডাকাত। দাঙ্গাবাজদের দমন করা একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই জানার বাইরেও যে পুলিশকে আরও কত রকম কাজ করতে হয় আর সেসব কাজেরও যে বিস্তৃত সামাজিক তাৎপর্য আছে এ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছে এই সংগ্রহশালায়। ছোট জায়গায় ছোট সংগ্রহশালা, কিন্তু ইতিহাসের নিরিখে মূল্যবান। □



# সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতা

মনোতোষ চক্রবর্তী

আমার নিঃসঙ্গতম অনুভূতির মধ্যে
তুমি ফসল ফলাও

তুমি ফসল ফলাও
লাল ফলের

আমার আঙুলের ডগায় তুমি
নীল হতে চাও

আমার বুকের মধ্যে
তুমি লাল হয়ে ফুলে থাকার জন্য

যখন শরৎ যায়
যখন হেমন্ত আসে

তুমি কোন কবি

বঙ্গোপসাগর ক্ষুব্ধ; বোলপুর উন্মত্ত অধীর।
সূর্যের নাটক চলে, দৃশ্য বদল হয় মেঘে ক্ষণে ক্ষণে
বরণে বরণে, উচ্ছল প্রাণের লীলা। শান্তিনিকেতন
বৈরাগী মাটির বুকে ভরে দেয় সঙ্গীতের সুরে
চায়ের পেয়ালা ভরে।

স্বাভাবিক, অলকনন্দাকে উদ্দেশ্য করে লেখা রোম্যান্টিক কবিতায় নাগরিক জীবনের ছাপ—

মোমবাতি শিখা নিদ্রাবিহীন
সৃষ্টির জাগরণ:
দাস ক্যাপিটাল এগারো পৃষ্ঠা বাকি
অলকনন্দা শুয়ে আছে এখনও?

রাত ঝিকিমিকি প্রাণ ঝিকিঝিকি
মানিকতলার খাল

'একজন কবির স্মরণে' রচিত এই অনূদিত অসমিয়া কবিতাটির উপলক্ষ্য জীবনানন্দ দাশ। অসমিয়া ভাষার অগ্রগণ্য কবি নীলমণি ফুকন (জন্ম ১৯৩৩) এই কবিতাটির রচয়িতা। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বরাবরই অসমিয়া কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতা ভারতীয় তথা বিশ্বকবিতার উত্তরাধিকার আত্মস্থ করলেও বাংলা কবিতার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়নি।

উচ্চশিক্ষার সূত্রে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবনের কয়েকবছর অতিবাহিত হয়েছিল আজকের প্রথিতযশা প্রবীণ কবি নবকান্ত বরুয়ার (জন্ম ১৯২৬)। তাঁর কবিতায় রাঢ় বঙ্গের গেরুয়া মাটির রঙ মিশে যাওয়াই স্বাভাবিক। যেমন—

গেরুয়া বৈরাগী মাটি। শাল তাল তমালের ভিড়
নির্মলপ্রভা বরদলৈর (জন্ম ১৯৩৩) কবিতাতেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার অন্তঃস্রোত এসে মিলেমিশে যায়। ১৯৭৬ আর ১৯৭৮ সালে 'সমীপেষু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' নামে তিনি দু'টি কবিতা রচনা করেন (দ্রষ্টব্য 'দিনর পাছত দিন' ও 'অন্তরঙ্গ' কাব্যগ্রন্থ)। ১৯৭৮ সালে লেখা দ্বিতীয় কবিতাটির শেষাংশ—

সুনীল,
তুমি ঠিক বলেছিলে
"কেউ কথা রাখে না"
আমিও বলি
"কেউই
কথা রাখেনি।"

অসমিয়া কবিতার আধুনিকতার এই প্রবহমান ধারা অনুধাবন করতে হলে আধুনিকতার সূচনা পর্ব—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্যের মানবকেন্দ্রিক ভাব ও চিন্তার প্রভাব পড়ল। এই সময়ে একদল ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৮ সালের ২৫শে আগস্ট কলকাতায় 'অসমিয়া ভাষা উন্নতি-সাধিনী সভা'র জন্ম হল। এই সভা অসমিয়া সাহিত্যের উন্নতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরি করেছিল। কলকাতার অসমিয়া ছাত্রদের প্রতি শনিবার এক পাঠচক্রের আয়োজন করা হত, মূলত এটি ছিল সাহিত্য সম্মেলন। এই প্রতিষ্ঠানের যখন গোড়াপত্তন হয় তখন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন তার সম্পাদক (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : বেজবরুয়া ১৮৯১ সালের ১১ই মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনি প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে কলকাতায় ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন)। ১৮৮৯ সালে কলকাতায় 'জোনাকী' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিকে বলা যেতে পারে আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের পথপ্রদর্শক। সি. কে. আগরওয়ালা ছিলের এর মালিক ও সম্পাদক।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ভাবধারা ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে একদল নিবেদিতপ্রাণ অসমিয়া ছাত্র অসমীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে আত্মনিবেদন করলেন। এই পর্বে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগের নব্য বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের ধর্মীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে বিচ্ছেদ সূচিত হল। এই শতাব্দীর চারের দশকের সূচনা পর্যন্ত এই রোমান্টিক জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত ছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) এই সময়ের প্রধান সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। তাঁর গান 'ও মোর আপন দেশ, ও মোর সুন্দর দেশ' অসমে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮) কিছু চমৎকার গীতিকবিতার রচয়িতা। পাশাপাশি হেমচন্দ্র গোস্বামী সনেট রচনা করে অসমীয় কবিতাকে নতুন মাত্রা দেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৮৫৮-১৯৩৬) তাঁর উচ্চকণ্ঠ স্বদেশপ্রেমের কবিতাবলীর জন্য খ্যাত। ভোলানাথ দাস অসমিয়া ভাষায় সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখেন। তাঁর 'সীতাহরণ কাব্য' (১৮৮৮)-এর উপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলিনারায়ণ বরা অসমিয়া ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার সূচনা করেন। 'জোনাকী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কবিরা হলেন, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজারিকা, পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া, বেণুধর রাজখোয়া ও আনন্দ চন্দ্র আগরওয়ালা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক রঘুনাথ চৌধুরী (১৮৭৯-১৯৬৮), অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী (১৮৮৫-১৯৬৭), জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালার (১৯০৩-১৯৫১) রোমান্টিক ও সোচ্চার স্বদেশপ্রেমের কবিতার যুগ। অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী ছিলেন একজন বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমিক কবি। স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম ও সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে জ্যোতিপ্রকাশের লেখনীতে। এছাড়া এই সময়ের কবিদের মধ্যে দুর্গেশ্বর শর্মা, যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা, শৈলধর রাজখোয়া, সূর্যকান্ত ভুইঞা, রত্নকান্ত বরকাকত, ভগবতীপ্রসাদ বরুয়া, প্রসন্নলাল চৌধুরী, পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া, নলিনীবালা দেবী প্রমুখ অসমিয়া কবিতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

চতুর্থ দশকে অসমিয়া কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। রঘুনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত 'জয়ন্তী' পত্রিকা এই পরিবর্তনের প্রথম বাহন। চারের দশকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত অমূল্য বরুয়া, ভবানন্দ দত্ত ও হেমবরুয়া এই নব্য আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা, দেবকান্ত বরুয়া প্রমুখ শেষ পর্বের রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই পরিবর্তনের ঢেউ। প্রসঙ্গতঃ অসমিয়া সাহিত্যে স্বল্পসংখ্যক কবিতা রচনা করে যে কয়জন কবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দেবকান্ত বরুয়া অন্যতম। অসমিয়া ভাষার সেরা প্রেমের কবিদের অন্যতম দেবকান্তের কাব্যসংকলন 'সাগর দেখিছা' (সমুদ্র দেখেছ?) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। রবার্ট ব্রাউনিঙের কবিতার নাটকীয় স্বগতোক্তির (dramatic monologue) সফল প্রয়োগ করে তিনি অসমিয়া কাব্যশৈলীতে যুগান্তর আনেন। সাধারণ ও সহজ কথা বলার ভঙ্গিকে কবিতার মাধ্যমে রূপান্তরিত করে তোলায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

সাগর দেখিছা?
দেখা নাই কেতিয়াও
ময়ো দেখা নাই।

(সাগর দেখেছ?/দেখনি কখনো/আমিও দেখিনি)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থ সামাজিক সংকট, মার্ক্সবাদী সাম্যচিন্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ ও সর্বোপরি স্বাধীনতা পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ এই সময়ের কবিতাকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় নতুন বিষয় নতুন ভাবনা তথা নতুন প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্যগোচর হয়। 'জয়ন্তী' গোষ্ঠীর কবি ভবানন্দ দত্ত ও অমূল্য বরুয়া রোমান্টিকতা বিরোধী, বাস্তববাদী ধারার প্রবর্তন করেন। মার্ক্সবাদের প্রভাব তাঁদের কবিতায় লক্ষণীয়। খুবই কম সৃষ্টিশীল রচনা তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও সেই আদর্শ আজও অসমিয়া কবিতায় দৃঢ়ভাবে প্রবহমান।

চতুর্থ দশকে 'জয়ন্তী' পত্রিকার মাধ্যমেই আজকের বিখ্যাত কবি নবকান্ত বরুয়া তাঁর কাব্য জীবন শুরু করেন। অসমিয়া



কাব্যে রোমান্টিকতার শেষ পর্যায় ও আধুনিকতার মাঝখানে তিনি একজন যুগসন্ধির কবি। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য নবকান্ত কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন বাঙালি কবির সান্নিধ্যে আসেন। কোথাও কোথাও তাঁর কাব্যে ও সুরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমেজ মেলে। তিনি কবিতায় আধুনিকতার সৌরভ নিয়ে আসেন, নাগরিক বিষয় নিয়ে রচনা করেন কবিতা। তাঁর ওপর টি. এস্. এলিয়টের গভীর প্রভাব। প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহার, মুখের ভাষার প্রয়োগে, গদ্যছন্দ ও ছন্দবৈচিত্রের প্রয়োগে তিনি কবিতায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। 'জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করে তার রসোদ্ঘাটনই তাঁর কাব্যের মৌলিক সুর।' পাঁচের দশকে তিনটি কাব্যগ্রন্থ (হে অরণ্য হে মহানগর, ১৯৫১/এটি দুটি এগারোটি তারা, ১৯৫৮/যতি আয়ু কেইটামান স্কেচ, ১৯৬০) প্রকাশের পর নবকান্ত প্রধান কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'রত্নাকর' কাব্যগ্রন্থে তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায় রূপান্তর ও বিবর্তনের সমস্যাই হচ্ছে মূল সুর। নবকান্তর ভাবনা শরীরবিদ্যা থেকে নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও মিথ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তাঁর প্রশ্ন—

যে পূর্ণতার অভিমুখে গতিহীন বেগে আমি যাত্রা করছি
সেই বাঞ্ছিত নবজন্ম আমার পরিবৃদ্ধি না পরিবর্তন
কাকে আমি গ্রহণ করব?

অনায়াসে তিনি নির্মাণ করেন মন্ত্রের মতো সুন্দর উচ্চারণ

প্রত্যেক কবিতাই মুখোশ। আর
প্রত্যেক কবিরই নাম ছদ্মনাম।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'এখন স্বচ্ছ মুখারে' কাব্যগ্রন্থেও আত্মজিজ্ঞাসার এক অনাড়ম্বর পরিপূর্ণতায় তিনি উপনীত।

অজিত বরুয়া (১৯২৮) চতুর্থ দশকের গোড়ায় 'হাতুড়ি' নামে একটি কবিতা লিখে অল্প বয়সে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই যুদ্ধোত্তর অসমিয়া কবিতা চতুর্থ দশকের শেষভাগে পরিণত রূপ পায়। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় বসে লেখা তাঁর 'মন-কুয়াশা সময়' অসমিয়া সাহিত্যের প্রথম সার্থকতম আধুনিক কবিতা। কুয়াশাচ্ছন্ন কার্তিক মাসের এক সকালবেলার মানসিক অবস্থাই এই কবিতার বিষয়—অতীত আর বর্তমান একটি বিন্দুতে এসে মিলেমিশে যাওয়ার মুহূর্ত, যেন স্বপ্ন। সময় যেন থমকে আছে, একটি অদৃশ্য সেতু কবির অতীত, শৈশব স্মৃতিকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে। অবচেতনের উন্মোচনে সুররিয়ালিজমের ছোঁয়া লাগে। তাঁর লেখায় ইমেজিস্ট কবিদের ও টি. এস. এলিয়টের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি প্রকরণকুশলী কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো দৃঢ়বদ্ধ তাঁর কবিতা। ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে অকস্মাৎ মৃত বন্ধুর উদ্দেশে লেখা 'দুখর কবিতা' গঠন শৈলীর দিক থেকে অভিনব। দুর্বোধ্যতার পরিচিত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। পাঁচের দশকে নিশ্চুপ অজিত বরুয়া ছয়ের দশকে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 'জেংরাই ১৯৬৩' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। সন্দেহ ও বিশ্বাস, ভয় ও নির্ভরতার এক জটিল মানসিকতার রূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। সময় ও মৃত্যু সম্পর্কে এক মিশ্রজটিল অনুভূতির কাব্যরূপ এই কবিতাটি।

পাঁচের দশকের অনেক কবিই খ্যাতিমান। প্রগতিপন্থী কবিদের মধ্যে কেশব মহন্ত, রাম গগৈ, অমলেন্দু গুহ ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবিদের মধ্যে নবকান্ত বরুয়া ছাড়াও হর বরকাকতি, হোমেন বরগোহাঞি, মহিমবরা, বীরেশ্বর বরুয়া, প্রফুল্ল ভুঁইয়া, নীলমণি ফুকণ, সুশীল শর্মা, হেম বরুয়া, দীনেশ গোস্বামী, হীরেন গোঁহাই প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছয়ের দশকে ভবেন বরুয়া ও হীরেন গোঁহাই কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি নাম। পাঁচের দশকে কাব্য চর্চা শুরু করেছেন এমন কয়েকজন কবি এই দশকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। নীলমণি ফুকন, হীরেন ভট্টাচার্য ও নির্মলপ্রভা বরদলৈ ও বীরেশ্বর বরুয়া উল্লেখযোগ্য। হরেকৃষ্ণ ডেকা ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তও এই সময়ের কবি।

সাম্প্রতিক অসমিয়া কবিতায় নীলমনি ফুকন নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থে (সূর্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি, ১৯৬৩,/নির্জনতার শব্দ, ১৯৬৫,.আরু কি নৈঃশব্দ্য ১৯৬৮) একাকীত্ব ও নৈঃশব্দ্যের চিত্রকল্প নির্মাণের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বার বছরের কবিতার অধিকাংশই তিনি পরবর্তীকালে বর্জন করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর কালে' কাব্যগ্রন্থে—মৃত্যু রহস্য, অস্তিত্বের দুঃখ-বেদনা ও উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। তাঁর কাব্যশৈলীতেও লক্ষ্য করা যায় পরিবর্তন ও উত্তরণ। এই সময়ের গভীরতা ও বিবিধ ব্যঞ্জনায় তাঁর এই সময়ের কবিতা সমৃদ্ধ। আলাদা আলাদা নামের চেয়ে আগাগোড়াই তিনি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে কবিতা লিখেছেন। প্রথম পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংকলন 'গোলাপী জামুর লগ্ন' থেকে উল্লেখিত চতুর্থ কাব্য গ্রন্থের ১১ নং কবিতাটি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

ঘুমের মধ্যে সে আমাকে তাড়া করেছিল
আচ্ছা, সে এখন কোথায়

মুখে তার আছে না কি
ছিন্নমূল সেই গাছ

ঠোঁট দুটিতে বইছে না কি
রক্তিম দু'টি নদী

দু'চোখে তার এখনো কি আছে
সেই দু'টি কালো ঘোড়া

আজও আমার নিত্যনিশি
কলিজা চেপে রাখে

বিশিষ্ট সমালোচক ভবেন বরুয়া এই কবিতার চমৎকার আলোচনা করেছিলেন। এখানে 'সে' কে? অনামী সে কবিকে কেন-তাড়া করেছিল? কবি কি তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন? অথচ তার সম্পর্কে কবির এমন দরদ-ভরা আগ্রহ কেন? ক্রমে তাঁর মুখ, দুটি ঠোঁট, তার চোখদুটির তাৎপর্য এক একটি চিত্ররূপে মূর্ত করে কবি তার বিশেষায়িত (Particularized) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ প্রকাশ করেছেন। জীবনের সম্ভবনাগুলি থেকে মানুষ দূরে থাকতে চায়, তার রূপের মধ্যে যেন সেগুলিরই উদ্ভাসন। এই রূপটি যেন প্রেতায়িত, ভিত্তিমূল বিপর্যস্ত হওয়ার অসহায়তায়, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বীভৎসতায় আর অচরিতার্থ কামনার অন্ধ অবোধ্য চঞ্চলতায়। একাধারে ভয় আর বেদনা উদ্রেক করা যে চরিত্রকে যথার্থভাবে ট্র্যাজিক আখ্যা দেওয়া হয় এটি যেন তেমনই একটি চরিত্রের রূপ। এই কবিতাটি যেন জীবনের ট্র্যাজিক সম্ভাবনার একটি বিশেষিত রূপ। তার মুখের সামগ্রিক রূপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল ভিত্তিমূল বিপর্যস্ত ধরাশায়ী একটি গাছের মর্ম, এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার প্রলয়লীলায় জীবনের এক সর্বনাশের পরিচয় (মুখে তার আছে না কি/ছিন্নমূল সেই গাছ)। তার ওষ্ঠের দুটি ধারায় প্রকাশিত হয়েছিল যেন এক সংগঠিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিচয় (ঠোঁট দুটিতে বইছে নাকি/রক্তির দু'টি নদী) তার চোখ দুটিতে প্রকাশিত হয়েছিল অবোধ্য অন্ধকার, যন্ত্রণাদগ্ধ (কালো শব্দটি থেকে এই বিবিধ অনুষঙ্গ বা ব্যঞ্জনা যেন এখানে বিচ্ছুরিত হয়েছে) প্রকাশ উদ্যত, গতিচঞ্চল কামনার এক মূর্তরূপ (দু চোখে তার এখনো কি আছে/সেই দুটি কালো ঘোড়া)। স্থান (কোথায়) ও কালের (এখন) দূরত্বই, পরিবর্তনের সম্ভাবনা (আছে নাকি) তার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপটিকে কবির মনে অনুজ্জ্বল করে তুলেছে, কিন্তু তার গোপন অনুভবগম্য মর্মে আজও প্রতিদিন রাত্রিবেলা কবির সত্তার প্রাণকেন্দ্রে অনুভূত হয় বেদনা (আজও আমার নিত্যনিশি/কলিজা চেপে রাখে)। তার গোপন মর্ম দুরতিক্রম্য। দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ মূলত ভীতি সঞ্চার করে, কিন্তু তার গোপন মর্ম জাগিয়ে রাখে এক তীব্র বেদনার বোধ: কলিজা চেপে রাখে। এটি যেন ভয়ঙ্করের মধ্যে বেদনার অস্তিত্বের অনুভব।

পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'কাঁইট আরু গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫) তাঁর কাব্যভাষাকে অসমিয়া জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে সংযুক্ত করে। অসমিয়া সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধ্যে থাকা মূল্যবান সম্পদগুলির ব্যবহার ও ভাবের আভাস্তরীণ সঙ্গীতে তাঁর কবিতাগুলি ভরপুর। মিতবাক্, ইঙ্গিতধর্মী (suggestive) চিত্রকল্পে ফুকনের কবিতাগুলি সমৃদ্ধ।

১৯৮১ সালে অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে লেখা ৪০টি কবিতার সংকলন। জীবন ও জগতকে গভীরভাবে ও আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করার নিরলস, নিরন্তর প্রচেষ্টা ও জিজ্ঞাসা ফুকনের কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিতার ও ধরা-বাঁধা অর্থ কিম্বা ভাবের পরিবর্তে সম্প্রসারিত অর্থ ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রতি তিনি বিশেষভাবে যত্নবান। তাঁর কবিতা একার্থবাচক নয়, কোনও একটা কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার অর্থ ও বাণী সম্পূর্ণ হয়ে যায় না। তাঁর কবিতা পাঠক বা audience কে উত্তেজিত করে না, অভিভূত, ভাবময় করে। জগৎ ও জীবনকে নূতন ভাবে দেখার, নতুন ভাবে উপলব্ধি ও অনুভব করার একটি দুর্লভ সুযোগ তাঁর কবিতায় উপস্থিত। দেশ-বিদেশের কবিতার একজন অনুরাগী, কবিতার অনুবাদক, ফুকনের মুখে প্রায়ই হোরেসের একটি কথা শোনা যায়। যে কবি শিল্প সম্বন্ধে বিবেকবান তিনি সর্বদাই আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ফুকন নিঃসন্দেহে একজন বিবেকবান কবি। শান্ত কণ্ঠস্বরের অন্তরালে দুঃসহ বেদনা ও প্রতিবাদ ধারণ করার দুর্লভ গুণ তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। 'কবিতা' কাব্যগ্রন্থের ৪২ সংখ্যক কবিতাটির কথা ধরা যাক্—

কেমন আছি আমাকে প্রশ্ন কোরো না / আমিও নিজেকে
প্রশ্ন করিনি

নদীতে ভেসে আসা মুন্ডহীন নারী ছিন্নমস্তা এই সময়ের প্রতীক হয়ে ওঠে, হিংস্রতার কথা বলে। অন্ধকারময় দিনগুলিতেও ইতিহাস চেতনার' আলোয় কবি মানুষের সংগ্রামী চেতনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধারযোগ্য। ৩৯ নং কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

এও এক চরম অভিজ্ঞতার ক্রুর উদ্ভাসন / জীবনের
সাথে জীবনের অপ্রত্যাশিত / ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত সাক্ষাৎ

এই রক্তাক্ত সাক্ষাতের পরিচয় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নৃতারতা পৃথিবী' (১৯৮৫) তে আরও স্পষ্ট। নেলির হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় তার প্রতিবাদী ও মানবিক কণ্ঠস্বরটি এখানে চেনা যায়।

ছয়ের দশকে আরও দু'জন প্রতিভাবান কবি হীরেন ভট্টাচার্য (১৯৩২) ও নির্মলপ্রভা বরদলৈ (১৯৩৩) সক্রিয় ছিলেন। 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা (১৯৭১), বিভিন্ন দিনর কবিতা (১৯৭৪), কবিতার রোদ (১৯৭৬) ও কাব্য সংকলন 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১) প্রকাশ করে হীরেন ভট্টাচার্য সমসাময়িক কাব্যজগতে নিজেকে অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নিজস্ব লিখনশৈলী তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা



দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। উর্দু শায়েরির মতো শক্তকবিতাবলীর গূঢ় সৌন্দর্যে তিনি তাঁর পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত নির্মলপ্রভা বরদলৈ পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতা থেকে ভিন্ন এক নব্যরোমান্টিকতার জগৎ নির্মাণ করেছেন। শব্দ জ্যামিতি, অভিনব ও সংহত চিত্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক কবিতার প্রকাশ তাঁর বৈশিষ্ট্য। অসমিয়া লোকগাথা, লোককাহিনী, অসমের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সমকালীন সমাজচেতনা মিলেমিশে তৈরি হয়েছে তাঁর কাব্যভাষা। একাকিত্বের ভয়াবহতা, ক্লান্তি, আধুনিক মানুষের শিকড়হীনতা কখনও কখনও তাঁর কবিতায় প্রোথিত হলেও অনুসন্ধিৎসু এক বলিষ্ঠ জীবন প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ: ফড়িং-র রঙ (১৯৬৭), দিনর পাদত দিন (১৯৭৭), অন্তরঙ্গ (১৯৭৮), সুদীর্ঘ দিন আরু ঋতু (১৯৮২) শব্দর ইপাষ শব্দর সিপারে (১৯৯২), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৫)।

এই সময়ের কবি হরেকৃষ্ণ ডেকা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভবেন বরুয়ার কবিতা বিস্তৃত আলোচনা দাবি করে।

সাত ও আটের দশকের নবীন কবির দল অসমিয়া কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালন ঘটালেন। রবীন্দ্র সরকার, অনন্ত তাঁতি, সমীর তাঁতি, নীলিম কুমার, অনুভব তুলসী, রফিকুল হুসেইন, কৌস্তভমণি শইকীয়া, আনিস উজ্জামান, অনুপমা বসুমাতারি প্রমুখ এই সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের রচনা বিদ্যুৎচমকের মতো আমাদের স্পর্শ করে।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র সরকারের 'শান্তি কল্যাণ কবিতা' স্পষ্টভাবে সামাবাদী প্রগতিশীল চিন্তার শরিক। তাঁর কাছে 'ক্ষুধার্তের জন্য ভাতই ঈশ্বর'—

কালো অক্ষরগুলি শাদা ভাতের কথা বলে / ভাতের
গায়ে লেগে থাকে কালিন্দি আঁধার।
সমীর তাঁতিকে নিবেদিত কবিতায় তাঁর অনুভব—

তুমি আমি না থাকলেও / জীবন অনন্ত, বিশাল।

সাতের দশকের উজ্জ্বল কবি অনন্ত তাঁতি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'উজ্জ্বল নক্ষত্রর সন্ধানত' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'শোষণমুক্ত সমাজপ্রত্যাশী মানুষের হাতে'। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। অনন্ত সম্পর্কে হোমেন বরগোহাঞির মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য—'অসমিয়া ভাষার প্রান্তরে এই নতুন 'শব্দের কৃষক' আমার মতে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিময় কৃষক। ইতিমধ্যেই তিনি অনেক পুরনো শব্দকে নতুন স্বাদ-গন্ধ-বর্ণে মণ্ডিত করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র সম্ভাবনাময় অনেক বর্ণসংকর শব্দমালা। কি সাহসী, সুন্দর ও দুর্বিনীত সেই শব্দমালা!

কি যে দুর্বার একটা ইচ্ছার তাড়নায় আমি প্রতিনিয়ত
সংগ্রাম করছি
আমার নিজের সঙ্গে আমার পৃথিবী আর শব্দের সঙ্গে
যে শব্দগুলি আমার মায়ের অন্ধকার গর্ভ থেকে
দ্বিধা আর সংকোচের হাত মেলে একদিন তুলে এনেছিলাম
তুলে এনে আমি শব্দগুলি পরম নির্ভরতায় স্থাপন
করেছিলাম আমার হৃদয়ে

এই স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস শব্দমালাকে ত্যাগ করে কবি সৃষ্টি করেছেন নতুন শব্দ। কেন?

তুমি শব্দের ভিতরে স্বপ্নের নিরর্থক শব্দ নিয়ে খেলা
করো না
এই তো আমার কণ্ঠে তোমার স্থিতির জন্য উন্মোচিত
করা হৃদয়

আমি উষ্ণ শব্দের উপরে আমার প্রতিটি শব্দকে আরও
একবার দেখে নিই
দেখে নিই উষ্মাগিত অধিকারের দাবিতে

অনুভব তুলসী কাব্যজগতে প্রবেশ করেন তাঁর পরীক্ষামূলক প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নাজমা' (১৯৮৫)-র ১০০ টি অভিনব ও আকর্ষণীয় কবিতাবলী নিয়ে। বিখ্যাত সমালোচক হীরেন গোঁহাই তাঁর মুখবন্ধে অনুভবের কবিতার মূল্যায়ন করেছেন। জাপানি কবিতার তৃষিত বেদনা, গহীন সৌন্দর্য, উর্দু কবিতার ভাবুক অভিব্যক্তি স্বল্পায়তন এই কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে। কবিতাগুলির প্রতীক সরল, চিত্রকল্প নিখুঁত। নাজমার গঠনে আছে ত্রিমাত্রিক প্রথম স্তবকের সঙ্গে সংযুক্ত চতুর্থমাত্রা—অন্তিম পংক্তি—দ্বিতীয় স্তবক। প্রত্যেকটি কবিতায় ৩৬ টি অক্ষরের অনুশাসন মেনে চলা হয়েছে। একটি উদাহরণ—

হাত বাড়িয়ে দাও নদী
আমার ওষ্ঠে উঁচুক ঢেউ
গোলাপের গন্ধেতে ভরা
সূর্য না ডোবা সাগর।

অনুপমা বসুমাতারির কাব্যগ্রন্থ 'রূপালি রাতির ঘাট' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ খনন করেই তিনি কবিতা লেখেন। উগ্র নারীবাদী ভঙ্গি তাঁর কবিতায় দেখা যায় না। নম্র আত্মমুখী তাঁর কবিতায় 'হৃদয়ে জ্যোৎস্না মেখে দিতে পারা স্নিগ্ধতা' খুঁজে পাওয়া যায়—

করুণতায় দগ্ধ আমার হৃদয়খানি তোমাকে দিয়ে
আমি এবার হারিয়ে যাব অচেনা এই বন্দরে
যেখানে তুমি হাঁক এবার খুঁজবে আমায়
(আত্মকথা)

# নাসিম, মাম্মো এবং V For

## শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও অনেক দিল্লিবাসীর মতো আমিও "সহমত"-এর নাম ও তার প্রশংসনীয় কাজকর্মের কথা শুনেছিলাম। আর সেই কারণেই পরলোকগত সফদর হাসমী ও তাঁর সহযোগী শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আদর্শবাদের আমি প্রশংসক যাঁরা বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি ও অনুরূপ প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রচার করছেন। ১৯৮৯ খ্রীঃয়ে বর্ষারম্ভের দিনে ওই তরুণ প্রতিভাশালী শিল্পীর নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনা তাই তাঁর সহকর্মী বন্ধু গুণগ্রাহীদের মতো আমার মনেও স্বভাবতই ক্ষোভ ও দুঃসহের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে এবছর এপ্রিলের (১২ই বা ১৩ই) পূর্বে "সহমত"-এর কোনও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার ঘটেনি। তাঁদের মহাত্মা গান্ধীর ১২৫ তম জন্মবৎসর পালনের উপলক্ষ্যে মবালঙ্কার হলের প্রেক্ষাগৃহে যে সব অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তার মধ্যে দুটি চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

যে দুটি চলচ্চিত্র দেখেছিলাম তার প্রথমটি হল সৈয়দ আখতার মীর্জা পরিচালিত "নাসিম।" এতে বোম্বাই-এর এক কিশোরীর চোখ দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙার বর্বর কৃতোর কিছু দিন পূর্বেকার তার জীবনের নানা ঘটনা ও তার ঘাত-প্রতিঘাত দেখান হয়েছে। কাহিনীটির পাত্র-পাত্রীরা তিনটি প্রজন্মের এবং তাই ফ্লাশব্যাকের সহায়তায় তাদের জীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের পরিচয়ও দর্শকরা পান। বৃদ্ধ ও চলাফেরায় অক্ষম পিতামহ একটি মূল চরিত্র, যিনি প্রায়ই আগ্রায় তাঁর যৌবনের স্মৃতিচারণ করেন। সেখানে তিনি ভারতের মিলিত সংস্কৃতির পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর চেষ্টা সেই মূল্যবোধ তাঁর পরিবারে এবং বিশেষ করে তাঁর আদরের নাতনির মধ্যে সঞ্চারিত করা। তাঁর পুত্র, তাঁর পুত্রবধূ এযুগের কঠোর জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য এক রকম দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা চান না যে তাঁদের বৃদ্ধ পিতা দুঃখ পান। কিন্তু তাঁদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েই তাঁদের পুত্র অর্থাৎ নাসিম-এর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম মৌলবাদীদের শিবিরভুক্ত হয়ে পড়ছে। সংক্ষেপে ১৯৯২ খ্রীঃএর শেষার্ধের ভারতের পটভূমিকায় বোম্বাই-এর একটি মুসলমান পরিবার, তাঁদের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের টানাপোড়েনের ওপর কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। সেই ঐতিহাসিক দিনগুলিতে বৃহত্তর ভারতীয় মানসের দুঃখ ও মনোবেদনাও স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে ছবিটিতে উদ্ভাসিত। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মিলিত সংস্কৃতির প্রতীক ওই বৃদ্ধ বাবরি মসজিদ ভাঙার দিনই এই ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন। পিছনে পড়ে রইল তাঁর শোকার্ত বেদনাকাতর পরিবার এবং বিশেষ করে আদরের নাতনি নাসিম যার জীবন ও জগতের নানা প্রশ্নের মধুর শিক্ষাপ্রদ জবাব দেবার মানুষ আর নেই।

পরিচালক সৈয়দ আখতার মীর্জা বয়সে নবীন, কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। আলবার্ট পিন্টো কা গুস্‌সা কিঁউ আতা হ্যায়, সলিম লংগড়ে পে মৎ রো প্রমুখ একাধারে আদর্শবাদী ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। দূরদর্শনেও একদা তাঁর ধারাবাহিক নুক্কড় ও নয়া নুক্কড় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাসিম দেখে আরও অনেক দর্শকের মতো আমিও তাঁর এই একাধারে বলিষ্ঠ বক্তব্যযুক্ত অথচ মধুর কাব্যময় চলচ্চিত্রের মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করেছি। পরবর্তীকালে জেনে আনন্দ হল যে মীর্জা এই চলচ্চিত্রটির জন্য এবছরে শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে রাষ্ট্রপতির দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে উপযুক্ত পাত্রে সম্মান বর্ষিত হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হল এর কাব্যসুষমামণ্ডিত উপস্থাপনা, যথার্থ শক্তিশালী আদর্শবাদী বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী ও শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত করা পরিচালকের বিশ্বাসের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার কৌশল ও কুশলতা সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানেরও পরিচায়ক। চলচ্চিত্রটির পদে পদে তাঁর কবি-দৃষ্টি ও মানবীয় সংবেদনশীলতার পরিচয় পেয়ে মন মুগ্ধ হয়। বাবরি মসজিদের ধ্বংস (কুত্রাপি যার প্রত্যক্ষ দৃশ্যায়ন নেই) ও নাসিমের পিতামহের মৃত্যু পৌত্রীর মতোই দর্শকদের অন্তরেও কান্না ঝরায়। আর এইখানেই শিল্পী মীর্জার চূড়ান্ত সাফল্য।

চলচ্চিত্রের প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। তবু যদি পৃথকভাবে কয়েকটি নাম করতেই হয় তবে সর্বাগ্রে পিতামহের ভূমিকায় প্রবীণ উর্দু কবি কায়ফি আজমির নাম করতে হয়। তিনি অভিনয় করেননি, চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন। চলাফেরা বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গির অবকাশ নেই। কেবল মৃদু স্বরে কথা (অধিকাংশই নাসিমের সঙ্গে), কবিতা আবৃত্তি আর হাসির মাধ্যমে চরিত্রটিকে তিনি পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রবীণ অভিনেত্রী সুরেখা সিক্রি তাঁর পুত্রবধূ ও নাসিমের জননী। বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে জর্জর সংসারের কর্ত্রী এক দিকে শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ শ্বশুরের মূল্যবোধকে আঘাত দিতে অনিচ্ছুক, অন্য দিকে বিদ্রোহী পুত্রকেও রক্ষা করতে চান—কুশলী অভিনয়ে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব পদে পদে ফুটে উঠেছে। মধুরী কাঙ্গোর অভিনয়ে ষোড়শী-সপ্তদশীর ভোরের শিশিরবিন্দুর মতো নাসিম চরিত্রটিই ফুটে ওঠেনি, এই অল্প বয়সেই তিনি যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে তা আরও প্রস্ফুটিত হবে।

'নাসিম' কেবল বারবার দেখে উপভোগ করার একটি পরিচ্ছন্ন ও কাব্যগুণান্বিত শিল্পকৃতি নয়, এর অন্তর্লীন বক্তব্যও নিজ মাতৃভূমি ও তার অধিবাসীদের প্রতি আকর্ষণসম্পন্ন প্রতিটি সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতবাসীর মনে দীর্ঘকাল অনুরণন জাগাবে।

॥ ২ ॥

খ্যাতনামা পরিচালক শ্যাম বেনেগলের "মাম্‌মো" নিজ বক্তব্য উপস্থাপনায় অপেক্ষাকৃত সোচ্চার; কিন্তু সমানভাবে শিল্পোন্নত ও মানবীয় সংবেদনশীলতায় ওতপ্রোত। এর কাহিনী এক মুসলমান পরিবারের তিনটি বিবাহিতা বোনকে নিয়ে, ১৯৪৭ যে ভারত বিভাজনের ফলে যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে পড়েন। বিবাহসূত্রে এক বোন মাম্‌মোকে যে অঞ্চলে যেতে হয় পরে তা পাকিস্তান নামক এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান মাম্‌মোর জীবনে দুর্দিনের ঘনঘটা নেমে আসে—স্বামীর আত্মীয়-পরিজন, তাঁর সম্পত্তি গ্রাসে উদ্যোগী হয়। তিনি ভারতে চলে আসতে চান অন্য বোনদের সঙ্গে থাকার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য! জাতীয় সীমান্ত সম্বন্ধে সজাগ ভিসার নিয়ম-কানুন তাঁকে এ পৃথিবীতে তাঁর এক মাত্র শুভার্থী দিদির সঙ্গে থাকতে দেবে না। একবার অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ভারত থেকে বিতাড়িত হন। রবীন্দ্রনাথের এক ছোটগল্পের নায়িকার বিপরীত মাম্‌মোকে মিথ্যা মৃত্যুর প্রমাণপত্র জোগাড় করে নামহীন হয়ে বোন ও তার নাতির সংসারে থাকার জন্য গোপনে ভারতে চলে আসতে হয়।

কাহিনীর পদে পদে মানবীয় আবেগে পরিপূর্ণ এই চলচ্চিত্র সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে এক মর্মস্পর্শী "সাগা"। বেনেগলের মৌলিকতা হল এই বিয়োগান্তক ঘটনাকে টেলিস্কোপের উল্টো দিক অর্থাৎ মুসলমান এবং যে মুসলমানরা পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের দিক থেকে দেখানো। এদেশও দেশবিভাগের দুঃখ-বেদনা নিয়ে অনেক সাহিত্য ও শিল্পকৃতি রচিত হয়েছে। কিন্তু মূলত ওদিক থেকে আসা হিন্দুদের দুঃখ-বেদনাকে নিয়ে। মুদ্রার অপর পিঠ সম্বন্ধে শ্যাম বেনেগল আমাদের বিশেষভাবে সচেতন করলেন বলে তাঁকে অকৃত্রিম সাধুবাদ জানাই। যেহেতু এই দুঃখ-বেদনাও সত্য এবং বেনেগল অত্যন্ত বিশ্বসনীয়ভাবে দর্শকদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন বলে বিশেষ প্রশংসারও পাত্র। ফরিদা জালাল ও সুরেখা সিক্রির মতো দুই খ্যাতনাম্নী কুশলী অভিনেত্রী মাম্‌মো ও তাঁর ভারতীয় ভগ্নীর অভিনয়ে দর্শকদের অভিভূত করার সঙ্গে সঙ্গে বেনেগলের প্রয়াসকেও সার্থক করেছেন। অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও যথাযথ অভিনয় করেছেন—বিশেষ করে মাম্‌মোর সম্পদগর্বী ভগ্নীর চরিত্রের অভিনেত্রী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দৌহিত্রের চরিত্রে এক কিশোর। বেনেগল আরও প্রশংসাভাজন এই জন্য যে পাকিস্তানের কাহিনীকার খলিদ মহম্মদের কাহিনীর চিত্ররূপ ভারতীয় দর্শকদের উপহার দিয়ে সীমান্তের ওপারে দেশবিভাজনের ব্যথা-বেদনা সম্বন্ধে আমাদের জানার সুযোগ দিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দৌলতে V for Victory আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু V for .....এরV যে violenceবা হিংসার বদলে—এটা মল্লিকা সারাভাই-এর ওই নামের অনুষ্ঠান দেখলে যেকোনও দর্শকের উপলব্ধি করতে সময় লাগবে না। দু'ঘন্টার উপর বিখ্যাত শিল্পী মল্লিকার প্রযোজিত ও অভিনীত অনুষ্ঠানটি একক দর্শকের মন্ত্রমুগ্ধ করেই রাখে না, তাঁর বক্তব্য হিংসার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্মত ভাবে ও ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তাও দর্শকদের মনে স্থায়ী দাগ কেটে বসে যায়। তাঁর বক্তব্য হিংসার বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে বহুকথিত 'মা হিংসী' জাতীয় নয়। মহাত্মা গান্ধী বর্তমান-শতাব্দীর গোড়ার দিকে সবরমতীতে আশ্রম স্থাপনা করার পর বস্তুকলের মালিক আম্বালাল সারাভাই-এর যে পরিবার তাঁর বহু কার্যের সহায়ক ছিলেন, সেই বংশের সুযোগ্য নন্দিনী মল্লিকা তাবৎ হিংসার অভিপ্রকাশ যা থেকে থেকেই মানব সমাজকে পীড়িত করে, তার সম্বন্ধে যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর মতো গবেষণা করে তার স্বরূপ ও সমাধানের উপায় দর্শকদের কাছে শিল্পোন্নতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। দোলনা থেকে শ্মশান ঘাটে যাবার মধ্যে মানব-সমাজে যত বিচিত্র প্রকারের হিংসার বিস্ফোরণ ঘটে, তার বিবরণ রচনা ও কারণ আবিষ্কার করার পিছনে মল্লিকার প্রয়াস প্রথম শ্রেণীর গবেষকের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করবে।

পিতৃপিতামহসূত্রে প্রাপ্ত হিংসাবিরোধী এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাতৃসূত্রে (মৃণালিনী সারাভাই) প্রাপ্ত শিল্পকৃতি। এবং performing art-এর প্রায় সব কয়টি শাখারই যথা,

নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয় — বাচনিক ও মূক — সাহায্য নেবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যকে দ্বিমাত্রিক আঙ্গিকে পরিবেশন করে তার আবেদনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তিনি কোথাও কোথাও চলচ্চিত্র মাধ্যমেরও সহায়তা নিয়েছেন। আর প্রতিটি মাধ্যমের উপর তাঁর সমান দক্ষতা থাকার জন্য কোনও মাধ্যমের ব্যবহারই প্রক্ষিপ্ত মনে হয়নি। এই অসাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমতী মল্লিক সারাভাই মানব-সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের হিংসাকেই কেবল তুলে ধরেননি, এর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমণ্ডলীর ভিতর মানুষের মধ্যে পশুশক্তির অবশিষ্ট নিদর্শনের বিরুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে একে প্রতিরোধের ইচ্ছাশক্তিও জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর সাফল্যের চমৎকারিত্ব এইখানে। যথার্থ গান্ধীপন্থী পদ্ধতিতে তিনি মানব-চৈতন্যের এমন উচ্চস্তরে উন্নয়নে সমর্থ হন যে তাঁর দর্শকদের মধ্যে তিনি হিংসা যেখানে যেরূপেই পরিদৃষ্ট হক না কেন, তাকে চালেঞ্জ জানাবার মানসিকতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। আর তাঁর প্রয়াসের রেশ দীর্ঘকালব্যাপী থেকে যাবে।

এ ক্ষেত্রে মল্লিকা সারাভাই নতুন নন। তিনি এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী এবং পূর্ব ও পশ্চিম — উভয় গোলার্ধেই বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। পিটার ব্রুকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজনা মহাভারত-এর দ্রৌপদী হিসাবে বিভিন্ন দেশে তিনি বহু সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর "শক্তি" (নারী শক্তি) "সীতার কন্যা (ভারতীয় নারীদের যথার্থ স্বরূপের উপস্থাপনা) ও "কাহিনী" (গল্পের গল্প) আরও তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য পারফরমিং আর্টের নিদর্শন, যা বহু সাধারণ দর্শক সহ বিশেষজ্ঞের খ্যাতি অর্জন করেছে। জন মার্টিনের পরিচালনায় V for... নিঃসন্দেহে তাঁর সম্মানের তালিকায় অপর একটি সংযোজন, হয়ত বা সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল সংযোজন। □

# থিয়েট্রনের 'অসঙ্গত' নাটকটি দেখার পর

আবদুর রউফ

নাটক নিয়ে কোনও আলোচনা লেখার ব্যাপারে আমার দ্বিধা আছে। দ্বিধার কারণটা হয়তো এই আলোচনাটি পড়লে পাঠকদের অনুমান করতে অসুবিধা হবে না। আসলে থিয়েট্রনের 'অসঙ্গত' নাটকটি আমায় ভাবিয়েছে। সেই ভাবনাটা আমি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। নাটকটি দেখার পর থেকে আমার আলোড়িত চিত্তে বারবারই একটা আত্মজিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছে। নিজের কাছেই নিজে জানতে চাইছি আমার এতখানি বিচলিত বোধ করার কারণ কী?

এমন নয় যে 'অসঙ্গত' নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলির কারো সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের খুব মিল আছে। যে-দম্পতির জীবনচর্যার সঙ্গে আপাত মিল কিছুটা আছে বলে মনে হয় তাঁরা হলেন সোমেন দত্ত এবং তাঁর পত্নী মীনাক্ষী দত্ত। এই দম্পতির একমাত্র সন্তানের নাম রেশমী। এই তিনজনকে নিয়ে একটি ছোট্ট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী রোজগার করেন। একমাত্র মেয়ের জন্য তাঁদের ভালবাসার অন্ত নেই। কিন্তু মেয়ের দেখাশোনা করে মাইনে করা কাজের মেয়ে। এইভাবেই মেয়ে বড় হয়েছে। মেয়ের বয়স এখন ষোল। এই ষোল বছরের কিশোরী কন্যা একদিন রাত্রে বিদ্যুৎসংযোগ ঘটিয়ে ঘুমন্ত মা-বাবা দুজনকেই মেরে ফেলার চেষ্টা করে। ঘটনার আকস্মিকতায় মা-বাবা দুজনেই বিমূঢ়।

মেয়েকে অর্থাৎ রেশমীকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে মানসিক চিকিৎসার জন্য। সেখানের চিকিৎসক মনস্তত্ত্ববিদ ডা: চঞ্চল সরকার নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। মানসিক দিক থেকে তিনিও বিপর্যস্ত এবং অবসাদগ্রস্ত। কেন তাঁর এমন অবস্থা সেকথা নাটকের মধ্যেই ক্রমশ স্পষ্ট করা হয়েছে। রেশমীর চিকিৎসাসূত্রেই উদ্ঘাটিত হয়েছে ইদানীংকালের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের দুষ্টক্ষতটি। আপাতদৃষ্টে সুখী, সচ্ছল ছোট ছোট মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির গতানুগতিক জীবনে কী প্রক্রিয়ায় বেদনার মেঘ জমে উঠছে এবং সেই মেঘ যে কখনও কখনও কতখানি বজ্রগর্ভ হয়ে উঠতে পারে — সেসবের বাস্তবগ্রাহ্য উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ এই 'অসঙ্গত' নাটক।

নাটকার সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সমসাময়িক এবং পরিপার্শ্বিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। গতানুগতিক, আপাত নিস্তরঙ্গ নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে বাইরের জগৎ থেকে দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা এই ধরনের কোনও উদ্দীপকের সাহায্যে নয়, চরিত্রগুলির অন্তর্গতেই তিনি নাটকীয়তার উপাদানগুলি চিহ্নিত করেছেন আশ্চর্য দক্ষতায়। রেশমীর মতো সন্তানেরা কেন মা-বাবার আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও, তাঁদের অপার স্নেহের প্রশ্রয় সত্ত্বেও বিপন্নতায় ভোগে, ধীরে ধীরে সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। আজকালকার 'ছোট



পরিবার, সুখী পরিবার'-আদর্শে অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত দম্পতি, একটি বড়জোর দুটি সন্তান নিয়ে যে 'সুখের নীড়' গড়ে তোলে তা কোন্ প্রক্রিয়ায় 'নষ্ট নীড়ে' রূপান্তরিত হয় তারও মনোগ্রাহী উদ্ঘাটন রয়েছে এই নাটকে।

আসলে গৃহ যে কেবলমাত্র চার দেওয়ালের মজবুত গঠন নয়, সেটা বহিরঙ্গ মাত্র, গৃহের প্রাণবস্তু হল সেটার মধ্যে যারা বাস করে তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সম্পর্ক — একথাটা নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এই নাটকে। যে গৃহে এই প্রাণ বস্তুটুকুর অসদ্ভাব সেখানে বিশেষ করে সন্তানদের মধ্যে গৃহহারার বিপন্ন ভাব জেগে উঠতে বাধ্য। কারণ মা-বাবার পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসাও সম্পর্কেরও মধ্যেই নিহিত থাকে তাদের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। যেখানেই এমনতর সম্পর্কের অসদ্ভাব সেই পরিবারের সন্তানেরা নিরাশ্রয় চেতনায় বিপন্ন হয়ে উঠতে বাধ্য। পৃথক পৃথক ভাবে কেবলমাত্র সন্তানের জন্য মা-বাবার স্নেহ যথেষ্ট নয়। 'অসঙ্গত' নাটকের সোমেন দত্ত-মীনাক্ষী দত্তের মেয়ে রেশমী এই কারণেই বিপন্ন। কোনও যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালবাসার অতীত কাহিনী শুনে তাই সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

মা-বাবার প্রতি রেশমীর ভালবাসা কেমন করে চূড়ান্ত ঘৃণায় পর্যবসিত হয় তারও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ রয়েছে এই নাটকে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে কেমন করে টান টান নাটকীয় উত্তেজনায় নিয়ে গিয়ে তোলা যায় সেটা কেউ চাক্ষুষ না করলে তাকে বোঝান কঠিন। বাস্তবিক, 'অসঙ্গত' নাটকের নাট্যকার এবং পরিচালক সলিল বন্দোপাধ্যায়ের আসল কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে এই সূক্ষ্ম মানসিক প্রক্রিয়াগুলি মূর্ত করে তোলার মধ্যে। যে-মেয়ে মায়ের মুখে 'মাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই। মাগো আমার শোলকবলা কাজলা দিদি কই।' গানটি যতবার শুনত ততবারই কেঁদে ফেলত, সেই মেয়েই যে কেমন করে মা-বাবাকে হত্যায় উদ্যত হয়, নাটকে সেই সূক্ষ্ম অথচ তীব্র মানসিক প্রক্রিয়াটি মূর্ত হয়েছে আশ্চর্য দক্ষতায়। এতে নাট্যকার এবং পরিচালক সলিল বন্দোপাধ্যায়ের কৃতিত্বই নিঃসন্দেহে মুখ্য। কিন্তু অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় পুটটুকুর গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়।

এই অভিনয় পুটটুকুর ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় শাশ্বতী বিশ্বাসের কথা। নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র রেশমীর বাস্তবগ্রাহ্য উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। চরিত্রটির অনেকখানি ভেতরে ঢুকতে না পারলে এরকম অভিনয় সম্ভব নয়। একই কথা বলা যায় রেশমীর মা মীনাক্ষী দত্ত সম্পর্কে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মণিকা দে। বাকিদের অভিনয় সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে উল্লেখ না করেই বলা যায় প্রত্যেকেই প্রত্যাশিত স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আলাদা করে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় স্বয়ং নাট্যকার পরিচালক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডা: চঞ্চল সরকারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনিই। তাঁর অভিনয় দেখে মন ভরে গেছে — এমন কথা বলতে পারছি না। কিন্তু খামতিটি যে প্রকৃতপক্ষে কী, সেটা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পেশাগত জীবনে সফল একজন চিকিৎসকের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাঁটা চলা এবং বাচনভঙ্গির যে লে-আউট তিনি গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে কোনও ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সফল, বিত্তশালী ডাক্তাররাও সবাই একরকম হয় না। সলিলবাবু তাঁর নিজের শারীরিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও লে-আউট যদি নিতেন তাহলে সেটা হয়ত দর্শকের কাছে আরও বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হত। অবশ্য এ-ই আমার অনুমান। অনভিজ্ঞের ধৃষ্টতাও হতে পারে। তাই সলিলবাবুর মতো বিদগ্ধ এবং অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পরিচালকের কাছে সবিনয়ে পেশ করলাম।

অনভিজ্ঞতার কারণেই আবহসঙ্গীত এবং আলোকসম্পাত সম্পর্কে কিছু বলতে ভরসা হয় না। অবশ্য ত্রুটিও তেমন কিছু আমার নজরে পড়েনি। কেবল, যেখানে যেখানে নাটকের অন্যতম দুটি চরিত্র রেশমীর বন্ধু পার্থর ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার দৃশ্য আছে, যাঁদের কাছে গেলেই রেশমী দরদভরা মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা অনুভব করে, সেসব দৃশ্যে আলো অপেক্ষাকৃত ম্লান বা পড়ন্ত বেলার আলো হলে আরও বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, ঠাকুর্দা-ঠাকুরমারা তো মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন থেকে অবসিতপ্রায়। আলোকসম্পাতের মধ্যেও সেই তাৎপর্যটুকু ধরার প্রয়াস থাকলে কেমন হয়?

পরিশেষে বলতে হয়, 'অসঙ্গত' নাটকটির মধ্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে তথাকথিত 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' ঘনিয়ে ওঠা যে সংকটের অবয়বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার দর্পণে অনেকেই যে আপন আপন জীবনের কিছু না কিছু মিল খুঁজে পাবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ কেউ হয়ত নিজের নিজের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাবলে এই সংকট মোকাবেলায় অনেকখানি সক্ষম। কিন্তু সেই মোকাবেলা কেবলই রক্ষণাত্মক। এই সংকটকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। নাটকের মধ্যেই সংকটত্রাণের কিছুটা ইঙ্গিত আছে ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে সংকটাপন্নরা যে সেই ইঙ্গিতটুকু আশ্রয় করে কতখানি আত্মরক্ষা করতে পারবেন, সে-সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। আসলে এই মুহূর্তে এটা শুধু আমাদের নয়, একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, যার মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক পটভূমি। □

# আনন্দবাজারে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

## নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের দুই She, মানসী আর প্রবাসী, ঠাট্টা করেছিলেন আর এক পত্রিকার সম্পাদক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯২০ সালে। বেঁচে থাকলে দেখে যেতে পারতেন ১৯২২-এ প্রতিষ্ঠিত আর-এক পত্রিকাও রবীন্দ্রনাথের She হয়ে উঠবে: আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকা এই কবি দার্শনিক সমাজসেবীর লঘুগুরু নানান সংবাদ পরিবেশন করে গেছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। আনন্দবাজারে প্রকাশিত এই সব সংবাদ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংকলন যে কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠবে এ কথা বলাই বাহুল্য। একজন সাহিত্যিকের রচনায় সমসাময়িক ঘটনা কী ছায়াপাত করে কিংবা করে না, সেটা লক্ষ করা বা সাহিত্যরচনায় উৎস কী জানার চেষ্টায় এই সংবাদ-সংকলন সাহায্য করতেই পারে — বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে, যিনি ছিলেন বাঙালি জীবনে, ঠাট্টা করে বলা চলে, সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো, his finger in every pie। মনঃপূত হলে তাঁকে ঈশ্বরের সমাসনে বসানো হত, না হলে, ব্যঙ্গ করতেও পিছপা হতেন না রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকেরা।

শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখলেও আনন্দবাজার পত্রিকা যে সব সময়ে ধৈর্য বজায় রাখতে পারত এমন নয়। 'নন্দীভৃঙ্গী' নামের অন্তরালে পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মধ্যেমধ্যেই বিরূপ মন্তব্য করতেন, এমন কি সংবাদপত্রের পক্ষে দীর্ঘ ব্যঙ্গনাট্যও প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। ১৯২৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাগজে যেমন বেরিয়েছিল 'বিশ্ব-বরণ' নামে এক গীতিনাট্য, রবীন্দ্রভাষা ও ভঙ্গির প্যারডি, বিশ্বকবির বিশ্বের দল জোড়াসাঁকো নাট্য পরিবেশনা করেছিলেন, যেন তার বিবরণ। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদের ব্যাপক আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমবাণী সম্পাদকের মনঃপূত হয়নি। যেমন হয় নি, অনেক পর, ১৯৩৪ সালে, চার অধ্যায় উপন্যাসের প্রকাশ। ২০.৩.৩৫ এর কাগজে নন্দীভৃঙ্গী লিখলেন:

দোলপূর্ণিমার দিন কবি রবীন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস 'পঞ্চম অধ্যায়' প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গলার গবর্নর স্যার জন অ্যাণ্ডারসন সম্প্রতি বোলপুর শান্তিনিকেতনে গিয়া কবিবরের অনেক জটিল সমস্যার গ্রন্থিমোচন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পরিচয় এই উপন্যাসে থাকিবে। 'পঞ্চম অধ্যায়'-এর ভূমিকায় পাঠকগণ আর এক চমকপ্রদ বর্ণনা পাঠ করিবেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানায় অধোবদনে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, 'নমস্কার কবিতায় আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সব ভুল সব মিছে। রবিবাবু, আমার বড় অধঃপতন হয়েছে। আত্মধর্মনাশের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য পণ্ডিচেরী যাত্রার পূর্ব্বে এই কথাটা আপনাকে বলতে এসেছি।'

এ কথা সবারই জানা, প্রথম গ্রন্থাকারে 'চার অধ্যায়' প্রকাশকালে ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য-সংকলিত 'আভাস' পরবর্তী সংস্করণে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, বর্জিত হয়। মনে করা হয়, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় 'আভাস'-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হয়েছিলেন বলে এই বর্জন। নন্দীভৃঙ্গীর ব্যঙ্গোক্তি ওই সমালোচনার একটি উদাহরণ।

দীর্ঘ ১৯২২-১৯৪১ সালে নন্দীভৃঙ্গীর এই ধরণের রবীন্দ্রবিরোধী মন্তব্য অবশ্য অল্পই। ১৯২৪ সালে লর্ড লিটন বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করায় রবীন্দ্রনাথ লিটনকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু লিটন পত্রোত্তরে তেমন কোনও ক্ষমা চান নি। এই সূত্রে নন্দীভৃঙ্গী রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই মন্তব্য করেন, কেন আগ বাড়িয়ে লিটনকে আবার বলার সুযোগ দিলেন? আর একবার, ১৯৩৫ সালে কালীঘাটে পাঁঠাবলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায়, নন্দীভৃঙ্গী খবর দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেবার মাড়োয়ারী তন্ত্রমতে ১০৮টি কুষ্মাণ্ড বলিসহ অমূর্ত দুর্গোৎসব হবে।

সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' বা সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি এবং ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছিল। আনন্দবাজার যে সেরকম বিরূপতার সৃষ্টি করেনি, তার কারণ, বক্রোক্তি একটি দৈনিক সংবাদপত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নয়, তাছাড়া আনন্দবাজার সেই অর্থে রবীন্দ্রবিরূপ তো ছিলই না, বরং রবীন্দ্রবন্দনাই করে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মতামত সযত্নে পরিববেশন করে এসেছে। বরং, প্রবাসী সাময়িকপত্র হওয়ায় তার প্রচার তুলনায় কম বলে, অনেক সময় প্রবাসীতে ব্যক্ত রবীন্দ্রমতামত পুনরুক্ত করে ছপিয়েছে আনন্দবাজার। যেমন, আর্জেন্টিনা থেকে রবীন্দ্রনাথের পাঠানো কবিতাটি, ১৯২৫ সালে দেশে ধরপাকড়ের খবর পাওয়া লেখা (ঘরের খবর পাইনা কিছুই গুজব শুনি নাকি)। কবিতাটি ছাপার পর গোয়েন্দারা প্রবাসীর উপর নজরদারি করছে শুনে। আনন্দবাজার কবিতাটি পুনর্মুদ্রণ করে। অন্য পত্রিকায় রবীন্দ্রবিষয়ে সংবাদ বিকৃতভাবে প্রকাশিত হলে, আনন্দবাজার দায়িত্ব নিত অবিকৃত খবর বা মত ব্যক্ত করার। যেমন, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা ভবনে কল্লোল বনাম সজনীকান্ত সাহিত্যবিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত বাঙলার কথায় বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং



আনন্দবাজারকে বেছে নেন, তার সংশোধিত রূপ 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য, ১৯২৮ সালে।

স্বরাজ্য দলের মুখপত্র বাঙলার কথা বা ফরওয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে মতৈক্য হবে না আনন্দবাজারের বলাই বাহুল্য। সংবাদ পরিবেশনেও মতানৈক্য বিস্ময়কর নয়। ফলে, পরবর্তী কালের নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে কোনও কোনও সংবাদে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্ক আপাতচক্ষে সৌজন্যপূর্ণ ছিল, আশুতোষও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিরূপ ছিলেন এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, তবে রবীন্দ্রনাথ যে আশুতোষ সম্পর্কে খুব একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, তার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আশুতোষের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লোকদেখানো শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু সভায় গণ্ডগোল হওয়াতে কিছু না বলে চলে এসেছিলেন। গণ্ডগোল কেন হয়েছিল, কারা করেছিল? আনন্দবাজার আর ফরওয়ার্ডের প্রতিবেদন দুইরকম। আনন্দবাজারের মতে, সভায় ছাত্রদের এত ভিড় হয়েছিল এবং তাদের চেচামেচি এত বেশি হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান, বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দিতে গেলে ছেলেরা বক্রোক্তি করায় তিনিও সভা ছেড়ে যান, সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাও ছাত্ররা 'লজ্জা' 'লজ্জা' বলে থামিয়ে দেয়, চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কেউ কান দেয় না, তারপর দু'একটি বক্তৃতার পর সভা ভেঙে যায়। ফরওয়ার্ড কিন্তু লেখে, রবীন্দ্রনাথ সভায় 'কলকে পাননি', বেগতিক দেখে মানে মানে সরে পড়েছিলেন, বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার সময় 'ধিক' 'ধিক' ধ্বনি হচ্ছিল, কেবল চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ছাত্ররা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিল।

সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ বা সমকালের শিল্পের বিচার যে সব সময়ে ঠিকভাবে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সবাক চলচ্চিত্র 'নটীর পূজা' চিত্রা সিনেমায় দেখানো শুরু হলে তার সংবাদ দিয়ে আনন্দবাজার জানায় ২৬.৩.৩২ তারিখে:

"রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'নটীর পূজা' 'ঠাকুর ফিল্ম কোম্পানি সবাক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন।...সবাক চিত্রে এই সমস্তই যথাযথ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সবাক চিত্র এই অল্পকালের মধ্যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে, 'নটীর পূজা' দেখিলে তাহা বুঝা যায়। 'রূপচিত্র' সুন্দর হইয়াছে, বলিতে হইবে। শব্দচিত্রও চমৎকার হইয়াছে। উদ্বোধন দৃশ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার কবিতা আবৃত্তি সকলেরই মনোহরণ করিবে। আশা করি, রসলিপ্সুগণ বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণের আয়োজনে, বাঙ্গালী শিল্পীগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত এবং বাঙ্গালী চিত্রগৃহে প্রদর্শিত এই সবাক্ চিত্রখানি দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন।"

'নটীর পূজা'র ফিল্ম, আমরা অন্য সূত্রে জানি, আদৌ ভাল হয় নি, আনন্দবাজারের প্রতিবেদনের কাছে লাগলেও। আমরা জানি, এর প্রস্তুতকর্তা বীরেন সরকারের নিউ থিয়েটার্স। সেই ছবি সম্পর্কে লীলা মজুমদার বলছেন 'আর কোনোখানে' স্মৃতিগ্রন্থে:

"সে আরেক কাণ্ড। নিউ থিয়েটার্স তখন খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বাংলা সবাক চিত্রও তার নতুনত্ব হারায় নি, এমনি সময় 'নটির পূজা' তোলা হল। তাও আবার স্টেজ প্রোডাকশনের ছবি, না আছে তাতে সিনারি, না আছে যথেষ্ট জনগণোপযোগী রস-রসিকতা। শেষ পর্যন্ত যখন ছবি রিলিজ হল, জনতা রেগেমেগে চেয়ার ভেঙ্গে, আলো ফাটিয়ে টিকিটের দাম ফেরত চাইতে লাগত।"

টকি ফিল্মের বাংলা নাম কী হতে পারে? ১৭.৭.৩২-এর আনন্দবাজার জানাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা করেছেন রূপবাণী। বাংলায় শব্দটি চালু হয়নি, যেমন চালু হয়নি কো-এডুকেশনের বাংলা, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, দ্বয়ী-শিক্ষা (২০.১১.৩২)। সহশিক্ষা শব্দটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি, কিন্তু সেটাই চালু হয়ে গেছে। সিনেমার বাংলা রূপবাণী চালু হয়নি, তবে সেই সময়েই বীরেন সরকারের নির্মিত নতুন হলের নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপবাণীই থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, বাঙালি জীবনে তাবৎ সমস্যায় তাঁর সুপারিশ মানা হত। সুপারিশ না করলেও, স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কলহে নেমে পড়তেন। এটা তাঁর পক্ষে মধ্যেমধ্যেই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠত। যেমন হয়েছিল, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে, যখন বাংলা কংগ্রেসের অন্তঃকলহে বিরক্ত হয়ে, রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে এপি'র মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন, বাংলার সুনামকে ধূলিসাৎ করবার নিবুদ্ধিতা অসহনীয় বেদনার সৃষ্টি করছে (৬.৯.৩৮)। বিবদমান পক্ষদ্বয়কে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আর সংবাদপত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত আক্রোশের বৃদ্ধি না ঘটাতে। উপলক্ষ্য ছিল সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে অমৃতবাজার আর আনন্দবাজারের পাস্পরিক আক্রমণ। আনন্দবাজার ছিল শরৎচন্দ্র-সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। ৭.৯.৩৮ আনন্দবাজার সম্পাদকীয়তে লিখল:

"কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের উদ্দেশে এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিবশত তিনি বাহিরের আলাপ-আলোচনার সংস্রব হইতে বিশ্রাম চাহেন, সাধারণের মধ্য হইতে কেহ যেন এই বিশ্রামে বিঘ্ন উৎপাদন না করে। সহসা বাংলাদেশে এমন কি ঘটিয়াছে যে কবিকে তাঁহার এই স্বেচ্ছাগৃহীত বিশ্রাম ও নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সংবাদপত্রে বাণী প্রেরণ করিতে হইল? ...অমৃতবাজার পত্রিকার যে সকল

জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু জনসভায় উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার বারবার ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য অনুনয় বিনয় জানাইয়াছিলেন বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে তাহাই সমর্থন করিয়াছেন, এরূপ কথা আমরা ভাবিতে পারিতেছি না।"

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মিশ্র মনোভাব সুবিদিত। 'শনিবারের চিঠি'তে 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি' নামক রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের নৈষ্কর্ম্য ও দুষ্কর্মবাদের নিন্দা করেছিলেন, বলেছিলেন, আদুরে ছেলের মত আমরা আদরে ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। পাঠকের ধারণা হয়েছিল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সুভাষচন্দ্র। আনন্দবাজার আপত্তি জানাল সম্পাদকীয়তে। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও জল ঘোলা হচ্ছিল। ৪ঠা জুলাই ১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ জানালেন, ব্যক্তিবিশেষ তাঁর আক্রমণের পাত্র নন। ৪ঠা জুলাই আনন্দবাজার আবার জানাল "দীর্ঘ দুই মাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন। আরও কিছুদিন পূর্ব্বে জানাইলেই ভাল করিতেন। যাঁহাকে ঘিরিয়া একদা এই কদর্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ তিনি সরকারের বিধানে কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে।" লক্ষ করবার বিষয়, ২রা জুলাই কলকাতায় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন আর সেই দিনই হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে গ্রেপ্তার হন। সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শনিবারের চিঠির রচনা নিয়ে অনুযোগ করে থাকবেন, যেজন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ইউপি'র মাধ্যমে ৩ জুলাই তাঁর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন।

সব রাজনৈতিক প্রশ্নে, আনন্দবাজারের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অবস্থানের সমর্থক হওয়া সম্ভব ছিল না। যেমন, চরকা প্রসঙ্গে গান্ধী বনাম রবীন্দ্রনাথ বিতর্কে। এই দ্বন্দ্বে আনন্দবাজার দ্বিধাহীনভাবে গান্ধীর পক্ষে ছিল এবং দীর্ঘ দিন ধরে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেছিল (১৯২৫ এর আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত)। পরেও, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৯২৮ সালে, রবীন্দ্রনাথের চরকাবিরোধী অবস্থানের প্রতিবাদে প্রবাসীতে চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি কাটছাঁট অবস্থায় ছাপা হলে, আনন্দবাজার আবার সেটা ছাপে। স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরামহীন প্রচারের বিরুদ্ধেও আনন্দবাজার সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিল ৫.৬.১৯২৩ তারিখে। অনেক সময় রবীন্দ্রনির্দেশিত সমাধান বাস্তব মনে হয় না, বায়ুভুক ঠেকে—যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে ভেদ বুদ্ধি বর্জনে। ১৪.১০.২৩ আনন্দবাজার জানাল, খুব সুষ্ঠু সমাধান, তবে তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। যদি কখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব উত্তেজিত করার জন্য সংবাদপত্রগুলোকে রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার করতেন (২৫.১২.৩৭), আনন্দবাজার জবাব দিত, রবীন্দ্রনাথ কি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, যে সব জননেতা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি উত্তেজিত করছেন তাঁদের তিরস্কার করাই কি তাঁর কর্তব্য ছিল না?

আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজারকেই তাঁর বিবৃতির উপযুক্ত মাধ্যম মনে করতেন, যেমন 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত কি না এমন প্রসঙ্গে (অক্টোবর ১৯৩৭) বা নোগুচির জাপানি জঙ্গিয়ানার বিরুদ্ধে (১৯৩৮) বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে (জুলাই ১৯৩৬)। মহম্মদী পত্রিকা যখন রবীন্দ্ররচনায় সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ করেছিল, যেমন পূজারিনী কবিতায়, তখন রবীন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন আনন্দবাজারে (৪.৬.৩৬)। সংবাদপত্রের বহুল প্রচারের সুযোগও নিতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবেশিকায় পাঠ্য একটি কবিতা নির্ঝরিণী কবিতার অর্থ কী, এই প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজারের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, তার অর্থ (২৬.৮.৩৬)। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিখদের অসম্মান করা হয়েছে বলে লাহোরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ১৯৩৩ সালে। উপলক্ষ্য 'কথা ও কাহিনী'র গুরু গোবিন্দ বিষয়ে কবিতা। তেগ্ সিংহের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি আনন্দবাজার ছাপায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁর কবিতার অক্ষম উর্দু অনুবাদকে দায়ী করেন, তার পরে জানান, কানিংহামের শিখ ইতিহাস তিনি অনুসরণ করেছিলেন। তারও পর তিনি অনুতাপ প্রকাশ করেন যে কানিংহামকে অনুসরণ করা তাঁর ঠিক হয়নি (১৯.২.৩৫)। উত্তেজনা এমন আকার ধারণ করেছিল, কলকাতার শিখদের সভা করে জানাতে হয়েছিল, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রাণনাশের চেষ্টা করেননি, তাঁরা কবিকে শ্রদ্ধা করেন।

ঢেঁকিছাটা চালের উপযোগিতা কী, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কী (১৫.১.৩৬), তাতেও বাঙালির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, আবার পূর্ববঙ্গে জেলেদের দুরবস্থার প্রতিবিধানে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য বিবেচনা করা হত (২০.৮.৩৭)। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে আদৌ সাহিত্যসাধনায় মন দেওয়ার অবকাশ পেতেন, সেটাই আশ্চর্য। এটা বিস্ময়ের কথা নয় যে প্রায়ই তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হত, যে সময়ে দেশে আগুন জ্বলছে সেই সময়ে তিনি বর্ষামঙ্গল করে কি ঠিক করছেন বা বীরভূমে যখন দুর্ভিক্ষ রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ ভারতে কী করছেন (৩০.১০.২২), বা রাজবন্দিদের সাহায্যার্থে নৃত্যগীতের মজলিসে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কি শোভনীয় (৩০.১.২৮) বা মেয়েদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নাচগান, উপলক্ষ্য যাই হোক, সে কি ভাল জিনিস, সরলাদেবীর নিজের মেয়ে থাকলে কি তাকে নাচাতে পারতেন (১৬.৪.২৮)? দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মরণোন্মুখ দেশে বিশ্বপ্রেমের ললিতমোহন মাধুরী ছড়িয়ে কবি মুক্তধারা লিখবেন, এটাও আনন্দবাজারের পছন্দ হয়নি (২৬.৭.২২)।।



কী লিখবেন, কখন লিখবেন, সাহিত্যিকের যদি অন্যের কথা অনুযায়ী চলতে হয়, তার চাইতে বড় বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে! তবে, রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছ থেকে অজস্র প্রীতি অবিরত পেয়ে এসেছিলেন, তাতে ওই ছোটখাট বিড়ম্বনা হয়ত তত বিরক্তির কারণ হত না। কবির সত্তর বছর বয়সপূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে যেখানে বাঙালি আছে সেখানে তো বটেই, অন্যত্রও জয়ন্তী পালিত হয়েছিল। সেটা কোনও দেশনায়ক বা সম্রাটের ভাগ্যেও জোটে না। এই জয়ন্তী উৎসবের সূচনার খবর বের হয় আনন্দবাজারে প্রথম ৭.৩.৩১ আর শেষ বের হয় ৫.২.৩২-মধ্যে সবশুদ্ধ ১২০টি খবর, ছোটবড় মিলিয়ে।

যাঁকে নিয়ে এত হইচই তাঁর রচনা নিয়েও যে অঘটন ঘটতে পারে, তার এক নমুনা: ৬ মার্চ ১৯৩৭

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া বিরোধ

এলাহাবাদে দুইটি ছাত্রে মারামারি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার একটি অংশের ব্যাখ্যা লইয়া এলাহাবাদের দুইটি ছাত্রের মধ্যে দারুণ বচসা হয়। এই বচসা হইতে শেষে হাতাহাতি হয়। তারপর একজন আর একজনকে দাঁত দিয়া কামড় দেয়, ফলে একজনের দাঁতের কামড়ে অন্যজনের ঠোঁট কাটা যায়। উহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভূমিকম্পের কারণ কী, অস্পৃশ্যতাই এর কারণ কিনা, গান্ধী এই রকম আভাস দেওয়াতে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী বিতর্ক অবশ্য কামড়াকামড়ির পর্যায়ে যায়নি। তবে গান্ধীর বক্তব্য, মনে হতেই পারে, ছিল এক উচ্চ ধরনের কমেডি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর বক্তব্যের বিরোধিতা করলে (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূলে কতিপয় প্রাকৃতিক ঘটনার সমন্বয়)। গান্ধী জানালেন (১৬.২.৩৪)। বিশ্বের বিধান আমরা সম্পূর্ণ জানি না, দৈবদুর্বিপাক বলে যেটা মনে হয়, সেটা দুর্বিপাক মনে হয়, কারণ বিধান আমরা জানি না। অতএব অস্পৃশ্যতা ভূমিকম্পের কারণ নয়, কী করে জানব?

কামড় দিতে আনন্দবাজার মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করলেও, প্রায়ই ফললাভ ঘটত না। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শাহেদ সুরাবর্দির বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদলাভ আনন্দবাজার ভাল চোখে দেখে নি। সুরাবর্দি তাঁর আবেদনপত্রে লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বভারতীর নিজাম অধ্যাপক। আনন্দবাজার খোঁজ নিয়ে জানিয়েছিল, মুসলমান সংস্কৃতি সম্পর্কে দশটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিজাম ফাণ্ড থেকে পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন সুরাবর্দি, তিনি নিজাম অধ্যাপক নন, বস্তুত বিশ্বভারতীতে নিজাম অধ্যাপকের পদ তখনও খালি (২৪.৮.৩২)। যিনি নিজের ধর্ম সম্বন্ধে এমন অনবধানের পরিচয় দেন, যেখানে আরও দশজন কৃতী আবেদনকারী আছেন, সেখানে হাসান সুরাবর্দির (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) ভাইপোর চাকরি কীভাবে হল? কিন্তু আনন্দবাজার (এবং প্রবাসীর) আপত্তি টেকেনি।

বাংলার গবর্ণর জন অ্যাণ্ডারসন ৭.২.৩৫-এ শান্তিনিকেতনে গেলে পুলিশের ব্যাপক সোরগোলে শান্তিনিকেতন জনশূন্য হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং কর্মকর্তারা লাট সাহেবকে শূন্য ভবনগুলো দেখান। বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাকেন্দ্র দেখতে গিয়ে লাটসাহেব কয়েকটি ঘরবাড়ি দেখে ফিরলেন, শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদার অপহ্নব ছাড়া আর কী বলা যায়? লাট সাহেবকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করার দরকার কী?

দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, বন্দি অত্যাচারে, শাসন-ব্যভিচারে রবীন্দ্রনাথের দেশের কাজে এগিয়ে আসা সুবিদিত, আনন্দবাজার দৈনিক পত্রিকায় তার স্বাক্ষর প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। কিন্তু তারই মধ্যেই অদ্ভুত ঘটনাও ঘটত, আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন, সেটা অদ্ভুত। কলকারখানায় বিরক্ত কবিকে কেউ কারখানার উদ্বোধনে ডাকে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কবি নন, তিনি বাংলার সব। সুতরাং বাসন্তী কটন মিল উদ্বোধনেও (২৫.৯.৩৪) তিনিই হোতা। ইলেকট্রিক বোতাম টিপে কারখানা চালু করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কবি বলিয়া পরিচিত এক ব্যক্তিকে কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিবার নিমিত্ত আহ্বান—এক অদ্ভুত অসামঞ্জস্য; শিল্প প্রচেষ্টার আধুনিক ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নাই।'

বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত নেই বলেই তাঁকে নিখিল ভারত কৃষি ও গো-উন্নতি বিধায়িনী সমিতির কাছে বাণী পাঠাতে হয়: বর্বর ফুকাপ্রথা অত্যন্ত ঘৃণার্হ। রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা বোঝানর জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করে আনন্দবাজার (৩.৯.৪১): কয়েক খণ্ড বৃহদাকার হোমিওপ্যাথিক এনসাইক্লোপিডিয়া রবীন্দ্রনাথ দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ বলেই তাঁকে সহ্য করতে হত সজনীকান্ত দাসের আসাম প্রবাসী বাঙালি ছাত্র সম্মেলনের দীর্ঘ ভাষণ যাতে সজনীকান্ত জানিয়েছিলেন, বিশ্বমানবমনের রচিত উদ্দেশ্যহীন আর্ট বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণ প্লাবিত করে দিয়েছে। আবার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতিকে তার পাঠাতে হয়, পি সি রায়ের টাকার মূল্যের হ্রাস সম্পর্কে বিবৃতি ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে ধীর স্থির চিন্তা করা আবশ্যক। বাংলা ভাষা রোমান লিপিতে লিখলে কী কী সুবিধা সেটা রবীন্দ্রনাথ বলতেই পারেন, কিন্তু হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কুৎসা রটলেও রবীন্দ্রনাথকে তার নিরসন ঘটাতে এগিয়ে আসতে হয়। ইরাক ইরানে বেড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই। কিছুকালের মধ্যে তাঁকে দেশবাসীরা জানায়, ইরাক থেকে ভারতীয়দের

তাড়িয়ে দিচ্ছে। মেদিনীপুরের মেয়েদের সভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়, আবার প্রগতি লেখক সঙ্ঘেও বাণী পাঠাতে হয়। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র নিরন্তর খবর দিয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিদিকে ভরনপোষণ থেকে বঞ্চিত করছেন এমন খবরও থাকবে, পতিসরে কৃষকদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে সে কথাও থাকবে, আবার উইল ডুরান্টের এমন কথাও থাকবে, you alone are sufficient reason why India should be free.

ডুরান্ট কোথায় এই কথাটি বলেছিলেন? রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ডুরান্ট ভারতবর্ষের অবস্থা সরেজমিনে দেখে ১৯৩০ সালে লেখেন The Case for India এবং রীবন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে ওই কথাগুলো লিখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থের সম্পাদক প্রাসঙ্গিক টীকায় জানাচ্ছেন, উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথকে করা হয়নি, তবে ডুরান্ট এক Copy গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন এবং উপহারসূচক কথাগুলো ছিল ওই।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে টীকা তৈরি করেছেন, বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যসহযোগে। সংবাদপত্রে নানা ধরণের প্রসঙ্গ থাকে, সব প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ এবং সমাবেশ সহজ কাজ না। তবে, বিষয়ানুসারে সংবাদ সাজানোতে সুবিধাও যেমন হয়েছে, অসুবিধাও কম নয়। একটি ছোট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি কী অসুবিধা করে স্পষ্ট হবে। শাহেদ সুরাবর্দির উল্লেখ কোথায় থাকবে? একবার আছে বিশ্বভারতীর অংশে, আবার আছে 'দেশ সমাজ সরকার' অংশে। এটি অবশ্য ছোট উদাহরণ। গান্ধী হলে সেটা কখনও 'দেশ সমাজ সরকার'-এ থাকতে পারে, কখনও 'ভ্রমণ-বিদেশে' থাকতে পারে, আবার কখনও 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ থাকতে পারে। বোধহয়, এই বিষয় অনুসারে ভাগ করতে গিয়ে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে কোনও সংবাদ দিতে পারেন নি। □

■ **রবীন্দ্র প্রসঙ্গ** ১ম খণ্ড (১৯২২-৩২), ২য় খণ্ড (১৯৩২-৪১), ৩য় খণ্ড (১৯৩২-৪১)/আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সংকলিত / সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ / মূল্য যথাক্রমে ১২৫.০০, ১৫০.০০, ১৫০.০০



# 'গান্ধীমানস' : গান্ধীজির রচনাচূর্ণের অমূল্য সংগ্রহ

দেবদাস জোয়ারদার

আর, কে, প্রভু এবং ইউ, আর, রাও সংকলিত বিভিন্ন বিষয়ে গান্ধীজির রচনা সমষ্টি The Mind of Gandhi গ্রন্থটির শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবীকৃত বঙ্গানুবাদ মহাত্মার একশ পঁচিশতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২রা অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে প্রকাশিত একটি মহাগ্রন্থ 'গান্ধী মানস'। মূল ইংরেজি গ্রন্থটি ১৯৪৫-এ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মুখবন্ধ সহ প্রকাশিত হয়েছিল। সংশোধিত সংস্করণের প্রাক্ কথন লিখেছিলেন বিনোবা ভাবে ১৯৬৬ তে। এই সংস্করণেরই বঙ্গানুবাদ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

সংকলিত গান্ধীরচনাসমূহ নানা জায়গা থেকে নানা শিরোনামে এভাবে সংকলিত হয়েছে যে পড়ে মনেও হয় না যে এগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত। বরং মনে হয় অহিংসা, সত্যাগ্রহ, শ্রম, অছিরক্ষণ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, ব্রহ্মচর্য এমনিতর অজস্র বিষয়ে গান্ধীজির কোনও একটানা লেখা পড়ছি। এই সব মূল প্রসঙ্গগুলি আবার নানা উপশিরোনামে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন 'বিশ্বাস' নামক পরিচ্ছেদে 'বিশ্বাসবিষয়ক সুসমাচার,' 'যুক্তির সীমাবদ্ধতা', 'ধর্মের অর্থ, 'আমার ধর্ম'—এ-রকম অজস্র শিরোনামে ছোট অনুচ্ছেদে বা অনুচ্ছেদগুলিতে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ওইভাবে সাজানো রয়েছে যে তাতে অনেক সাজি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। যারা গান্ধীজির রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়, তাদের কাছে এই সংকলন 'গান্ধী মানস' এক মহা মূল্যবান গ্রন্থ। প্রতিটি রচনাংশের উৎস 'সূত্র-নির্দেশ' বিভাগে উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলা অনুবাদের ভাষা সাবলীল; ইংরেজি সুরভিত না হয়ে এ ভাষা বাংলার গন্ধে ভরপুর। মনেই হয় না অনুবাদ পড়ছি। তবে বানানে ও শব্দ ব্যবহারে কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়েছে, যদিও এ-সব বিশাখদত্তকৃত, না, মুদ্রারাক্ষসের—তা মুদ্রিত গ্রন্থ পড়ে বলার উপায় নেই। অজস্র ভুল থেকে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। ৫ পৃষ্ঠায় 'মহানতা' ব'লে যে শব্দটি আছে। তা কোনও ক্রমেই হয় না, ইংরেজি শব্দ মূলে কী আছে, তা জানি না অনুমান করি আছে Greatness তার বাংলা 'মহত্ব'। বিসর্গ সন্ধির একটি নিয়ম, বিসর্গের পর শ, ষ, স থাকলে বিসর্গ-বিসর্গই থেকে যায়। ৬ পৃষ্ঠায় 'অন্তঃসত্তা' 'অন্তর্সত্তা, অথবা ১৯৪ পৃষ্ঠায় পুনঃসংগঠন 'পুনসংগঠন' ছাপা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সন্ধির দিক থেকে এগুলি ভুল। এই জাতীয় বিসর্গসন্ধির ভুল আরও চোখে পড়েছে। 'আহৃত' ৩৭৪ পৃষ্ঠায় 'আহরিত' এই অশুদ্ধ রূপ নিয়েছে। ১৩ পৃষ্ঠায় 'একাকিত্ব' শব্দটিতে ভুলবশত হ্রস্ব-ই কারের জায়গায় দীর্ঘ-ঈ-কার এসে বসেছে। ২১১ পৃষ্ঠায় 'পাপক্ষালন' শব্দটির অশুদ্ধ রূপ 'পাপ স্খালন' ছাপা হয়েছে। কিন্তু এসব ভুলভ্রান্তির তালিকা দীর্ঘতর না করে এবার বরং এই সংকলন পড়ে গান্ধীজির চিন্তা জগতের আভাস দেওয়াই পুস্তক পরিচয়দাতার বড় দায়িত্ব বলে বোধ হচ্ছে।





কিন্তু তার আগে একটি কথা বলে নিই। রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ক চিন্তা ভাবনার আভাসে ভাস্বর এই জাতীয় রচনা সংকলন বাংলায় ও অনুবাদে নানা ভাষায় হয় না কেন? যদি হত তাহলে দেখতে পেতাম কবির সর্বতোমুখী মন ভবিষ্যৎকালের মানুষের পথ চলার জন্য কত মননময় পাথেয় রেখে গেছে। এমন সংকলন হাতে পেলে রবীন্দ্র সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক থেকে সর্বসাধারণ পর্যন্ত সকলে উপকৃত হতেন। গান্ধীজির চেয়ে ঢের বেশি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, তাঁর চিন্তা ভাবনা গান্ধীজির চেয়ে অনেক বেশি শাশ্বতভাবে আধুনিক। দুজনের মধ্যে চিন্তাগত মিলও কম নেই, আবার দূরত্বও দুস্তর। নিঃসন্দেহে এই দুজন মনীষীই আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় পুরুষ। গৌতম বুদ্ধের পাশে যেমন গান্ধীজির স্থান তেমন বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাসের পাশে রবীন্দ্রনাথের আসন।

গান্ধীজি স্বাধীনতাযুদ্ধের অহিংস সেনাপতি। এই যুদ্ধকে তিনিই অহিংস করে তোলেন। রাজনীতি তাঁর কর্মক্ষেত্র হলেও তিনি রাজনীতিকে শাশ্বত মানবনীতির স্তরে উন্নীত করেন। এই সূত্রেই ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের গভীর স্তরে তিনি যে-অহিংসনীতিকে জীবনের মূল বিধি রূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তাকেই ভারতের জাতীয় জীবনে রূপদানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আদর্শ সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল। জীবনের পবিত্রতায় বিশ্বাস থেকে তাঁর মনে হয়েছিল, পৃথিবীর অণোরণীয়ান প্রাণকণা থেকে মহতোমহীয়ান্ মনুষ্যপ্রাণী পর্যন্ত কাউকেই বিনাশের অধিকার মানুষের নেই। প্রাণ হননে নয়, তার লালনেই মানুষের অধিকার। এই তার কর্তব্য। যে-কোনও প্রকার রাষ্ট্রকেই তাঁর মনে হয়েছে অত্যাচারী। এমন যে-অঙ্গী রাষ্ট্র, তার অঙ্গ যে-সরকার, তা যে-ধরনেরই হোক্ শেষবিচারে তাঁর মনে হয়েছে দমনে-পীড়নে, অত্যাচারে-লাঞ্ছনায় সরকার মাত্রই উদ্যতদণ্ড অত্যাচারী। থরোর সূক্তি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যে সবচেয়ে কম শাসন করে। রাষ্ট্র চিন্তায় নৈরাজ্যবাদী গান্ধীজি অহিংস্র সমাজের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। তিনি ইউক্লিডের প্রদত্ত সরলরেখার সংজ্ঞার্থ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ইউক্লিডের সরলরেখার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ নেই। বাস্তবে প্রস্থ নেই—এমন সরলরেখা সম্ভব নয়। যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রস্থই হোক্ না কেন, সরলরেখার তা থাকতে বাধ্য। অহিংস সমাজে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বা তার অঙ্গ সরকার থাকুক বা না-থাকুক, এমন সমাজের জন্যই নিরলসভাবে নৈতিক সাহসের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। প্রস্থহীন সরলরেখার ধারণা আছে ব'লে জ্যামিতির ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যেতে পেরেছি। গান্ধীজি মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রস্থহীন সরলরেখার মতো অহিংস সমাজের আদর্শ মনের সম্মুখে থাকলেই ওদিকে অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে। শুধু অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে কেন, আমরা বলতে পারি যে যাবতীয় আদর্শ সম্পর্কেই এ-কথা সত্য। আদর্শের আদর্শিকায় অর্থাৎ আমাদের জীব সীমাতিক্রান্ত মহত্তর স্বরূপ দর্শন হয় বলেই মানুষের চিত্তে জাগে মহত্ত্বের অভীপ্সা। যে-কোনও আদর্শই শেষবিচারে অথবা কালের বিচারে কল্পলোকের, গন্ধর্বপুরীর, ইংরেজিতে বললে ইউটোপিয়ান। তাই আদর্শ মাত্রই অনধিগম্য—সে আদর্শ অমৃতের পুত্রগণের দিব্যধামে সর্বভূতে অন্তরাত্মা অনুভবের আদর্শ হোক্ আর কার্ল মার্কসের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন মানব সমাজের আদর্শই হোক।

অহিংসায় বিশ্বাসী হলেও গান্ধীজি বারবার বলেছেন যে কাপুরুষতা ও হিংসার মধ্যে দ্বিতীয়টিতে তাঁর দ্বিধাহীন পক্ষপাত। তাঁর অহিংসা বীর্যবানের সাধ্য, নির্ভীকেরই সাধনা, নৈতিক শক্তিতে বলিষ্ঠ মানুষেরই তা আয়ত্ত হতে পারে, কাপুরুষের তা আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব নয়, নৈব নৈব চ। রাষ্ট্র আর তার অঙ্গ সরকারকে বাদ দিয়ে তিনি এক সত্যাগ্রহী অহিংস সমাজের আদর্শে ব্যক্তির সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সূত্রেই সমগ্র ভারতব্যাপী পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার কথা তিনি বলেছেন। তাঁর নিজের ভাষার বঙ্গানুবাদে 'অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গঠিত এই কাঠামোতে চিরপ্রসরমাণ, অনুচ্চাভিমুখী বৃত্ত থাকবে। জীবন পিরামিডের মতো হবে না—যার শীর্ষকে টিকিয়ে রাখে তার তলদেশ। বরং এ হবে এক মহাসামুদ্রিক বৃত্ত, যার কেন্দ্রে থাকবে ব্যক্তি'। তাঁর লেখা থেকে এই উদ্ধৃতিটিতে পিরামিডের উপমার বদলে মহাসাগরের উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করতে পারি নব মানবতাবাদের প্রবক্তা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রদত্ত উপমাটি ছিল পিরামিডের। কিন্তু গান্ধীজির মতে পিরামিডের মাথা তলার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে সমুদ্রের উপরের জল আর নীচের জলের মধ্যে উচ্চ নীচের পার্থক্য নেই। কেননা এই চিরচঞ্চল নীলাম্বুরাশির বিস্তারে ও গভীরতায় উচ্চ ও নীচ স্তরের জল বলে কোনও আলাদা জল নেই। তাঁর কল্পিত অহিংস সমাজেও ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামসমাজের, একটি গ্রামের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত গ্রাম বৃত্তের, কয়েকটি বৃত্ত নিয়ে সক্রিয় মহাবৃত্তের সম্পর্ক

এই মহাসাগরীয় বৃত্তের সম্পর্ক। এখানে উচ্চ-নীচের পার্থক্য নেই, শাসকযন্ত্রী ও শাসিত যন্ত্রের যান্ত্রিক সম্পর্ক নেই।

তাঁর অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সর্বোদয় ইত্যাদি ভাবনার মূল ভিত্তি তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস। তাঁর সমুজ্জ্বল হৃদয়োপলব্ধিতে ও পরীক্ষিত বুদ্ধিতে 'ঈশ্বরই সত্য' এই প্রচলিত নীতিবাক্যের বদলে তাঁর প্রার্থনা ও অনুসন্ধানের ফলে তিনি এই মহান নীতিতে পৌঁছেছিলেন — 'সত্যই ঈশ্বর'। 'ঈশ্বরই সত্য' আর 'সত্যই ঈশ্বর' — এই দুই ধারণায় মস্ত বড় পার্থক্য। তাঁর সমগ্র জীবনে চলেছে সত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা, আত্মজীবনীর নাম দিলেন An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth। নির্ভীক নিরাসক্ত চিত্তে তিনি যা পরম সত্য বলে জেনেছেন, তাঁকেই ঈশ্বর বলে মেনেছেন। সে-সত্যের কাছে, একমাত্র তাঁর কাছেই, তিনি মাথা নত করেছেন, নাই-বা হল, সে-সত্য কঠিন, নিষ্ঠুর ও রুদ্র। জীবনে ও প্রকৃতিতে যা আছে, তার মনগড়া কোমল স্নিগ্ধ রূপকে মানুষ অনায়াসেই বলতে পারে, তুমি ঈশ্বর, ঈশ্বরই সত্য। কিন্তু এ তো নিজেকে ঠকানো। গান্ধীজি নিজেকে না-ঠকিয়ে নিষ্কম্প কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলেন 'সত্যই ঈশ্বর'। এ-কথা বললে আর ঈশ্বরের মনগড়া রূপ কেবল স্বীকৃত হয় না; ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর কোমল-কঠিন যা আছে, তাকে সমগ্রতায় মান্য করা হয়। তাঁর পদপ্রান্তে মাথা লুটিয়ে নিজেকে স্বাধীন করে তোলা সম্ভব। এতে দাসত্ব নেই। আছে স্বরাট হওয়ার সাধনা। বিরাট হওয়ার সাধনা। এই সাধনার সিদ্ধি গান্ধীজির মতে ভালবাসায়। সকল প্রাণীকে ভালবাসায়; শুধু প্রাণী কেন, বহিঃপ্রকৃতিকে ভালবাসায়, সমগ্র চরাচরকে ভালবাসায়। তাঁর উপলব্ধ ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'অস্ফুটভাবে হলেও আমি উপলব্ধি করি, আমার চারপাশে সব কিছুই যখন নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য মৃত্যুবরণ করছে, তখন এই সব পরিবর্তনের অন্তরালবর্তী এমন এক জীবন্ত শক্তি রয়েছে যা অপরিবর্তনীয়, যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে, সৃষ্টি করছে, বিনাশ করছে, পুনরায় সৃষ্টি করছে, বিনাশ করছে, পুনরায় সৃষ্টি করছে। সেই নিত্য শক্তি বা আত্মাই হল ঈশ্বর। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুই অনিত্য, কেবল তিনিই নিত্য।' তাঁর এই কথাগুলি শুধু কথার কথা নয়, তাঁর উপলব্ধ সত্য। তাঁর চারপাশে যা-কিছু আছে, সব ক্ষয়ক্ষতিবিনাশ পেরিয়ে তা নিত্য নব হয়ে উঠছে যাঁর সতত সঞ্চরমান শক্তিতে, তাঁকেই তিনি ঈশ্বর বলে মানেন।

'গান্ধীমানস' বইটিতে সংকলিত গান্ধীরচনাচূর্ণ সমূহে তাঁর চিন্তাভাবনার এমন দিক্ নেই যা উন্মোচিত হয়নি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতের আর কোনও মনীষী গান্ধীজির মতো বলেননি, 'আজকের য়ুরোপ ঈশ্বর বা খ্রিস্টান ধর্ম, কোনওটিরই প্রতিভূ নয়, — এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে শয়তানের প্রতিনিধি'। য়ুরোপে ইতিহাসের ঘটনাক্রমে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটেছে। ভূগোলের সীমা অতিক্রম করে এই আধুনিকতা সমগ্র মানবজাতির আধুনিকতা হয়ে উঠেছে। তার বাহন রেল, হাসপাতাল, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি সব কিছুকে শয়তানের কারসাজি বলে গান্ধীজি যে-ভাবে বর্জনের ডাক দিয়েছেন এ-ভাবে ও'সব পরিহার করতে হলে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনেক ভাল দিক্ আছে, আমাদের দেশি ভেষজ উদ্ভিদের গুণও বলে শেষ করা যায় না। এই সবই সত্য। কিন্তু তাই বলে আধুনিক চিকিৎসা ও সে-চিকিৎসাকেন্দ্র হাসাপাতালগুলি বর্জনীয় — এমনতর গান্ধীসুলভ ধারণাগুলি আমাদের শুধু কৌতুকস্মিতই করে, আর উচ্চহাস্যে মুখর হই যখন পড়ি, 'রোগীর মনে বিশ্বাস জাগাতে হলে, চিকিৎসককে রামনামের মাহাত্ম্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হতে হবে'। ভারতের মতো দেশে কুটির শিল্প, চরকা, খাদি ইত্যাদির নিশ্চয়ই মূল্য তাঁর যুগে ছিল, এখনও আছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের দিক্ থেকে অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়। শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের মনে কায়িক শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহ মনের যাবতীয় বৃত্তির স্ফূর্তির জন্য শ্রমের মূল্য অপরিসীম। গান্ধীজির এই সমস্ত ধারণা স্বীকার করেও আমাদের আধুনিক মন যন্ত্রের শয়তানির উদ্দেশে তাঁর ধিক্কারে সায় দেয় না। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী ম্যাডাম স্যাংগার ভারতে এলে গান্ধীজির সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলেন। গান্ধীজি জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম পদ্ধতি তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে অনুমোদন করেননি, সংযমকেই তিনি এ-ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় বলে মত দেন। 'গান্ধীমানস' বইটিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তাঁর নানা ভাবনা চিন্তার পরিচয় রয়েছে। তিনি মনুবাক্য স্মরণ করেছেন যে প্রথম সন্তান ধর্মজ, আর বাকিরা কামজ। প্রথম সন্তান বংশধারা রক্ষার জন্য ধর্মত প্রয়োজনীয়, অন্যেরা তা নয়। একমাত্র সন্তান কামনা থেকেই নারীপুরুষের যৌন মিলন গান্ধীজি স্বীকার করেন। মানবমানবীর জীবনে শরীর ও মনের এমন একটি মূল প্রেরণাকে একমাত্র অপত্যোৎপাদনের প্রয়োজনে বন্দি ভাবা কতটা শরীর ও মনস্তত্ত্বসম্মত, এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। তবে কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ও নরনারীর আত্মসংযমের পক্ষেও তাঁর যুক্তি দৃঢ়। এই কৃত্রিম পদ্ধতি মনুষ্যকুলকে সারমেয়কুলে পরিণত করবে — তাঁর এই আশঙ্কা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। পৃথিবীর সম্পদ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হবে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তার জন্য তাঁর প্রদত্ত একটি প্রাথমিক শর্ত ছিল, মানুষের ভোগলিপ্সা সংযত করতে হবে। কিন্তু সংযত করলেও জনসংখ্যা লাগামছাড়া





ভাবে ছুটতে দিলে ভাঁড়ে মা ভবানী কি অচিরে দেখা দেবেন না? নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুশোভন। গর্ভনিরোধকের বিরোধিতা করলেও তিনি প্রয়োজনে পুরুষের নির্বীজীকরণের বিরোধী নন। কেননা পুরুষের আগ্রাসী স্বভাব তিনি জানতেন। একই সঙ্গে আবার তিনি ধারণক্ষমা নারীর দায়িত্ববোধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নারীকে তিনি পাপ ও প্রলোভনের কারণ বলে অবজ্ঞা করতেন না। নারী নরকের দ্বার — এমন মেকি বৈরাগ্যের বাণী তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ছিল। নারী পুরুষের জন্য নিজেকে সাজাক, তার হাতে খেলনার পুতুল হক — এ তিনি চাননি। নারীর কাছে বাইরের ল্যাভেন্ডার নয়, তিনি চেয়েছেন অন্তরের সুরভি। পুরুষও সেই একই আন্তরগুণে পেত হবে। এই ছিল তাঁর নারীপুরুষের আদর্শ সম্পর্ক বিষয়ে ভাবনা।

আজকের ভোগবাদের পঙ্কিলতায় আবর্তিত বহিরাশ্রিত উপকরণসর্বস্ব, অন্তর্দীপ্তিহীন মানবসমাজের কাছে গান্ধীজির কণ্ঠে উচ্চারিত ঈশোপনিষদের মা গৃধ: লোভ করো না — এই বাণী রবীন্দ্রনাথেরও মর্মকথা, বোধহয় আত্মার উদ্বোধনে বিশ্বাসী সর্বকালের সকল বিশ্বমানবের এই একই বাণী — মা গৃধ:। তবে গান্ধীজি তপের কৃচ্ছ্রতার উপর যতটা জোর দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ততটাই গুরুত্ব আরোপ করেছেন আনন্দের উপর। এভাবেই অন্তত রবীন্দ্রনাথ নিজে একবার তাঁর ও গান্ধীজির পার্থক্যের কথা বলেছিলেন, স্মরণ করেছিলেন উপনিষদুক্তিদ্বয়, যার প্রথমটিতে বলা হয়েছে — তিনি তপ করলেন, তিনি তপ করে এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করলেন — এই উক্তিতে গান্ধীজির সায়, আর অন্যটিতে রবীন্দ্রনাথের অন্তর পুষ্ট হয় — যার মর্ম — আনন্দ থেকেই এই ভূত সকল উৎপন্ন। কবি যে-পার্থক্যের কথা বলেছেন, তাতে দুজনের জীবনদর্শনের মূল সত্যের উপর আলো এসে পড়েছে এবং তাতে দু'জনের পার্থক্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবন আনন্দ থেকে উদ্ভিত ব'লেই জীবন হক আনন্দময়। সে-আনন্দের জন্য শারীরিক ক্লেশ হ্রাস চাই। সেই ক্লেশ কমাতে পারে মানুষের হাতের যন্ত্র। কেননা যন্ত্রই তার প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে। তাই যন্ত্রবাহন য়ুরোপীয় সভ্যতাকে ধিক্কার হানা কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি। অথচ তা-ই সম্ভব হয়েছে অনায়াসে গান্ধীজির পক্ষে। কিন্তু প্রয়োজনকে অন্তহীন করে সোনার হরিণের পিছনে মানুষের ছুটে বেড়ানো রবীন্দ্রনাথের কাছেও অসহ্য। তাই ভোগবাদকে ধিক্কার হানায় গান্ধীজির মতোই তিনি উচ্চকণ্ঠ।

অপরকে বঞ্চিত করে যে-ভোগ, তার মূল ধরে তাঁরা দুজনই বলিষ্ঠ হাতে টান দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রচিন্তিত সেই মূলোৎপাটন পদ্ধতি আপাতত স্থগিত রেখে গান্ধীজির ভাবনা-চিন্তার কথায় প্রথমেই বলতে হয় তাঁরই ভাষার বঙ্গানুবাদে — অছিরক্ষণ হল বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজকে সমতাবাদী সমাজে পরিবর্তিত করার উপায়। এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না। কিন্তু বর্তমান মালিকশ্রেণীকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেয়। মানবচরিত্র কখনই পাপমোচনের অতীত নয় — এই বিশ্বাসই হল এই তত্ত্বের ভিত্তি। পুঁজিপতি মালিকের শুভবুদ্ধি জাগানোয় তিনি বিশ্বাসী। জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে পুঁজিপতিকে সম্পদ উৎপাদনের উপায়গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, মালিকানার অধিকার ভোগ করা চলবে না। এ-ই তাঁর অছিরক্ষণ নীতির মূলকথা। পূর্ববঙ্গের ভাষায় কেউ ঠাট্টা করে বলতে পারেন, পুঁজিপতি বাঘের হাতে জমিদার কুমিরের হাতে, শ্রমিক ও কৃষক ছাগল চারানি' অর্থাৎ মাঠে মাঠে চরিয়ে বেড়ানো ও দেখাশোনার দায়িত্ব তিনি দিতে চান। ঠাট্টার ভাষা ছেড়ে গম্ভীর ভাষায়ও আবার তাঁর পক্ষে কিছু বলার আছে। কেননা ব্যবস্থা যতই আদর্শ হক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতেই হবে, অন্যায়কারীকে আত্মশোধনের সুযোগ দিতে হবে। অন্যায়কারীকে হত্যা করে সমস্যার যে-সমাধান, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবোচিত সমাধান তাকে সংশোধনের সুযোগদানে রয়েছে। মানুষকে শক্তির মত্ততা যাতে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট না করে, তার জন্য গান্ধীজি কথিত শুভবুদ্ধি ছাড়া আর কোন্ বুদ্ধিতে আস্থা রাখা যায়? আর একটি উপায় আছে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যাতে শক্তি ব্যক্তি বা দলবিশেষের মুষ্টিবদ্ধ না হয় আর সেই শক্তি যাতে মানুষকে স্বাধিকারপ্রমত্ত না করতে পারে। এই বিকেন্দ্রীকরণ ভাবনার সঙ্গেই পঞ্চায়েতিরাজের যোগ।

কিন্তু এভাবে কথা বাড়াতে গেলে পুস্তক পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। হয়ত বা এরই মধ্যে ছাড়িয়েও গেছে। তবুও আরেকটি কথা বলে অলোচনা শেষ করছি। 'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র' শিরোনামে সংকলিত রচনাগুলির একটিতে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব অসত্য' বলা সত্ত্বেও তিনি আবার বলেছেন, 'মুসলিমরা যদি সত্যিই জোর দেয় তাহলে একজন অহিংস হিসাবে আমি প্রস্তাবিত দেশ ভাগে সবল প্রতিরোধ জানাতে পারি না। তবে এ-অঙ্গচ্ছেদে আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি না'। উদ্ধৃত বাক্য দু'টি ভারতের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবহীন সমাপ্তিলগ্নে দ্বিধার ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত। আর এই সংকলনে যা নেই তা হচ্ছে সেই কালবেলায় তাঁর বিখ্যাত শিষ্যদ্বয় কর্তৃক আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত এই মহামানবের অসহায়তার কথা। দেশবিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কী করতে পারতেন? অনশন? তাহলে দাঙ্গার আগুন ব্রিটিশবিদায়ের আগে আরও জ্বলত। অথচ সেই আগুনই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ও তারপর অনেকবার জ্বলেছে, এখনও তা জ্বলছে। এই উপমহাদেশের সমস্ত অনর্থের মূল দেশবিভাগ। ইতিহাসের বিচারে গান্ধীজি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা শুধু দেশবিভাগে নয়, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে।

পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি মহাত্মা, যেমন অজাতশত্রু সত্ত্বেও বুদ্ধদেব মহাত্মা, অশোকের শিলালিপি এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের হিংসার গুণকীর্তনে রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও অশোক মহামতি। 'বেলা অবেলা কাললেলা'র কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায়

মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে আস্থা করা যায় ব'লে ;
হয়তোবা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;
হয়তোবা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে ;

গান্ধীজির নিজের লেখায় তাঁর চিন্তা ও অনুভবের জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, নাশনাল বুক ট্রাস্ট পঁচাশি টাকা মূল্যের এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। □

■ **গান্ধীমানস** — আর. কে. প্রভু এবং ইউ. আর. রাও, অনুবাদ — মহাশ্বেতা দেবী/ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি-১১০ ০১৬ / ৮৫.০০

# মৌলবাদ বিরোধিতার দ্বিধারা

## পুলকনারায়ণ ধর

স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি শব্দমালার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক অভিধানে আরও একটি নতুন শব্দ সংযোজিত হয়েছে। সংবাদপত্রের দৌলতে বহুল প্রচারিত এই পদটি হচ্ছে 'মৌলবাদ' বা Fundamentalism — ভারতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'মৌলবাদ' পদটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু নির্বিচারে 'মৌলবাদ' পদটির ব্যবহারে তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আর কে না জানে যে কোনও বিষয়ে একবার বিতর্কের গন্ধ পেলে উন্মাসিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আর পায় কে। আসল বস্তু ছেড়ে উপলক্ষ হয়ে ওঠে মহার্ঘ। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ শুরু হয়েছে।

বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ দিলীপ কাঞ্জিলালের অভিমত "মূলের ভাব হচ্ছে মৌল। মূলের ভাবকে নিয়ে যে বাদ বা আলোচনা তাকে মৌলবাদ বলা যায়। ...নির্মূল কোন কিছুই জগতে হয় না। তাহলে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতি, সমাজ এ সব নিয়ে যে কোনও মৌলিক ও গভীর আলোচনাই মৌলবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ...বর্তমানে 'মৌলবাদ' শব্দটি বিশেষ কোন অর্থকে সূচিত করছে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।" তাঁর মতে "ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারার যে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে তাকে fundamentalism বা তার ভ্রান্ত প্রতিশব্দ "মৌলবাদ" দিয়ে যথার্থভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ....ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামিই হবে একমাত্র উপযুক্ত পরিচায়ক শব্দ এবং তাকে ইংরাজিতে "Bigotry" বা "Dogmatism এই জাতীয় শব্দের মাধ্যমে অনুবাদ করা যাবে।"

পাশ্চাত্যে, যেখানে 'fundamentalism' শব্দটির জন্ম, সেখানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান যখন বহু খিষ্টিয় ধারণা ও বিশ্বাসের জায়গায় আঘাত করল তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় এই সকল ধারণা ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনকে বলা হয় fundamentalism যেমন যিশুর জন্মকাহিনী, পুনরুত্থান (Resurrection) ইত্যাদি গল্পের প্রতি অবিচল আস্থাকে অটুট রাখার প্রয়াস শুরু হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত কিছু কিছু ধর্মমিশ্রিত ধারণার সংঘাত থেকে জন্মায় Fundamentalism এর আবহ।

'মৌলবাদ' যে পরিবেশে ও কালে আমেরিকার সমাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেই কাল ও পটভূমিনিরপেক্ষভাবে এই পদটি বাংলায় ঢুকে পড়েছে। এর সংজ্ঞাতেই তাই বিপত্তি। আসলে এই শব্দটি নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই বিপদে পড়েছেন। কেউ কেতাবি অর্থ খুঁজছেন, কেউবা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণীয় শব্দার্থ তৈরি করতে চাইছেন, কেউ বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখে লক্ষ্যভেদ করতে চাইছেন। সমাজবিজ্ঞানের জনৈক গবেষকের অভিমত : "শব্দটির মূল ঝোঁক ধর্মকে ঘিরে, যে কোনও ধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য বা ধর্মকে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিকভাবে মেনে চলার প্রবণতা বা চিন্তাকে সাদামাটাভাবে 'মৌলবাদ' বলা যেতে পারে" (ড: সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়)।

তিনি আরও একটু এগিয়ে বলছেন : "কোনও বিষয়ে সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গিকেই মৌলবাদ বলা যায়।

আসলে 'মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার করবার দায়বদ্ধতা থেকেই কিন্তু এর ব্যাখ্যার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কোনও না কোন ভাবে কিন্তু মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের সংকীর্ণতা, গোষ্ঠী সংকীর্ণতা ইত্যাদি ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। সক্রেটিস্, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, টমাস্ হবস — এঁদের কথা ভুলে গেলেও গান্ধীজি, মার্টিন লুথার এবং সাম্প্রতিক কালের নেলসন ম্যান্ডেলাকে ভুলে যাওয়ার সময় এখনও হয়নি। তাঁরা



কিন্তু এই ধরনের 'শব্দ জব্দে'র ভুলভুলাইয়াতে ঘুরপাক খান নি। অথচ, লড়াইটা ছিল আধুনিক 'মৌলবাদে'র বিরুদ্ধেই।

পুরনো সংজ্ঞাই যেখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল বা যেখানে সংজ্ঞা নিরূপনে পণ্ডিতরা একমত নন সেখানে সুরজিৎ দাশগুপ্ত 'মৌলবাদে'র এক নতুন সংজ্ঞা প্রদানে আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সুরজিৎ দাশগুপ্তের গ্রন্থ 'মৌলবাদ — এক নতুন সংজ্ঞা' তাই নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে : "এক নতুন চেতনা উপস্থাপনের জন্যই এক নতুন শব্দের চয়ন।" এই চেতনার উৎস সন্ধানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বীক্ষা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। খ্রিস্ট ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মার্কিন প্রচেষ্টার তিনি বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে ১৮৯৩ সালের শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং 'মৌলবাদ'কে খর্ব করতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাকে তিনি 'ইতিবাচক' বলে বিশ্লেষণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত অনুগামীরা বা মৌলবাদবিরোধী সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা সুরজিৎবাবুর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে এক মত হলে তো বিবেকানন্দকেই 'জাতির পিতা' বলে গান্ধীজির জায়গায় বসাতে হয়। তাতে হয়ত যুক্তির দিক থেকে আপত্তি নেই, কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমান নাগরিকদের কাছে সেটাই কি আবার 'মৌলবাদ' বলে মনে হবে না?

বিবেকানন্দের ভূমিকা নিয়ে, অন্য সব বিষয় ছেড়ে দিয়ে, সুরজিৎ বাবুর লেখা থেকে একটি সামান্য বিষয় উল্লেখ করা যাক্। তাঁর মতে শিকাগো উৎসবের ডিরেক্টর কর্নেল ডেভিসের বক্তৃতায় "প্রত্যক্ষভাবে পুরুষতন্ত্রই" প্রচারিত হয়েছে" (পৃ: ১৬)। এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণে 'sister' শব্দটি ব্যবহার করে পুরুষতন্ত্রকেই আক্রমন করেছেন একেবারে প্রথমেই।

বিবেকান্দের 'Sister' সম্বোধনের ব্যাখ্যা অভিনব সন্দেহ নেই। হয়ত আজকের নারীবাদী আন্দোলনেরও সহায়ক, কিন্তু এটা মনে হয় অতিভক্তির বাড়াবাড়ি। জোর করে কিছু প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। ধর্ম মহাসভা নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যা তিনি সংক্ষেপে সারলেও বক্তব্যের ধার ক্ষুণ্ণ হত না। আমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম মহাসভার প্রতিক্রিয়া নিয়ে লেখক পাতার পর পাতা আলোচনা করেছেন। কিন্তু পরাধীন ভারতের যুবমানসে স্বামী বিবেকানন্দের এই ভূমিকার প্রভাব নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ নেই। ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দ যে সমার্থক হয়ে গিয়েছিলেন তা তো অনেকেরই কাছে আজ 'মৌলবাদ' বা ধর্মবাদ বলেই বিবেচিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলমান জনমানসে আজও কোনও প্রভাব ফেলে কিনা তা স্পষ্ট করে বলেননি। লেখক শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মতের বিরুদ্ধে মত প্রচারকেই 'মৌলবাদ' বিরোধী মত বলে চালিয়ে দিলেই কি তা সবাই গ্রহণ করবেন?

ভারতীয় মৌলবাদের সঙ্গে বহুলাংশে মার্কিন মৌলবাদের সাদৃশ্য সুরজিৎবাবুর চোখে ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে আমেরিকার 'যৌগিক' মিশ্রিত জীবনধারা যার ইতিহাস মাত্র দুশো বছরের সামান্য বেশি তা কি ভারতীয় সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের জীবনেতিহাসের সঙ্গে তুলনীয়? বাহ্যিক অবয়ব দিয়ে দুই দেশের সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি, এমন কি রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলগুলির কার্য প্রক্রিয়াও তুলনা করার অর্থ অতি সরলীকরণের ভাববিলাস।

সুরজিৎবাবু এই মার্কিন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য ধারা অনুসরণ করেই বলেছেন : "মৌলবাদও এক ধরনের সম্প্রদায় বাদ কিন্তু তা বিশেষভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্প্রদায়বাদ" (পৃ: ৬৯)। অবশ্য সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতার মিলন ঘটতে হবে, তবেই সুরজিৎবাবু প্রদত্ত মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি বলছেন : ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট তারিখের আগে — ভারতবর্ষে "কোনও যথার্থ মৌলবাদী আন্দোলন ছিল না" (পৃ: ৬৯)। অথচ তিনি ১৯২৪ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলেশের কোহটে সনাতন ধর্মসভার এবং লালা লাজপত রায়ের আন্দোলন, মদনমোহন মালব্য, হিন্দু মহাসভার আন্দোলনের উল্লেখ করছেন ভারতে মৌলবাদের সূচনাপর্ব হিসাবে (পৃ: ৬০)। মনে হচ্ছে হয় লেখক তাঁর কথা গুছিয়ে বলতে পারছেন না নয়ত তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞার বাইরে গিয়েও 'মৌলবাদ' নামক বস্তুটিকে ধরবার চেষ্টা করছেন।

আসলে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সমস্যা ছিল উপযুক্ত তত্ত্বের। কোন 'আদর্শ'কে অনুসরণ করে গড়ে উঠবে আন্দোলনের 'মডেল' এটাই ছিল বড় সমস্যা। বিশাল হিন্দু জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিল সনাতনী ভাবধারায় সম্পৃক্ত। রামায়ণ, মহাভারতের আদর্শ চরিত্র ও পৌরাণিক কাহিনীর আদলে তারা তাদের ইংরেজ বিরোধিতাকে শান দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিতরা গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে তো এসব অবলম্বন করার কোনও প্রশ্নই ছিল না। গান্ধীজি দুই সম্প্রদায়কে নিয়ে চলার নানা পরীক্ষা করেছেন। চেষ্টা করেছেন। তবুও বলতে হয় যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও 'মডেল' আজও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে নেই। এই অবস্থায় সুরজিৎবাবু রামায়ণ মহাভারতের মতন মহাকাব্যগুলিকে বলছেন "বঞ্চনা ও মিথ্যার পরিপোষক" (পৃ: ৭২)। ভারতের আপামর মানুষ কিন্তু মহাকাব্যগুলিকে ধর্ম শিক্ষার আধার বলেই মনে করেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও আমাদের বলেছেন "রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই

অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন"। শিশুকাল থেকে যা "আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে" এবং "আমাদের নিগূঢ়ভাবে" গড়ে তোলে তারই বলে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। সুতরাং সুরজিৎ বাবু তার 'মৌলবাদের' সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে করতে ভারতবর্ষের মূল ধরেই টান দিচ্ছেন না তো?

বইটি আসলে বিভিন্ন সময়ে রচিত ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। তাই বোধ হয় এক একটি প্রবন্ধ তার চাহিদা অনুসারে পৃষ্ঠা দখল করেছে। মূল বক্তব্য সব প্রবন্ধে তাই দানা বাঁধেনি। মূল বিষয় থেকে লেখক সরে গেছেন অন্য কথায়। যদিও তা নিজ ক্ষেত্রে মূল্যবান।

"মৌলবাদ" নতুন শব্দ। সুতরাং যে কোনও সংজ্ঞাই যে কেউ দিতে পারেন এবং তা নতুন বলে গৃহীতও হবে। লেখকের বক্তব্য প্রায় সর্বত্রই অগোছালো। কারণ ভাষা জটিল যা ভাব প্রকাশের অন্তরায়। সন্দেহ নেই গ্রন্থটি বিতর্ক উদ্রেককারী।

পরিশেষে মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ নিয়ে লেখকের সঙ্গে মতভেদ থাকলেও যে কোনও জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তিতে সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সুরজিৎবাবুর মতনই আমরা 'মৌলবাদে'র অবসানে কোনও "সম্পন্ন ফাল্গুনী দিনের" প্রতীক্ষায় থাকব।

হোসেনুর রহমানের 'ইসলাম — মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ' গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রতীয়মান। কিন্তু সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি মৌলবাদের সন্ধানে বা তার প্রতিবিধানে উত্তরমেরুর দিকে যাত্রা করেন তবে হোসেনুরের যাত্রা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে। সুরজিৎ দাশগুপ্তের একেবারে বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে হোসেনুর মৌলবাদের ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধকারী সমাজ হিসাবে ইসলাম শাসিত মুসলমান সমাজকেই প্রধান বিপদ বলে চিহ্নিত করছেন। সুরজিৎ সংখ্যাটাকে বড় করে দেখেছেন আর হোসেনুর অনড় মুসলমান সমাজের অচলায়তনটিকে ভাঙ্গতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ইসলামের কঠিন কঠোর শরিয়তের রক্তচক্ষু মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি সাধন করছে। এটাই ভারতবর্ষের মূল স্রোতের সঙ্গে আবিষ্ট হয়ে সহজ সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক গঠনে ও আধুনিক ভারত গঠনে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

"আজ মুসলমান সমাজ স্পষ্টত দুভাগে বিভক্ত — আধুনিক, সেকুলার, উদার, অন্যটি পরিবর্তনবিমুখ, গোঁড়াপন্থী মৌলবাদী"। হোসেনুরের এই বিশ্লেষণ সংখ্যাগত বিচারে ততটা বাস্তব নয় যতটা তার বিশ্বাসে। এই দুই ভাগের মধ্যে আনুপাতিক সংখ্যার ব্যবধান মেরুযোজন। এর ওপর আছে প্রগতিশীল হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আশ্চর্য নীরবতা যা কতিপয় প্রগতিপন্থী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠস্বরকে বলিষ্ঠতা দেবার সাহস যোগাতে ব্যর্থ। হোসেনুর এই দিকটি আলোচনায় একেবারেই আনেননি কেন বোঝা গেল না।

হোসেনুর রহমানের মূল 'থিসিস্'টি 'ইসলাম: মৌলবাদ ও মৌল বিবাদ' (পৃ: ৭) এই প্রবন্ধটির মধ্যেই পাওয়া যাবে। হোসেনুরের মতে ইসলামের জন্মলগ্নে যা কিছু ছিল, তার আক্ষরিক পুনঃপ্রবর্তনই দাবি করে মৌলবাদীরা। কারণ, "এই পৃথিবীতে ইসলামীকরণ একটি নিত্যমান ধারা। ....এই ধর্ম যত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছে ততই ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিকেরা ও উলেমারা অনুভব করেছেন আরব আর ইসলাম এক নয়। ততই তাঁরা শুদ্ধিকরণের দিকে ঝুঁকেছেন। ...আর বলেছেন আক্ষরিক অর্থে ধর্মপালনের অর্থই হল ধর্ম রক্ষা করা। ধর্মের সম্প্রসারণ করা। আর যা ইসলাম ধর্মবহির্ভূত তাই ইসলামের শত্রুঃদার উল-হারব বনাম দার উল-ইসলাম" (পৃ: ৮)। তাঁর আরও একটি অভিমত 'ইসলামে ঐতিহ্যবাদী ও মৌলবাদীতে পার্থক্য যৎসামান্য।" এবং এই বিচারে নবাব লতিফ এবং সৈয়দ আমির আলির মতন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও তিনি প্রগতিপন্থী বলে মেনে নিতে নারাজ। তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলন আমির আলিকে বেদনার্ত করেছিল। এবং এই পরীক্ষায় কবি ইকবালও "বারবার পাস করতে পারেননি।" এদেরই পথের পথিক মহম্মদ আলি জিন্নাকে তিনি মনে করেন "যথার্থ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা" (পৃ: ৯৯)।

হোসেনুর রহমানের গ্রন্থটি '৭০-'৮০-র দশকে বিভিন্ন দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। এই দশকে বিশ্বে ও ভারতের নানা স্থানে যে ধর্মীয় উত্তেজনা ও অস্থিরতার প্রকাশ ঘটেছিল সেই বিষয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত। সুতরাং একটি বিশেষ যুগের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের দলিল সন্ধানেও প্রবন্ধগুলি মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে।

হোসেনুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন। যেমন; ইসলাম: রাষ্ট্র ও আইন, ইসলাম ও মানবতাবাদ, নারী ও আধুনিক মুসলমানবিশ্ব, বিবাহবিচ্ছেদ ও মুসলমাননারী, শাহবানুমামলা, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বনাম ভারতীয় দেওয়ানি আইন, ভারতীয় মুসলমান সমাজ ও নিরাপত্তাহীনতার বহিঃপ্রকাশ, সংখ্যালঘু মনোবৃত্তি প্রভৃতি। সমস্ত মতামতের সঙ্গে নিশ্চয় সকল বুদ্ধিমান পাঠক একমত হবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু লেখকের বক্তব্য প্রকাশে যে নির্ভিকতা ও স্পষ্টতার ছাপ আছে তা দুর্লভ।

সুরজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে হোসেনুরের মিল এই যে দুজনেই মৌলবাদ বিরোধী এবং দুজনেই বিশ্বাস করেন "পৃথিবীটা বদলাচ্ছে, এবং নিদারুণ বদলাচ্ছে"। পরিশেষে বইটির একটি ত্রুটি উল্লেখ করতে হয়। এত বিপুল প্রবন্ধসম্ভারের কোনও তালিকা বা প্রকাশকালে ও স্থানের কোনও পরিচয় না থাকায় পাঠককে শুধু পাতা হাতড়াতে হয় কোথায় কি লুকিয়ে আছে খুঁজে বের করার জন্য। এটা নিদারুণ বিড়ম্বনা! □





■ **মৌলবাদ-এক নতুন সংজ্ঞা** — সুরজিৎ দাশগুপ্ত / ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা-৬ / ৩০.০০

■ **ইসলাম — মৌলবাদ ও মৌলবিবাদ** — হোসেনুর রহমান / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কল-৭৩ / ৭৫.০০

# অনন্ত ভট্টাচার্য : ইতিহাসের নায়ক

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অনন্ত ভট্টাচার্য আজীবন বিপ্লবী ছিলেন। অনুশীলন সমিতি থেকে নকশালবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত নিরলস অবিচ্ছেদ্য কর্মধারার মধ্যে দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রবাদ-প্রতিম। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের "স্মৃতিচারণার সমন্বয়ে ১৯২৫ থেকে ১৯৭৫ এই পঞ্চাশ বছরে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক ছবি" ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটি। 'মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা: ১৯২৫–১৯৭৫' সংকলনের পনেরটি নিবন্ধে লেখকগণ তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে একটি স্মরণ রিপোর্টও। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য সংযোজন বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যের আত্মস্মৃতি — "জেলের ডায়েরী" এবং "আন্দামান বন্দী"। এই সংকলনের সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছেন: ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত অনন্তবাবুর চরিত্র ও কর্মধারা একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে, তাঁরা লেখকদের "নিজ নিজ মতামত ও দৃষ্টিকোণ প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা" দিয়েছেন, যার ফলে "প্রত্যেকটি লেখায় প্রতিফলিত লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিমত।"

১৯১০ সালে মুর্শিদাবাদে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবারে অনন্ত ভট্টাচার্যের জন্ম। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর বাবা গঙ্গানারায়ণ পৌরোহিত্য করে সামান্যই উপার্জন করতেন। তাতে বড় সংসারের খরচ চালানো ছিল দুঃসাধ্য। বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর বড় দাদা লক্ষ্মীনারায়ণ পৌরোহিত্য করে এবং বিড়ি বেঁধে কোনও মতে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। ছোটভাই যক্ষায় মারা যান। এই রকম একটি পরিবার থেকে সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল রাজনীতির পথ বেছে নিলেন তিনি। রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে থেকেও অন্য অনেকের মতো তিনি স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠেননি। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই তাঁর সারা জীবনের ব্রত। দেশের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সারা জীবন বিপ্লবের পথই তাঁর পথ। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় তার উত্তরণ ঘটে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে। একদা অনুশীলন সমিতির কর্মী অনন্তকে ব্রিটিশ প্রশাসন বন্দি করে। পরে স্বাস্থ্যের কারণে রংপুরের ডিমলায় অন্তরীণ থাকার সময়ে কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কলকাতায়, বহুবাজার স্ট্রিটে। জেল হয়। বিভিন্ন জেল ঘুরিয়ে অবশেষে আন্দামানে দ্বীপান্তর। ব্রিটিশ সরকারের পৈশাচিক অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ভগ্নস্বাস্থ্য অনন্ত ভট্টাচার্য জেল থেকে বেরিয়ে এলেন কমিউনিস্ট হয়ে। পরে সি. পি. আই থেকে সি. পি. আই (এম), সেখান থেকে সি. পি. আই. (এম-এল) — এই ভাবে নিরন্তর তিনি বিপ্লবের পথের সন্ধানেই এগিয়ে গেছেন। চরৈবেতি। কিন্তু যে মানুষটি সারা জীবন শোষিত মানুষের পক্ষে লড়াই করলেন, শেষ জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ। ভুল বুঝেছেন তাঁকে অনেকেই, এমন কি তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কেউ কেউ। ১৯৭৫-এর ৩০ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

অনন্ত ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থটি স্মৃতি-সংকলন হয়ে উঠতে পারত। তেমনই হয় সাধারণত। কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলীর সজাগ দৃষ্টি তা হতে দেয়নি। পঞ্চাশ বছরের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবহমান ধারার একটা সামগ্রিক পরিচয় এতে আছে। তার মধ্যে খুঁজে পেতে চেষ্টা করা হয়েছে অনন্ত ভট্টাচার্যের অবস্থান। এ বিষয়ে শক্তিনাথ ঝা-র "দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক দোলাচলের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রগতিশীল বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ও স্থিতির পর্বপর্বান্তরের ধারা প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে কী রূপ পেয়েছে তার একটা সামগ্রিক চেহারা এতে ধরা পড়েছে। "১৯১০ থেকে নানা ধরনের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতারা বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদে পদার্পণ করেন। কান্দি, কাশিমবাজারের রাজারা কলকাতার নানা সংগঠন ও সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বিপিন পাল, সর্বোপরি গান্ধীর আগমন, প্রচার ও জনসভা, এবং কাশিমবাজার প্রভৃতি সামন্ত পরিবারের সমর্থনে, বাঙ্গাল পাড়ায় এর ঢেউ তরঙ্গ তোলে।" (পৃ. ১৯)। গান্ধীর আগমনের

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। হার্ডিঞ্জ স্কুলের পড়ুয়া ছাত্র অনন্ত অনাদের সঙ্গে "স্বপ্নের স্বদেশ গড়তে চায়' (পৃ.২০)। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে অন্য খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালে "এ আন্দোলনের প্রাবল্যে অধ্যক্ষ কলেজ বন্ধ করে দেন।" (পৃ.২৭)। দাবি করা হয়েছে এই কলেজে পড়তে এসেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নায়ক সূর্য সেনের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা এখানে হয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং ভগৎ সিংহের ফাঁসি মুর্শিদাবাদের জনমানসে আত্মত্যাগের জোর আনে। "এক বেআইনি জনসভায় ব্রিটিশ শাসন ধ্বংসের জন্য আহ্বান জানান অনন্ত ভট্টাচার্য; সেখানে অন্য বন্ধুরা পড়েছিলেন নিষিদ্ধ পুস্তকের অংশ। এ রাজদ্রোহ রাজনৈতিক দিক থেকে ভয়ঙ্কর। তাই অনন্ত অনাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।" (পৃ.৩১)। এরপর আবার বন্দিজীবন। রংপুরের ডিমলায় অন্তরীণ। আন্দামান থেকে ফিরে মুর্শিদাবাদে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৮ সালে সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। ভবানী সেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ মুর্শিদাবাদে যান। জাতীয় বিপ্লবে কৃষক-শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করেন। অনন্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টি সংগঠিত হতে থাকে। পৌর হরিজন, মৎসজীবী, তাঁতি, দর্জি, বিড়ি শ্রমিক, রিক্সা চালক, কৃষক, প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক, ছাত্র, ঝি-চাকর প্রভৃতিদের নিয়ে গণসংগঠন গড়ে তোলা হয়। সর্ব স্তরের এই সংগঠনগুলি তৃণমূলে শেকড় চারিয়ে দিয়েছিল। আর. এস. পি-র তৈরি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব অল্পদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে চলে আসে। "তেভাগার আবেগ এ জেলাতেও এসেছে।" (পৃ.৩৯)। কিন্তু তা প্রহসনে পরিণত হয়। শক্তিনাথবাবু পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ধারাটিকে ধরতে চেয়েছেন। ঠিক এই রকমই আরেকটি নিবন্ধ বিষাণকুমার গুপ্তের "বামপন্থী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ: ১৯৩০–১৯৬৭"। এটিও সাঁইত্রিশ বছরের ইতিহাসের একটি সার্বিক আলোচনা। "১৯৩৬ সালে দু জন কর্মকর্তাসহ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিতে ৮ জন কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন।" (পৃ.৭১)। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিকে এভাবে প্রচ্ছন্ন থেকেই কাজ করতে হত। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট লীগ অবশ্য ১৯৩৮ সালে আলাদা কৃষক সমিতি গঠন করে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সি. পি. আই নওদা থানার সর্বাঙ্গপুরে কৃষক সম্মেলন করে। তাদের দাবি: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ এবং জমিদারি অত্যাচার বন্ধ। পরপর কয়েকটি কৃষক সম্মেলনে কৃষকদের আরও বিভিন্ন দাবি তাদের গভীরভাবে সংগঠিত করেছিল। শুধু তাই নয়, "কমিউনিস্ট পার্টি এ জেলায় তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়েই জনযুদ্ধের তত্ত্ব বা ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচার চালিয়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে" (পৃ.৭৬)। দেখা যায় ১৯৪৩ সালে সি. পি. আই. নেতা প্রাণগোবিন্দ মিস্ত্রির নেতৃত্বে সহস্রাধিক মানুষ ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক টানাপোড়েন সম্পর্কে বিষাণবাবু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। দেখিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের বিভিন্ন দিকগুলি। আর "প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিলেন বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য।" (পৃ. ৮৮)। বিষাণকুমার গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের পর্ব-পর্বান্তরের রাজ-আর্থনীতিক ইতিহাস-নির্ভর বিশ্লেষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছে অনন্ত ভট্টাচার্যের স্থান মূল স্রোত ধারার কোথায় অবস্থিত।

তারাপ্রসন্ন বসু সর্বাধিকারী, দুর্গাপদ সিংহ, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, সনৎ রাহা, সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী, বিজয়কুমার গুপ্ত, শম্ভুনাথ সরকার, গৌরীচরণ ভট্টাচার্য, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁদের স্মৃতিচারণায় অনন্তের চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠেছে। শুধুই পুজো নয়, আবেগ সর্বস্ব স্তরের প্লাবন নয়; বিচ্যুতির দিকটিও কারো কারো রচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন জনের মতামতে বিভিন্নতার সুর থাকলেও অনন্ত ভট্টাচার্যের একটি সার্বিক মানবিক চরিত্র সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি। অবশ্যই সে চরিত্র ইতিবাচক এবং প্রকৃত অর্থেই বিপ্লবী।

নিরন্তর বিপ্লবী ধারায় যাঁর পদচারণা সেই অনন্ত ভট্টাচার্যের পদসঞ্চার হল নকশালবাড়ি আন্দোলনে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের এই পর্ব নিয়ে তিনটি রচনা এই সংকলনে প্রকাশিত। দিলীপ বাগচী "আন্দামান থেকে নকশালবাড়ি: দীর্ঘ দূরযাত্রী অনন্তদা" নিবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন: "আন্দামান বন্দী' অনন্তদা'র কাছে ভারতবর্ষটাই আন্দামানে পরিণত হয়ে থেকে গেল তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। আমরা বৃটিশ আন্দামানের স্বাদ পাইনি। তবে 'স্বাধীন ভারতকে' বৃটিশ আন্দামান রূপে ভাবার দৃষ্টিকোণ ও বোধটুকুওতো পেয়েছি অনন্তদা'দের কাছ থেকেই।" (পৃ.১৬৯)। গোটা ভারতবর্ষটাই যে জেলখানা তা তথাকথিত অর্থে স্বাধীন ভারতের ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য—এই বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল বদ্ধমূল। তাই সি. পি. আই (এম)-এর মধ্যে পার্টি লাইন বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়েন, উত্তরণ হয় নতুন বিপ্লবী প্রচেষ্টা নকশালবাড়ি আন্দোলনে। এই বিতর্কটি ধরা আছে তপন ভট্টাচার্যের "নকশালবাড়ি আন্দোলন ও অনন্ত ভট্টাচার্য" প্রবন্ধে। নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দীপঙ্কর চক্রবর্তী লিখেছেন: "..... সারা জীবন ধরে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন বিপ্লবের এবং তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস অনুসারে সেই অনাগত বিপ্লবের পক্ষেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন গভীর সততার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, অক্লান্তভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যেও তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সেই বিপ্লবের স্বপ্ন, তাদেরকেও স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন সারা জীবন ধরে। তাই, আমার চোখে, তিনি ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিপ্লবী। (পৃ.১৯৯) গোটা বইটিতে অনন্ত ভট্টাচার্যের একটি দৃঢ়, ঋজু চারিত্রমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা এই সংকলনের একটি বড় প্রাপ্তির দিক। □



■ **মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা: ১৯২৫–১৯৭৫** (বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থ)/সম্পাদনা: দীপংকর চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝা, সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, তপন ভট্টাচার্য/বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটি। খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৫০.০০।

# বাঙালিমাত্রই বাবু আবার বিপ্লবীও

তিমির বসু

অনেকদিন বাদে একটা ভাল বই হাতে পাওয়া গেল। শংকর ঘোষের 'বাবু ও বিপ্লবী'। যদিও বই-এর প্রকাশ ১৯৯৬ সালের বইমেলা কিন্তু এর হদিশ পেলাম এ বছরের মধ্যাহ্ন আয়োজিত মে' দিবস অনুষ্ঠানে। সন্দেহ নেই, বাঙালিমাত্রই বাবু আবার বিপ্লবীও বটে। সেদিক থেকে বইটির নামকরণ যথেষ্ট যুৎসই হয়েছে। কারণ আলোচিত তিন বাবু যখন সমর সেন, নীরদ সি চৌধুরী এবং সরোজ দত্ত। তরুণ বঙ্গসন্তানেরা ইদানীং আর বিপ্লবী হবার তেমন কোনও স্বপ্ন দেখেন না। তবুও বাংলার বাইরে একটা ধারণা আছে বাঙালি মাত্রই বুঝি মার্কসবাদী। ফ্রন্টিয়ার এর জন্য যে কজন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তা করে গেছেন লক্ষ্মৌ প্রবাসী আর পি মল্লিক তাদের অন্যতম। রমাপ্রসাদ মল্লিক গত বছর দুয়েক হল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুর আগে তাঁর সামান্য সঞ্চয় হাজার তিনেক টাকা 'ফ্রন্টিয়ার'-কে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই মল্লিক একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বাংলায় এই যে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর মধ্যে চুলচেরা মতাদর্শ নিয়ে বিতর্ক চলছে, শোধনবাদের মাপকাঠি কিংবা গভীরতা মাপা নিয়ে এত যে সংঘর্ষ, বাংলার বাইরে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সেখানে সবাই কমিউনিস্ট—সি পি আই, সি পি এম, সি পি (এম-এল) সব এক হ্যায়। কে কতটা সমাজ গণতন্ত্রী এসব কেউ বিচার করে না।

প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই যদি বিপ্লবী হওয়া যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত সব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। নীরদবাবু বিখ্যাত বাঙালি সন্দেহ নেই। বিপ্লবপন্থীরা তাঁকে বিপ্লবী বলতে রাজি কিনা জানি না। জেলের ভেতরে বা বাইরে বিপ্লববাদীদের মধ্যে নীরদবাবু নিয়ে কোনও আলোচনা কখনও শুনিনি। কিন্তু সমর সেন বিপ্লবপন্থীদের বিবেক আর সরোজ দত্ত কট্টর মাওপন্থী বিপ্লবী যিনি বিপ্লবের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নীরদবাবুর অত্যধিক ব্রিটিশ প্রীতিই বোধহয় তাঁর সম্পর্কে বিপ্লবীদের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। কেউ বোধহয় বলেছিল—'he is more British than Bengali' কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারটা! ফলে তাঁর বহু 'প্রশংসিত' 'The Autobiography of an Unknown Indian (1951) অনেকের কাছে এখনও অপঠিতই রয়ে গেল। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর লেখার এক ধরনের কদর আগেও ছিল এবং এখনও আছে। তাঁর কলমের মুন্সিয়ানা কিম্বা ভাষার উপর দখল নিয়ে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠক যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতে পারে নিশ্চয়ই। এমন কি খুশবন্ত সিং-এর মতো দাম্ভিক ব্যক্তিও ভাষার উপর তার দখলের তারিফ করে থাকেন। কিন্তু পরিবর্তনবাদীরা এই গর্বের অংশীদার হতে অনাগ্রহী বলেই মনে হয়। যাঁর মতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর কোনও বাংলা ঔপন্যাসিক নেই তাঁর সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের লেখক-লেখিকরা খুব উৎসাহ বোধ করে বলে মনে হয়না।

শংকরবাবু তাঁর স্মৃতিচারণে নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে অনেক অজানা কথা শুনিয়েছেন। পড়তে ভালই লাগে।

নীরদবাবু সমর সেনের কাগজে লেখা বন্ধ করলেও দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই ছিল। 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে নীরদবাবুর প্রসঙ্গ আসেনি এমন নয়। তবে সেটা নেহাৎই একথা-সেকথা। আমি বারকয়েক সমরবাবুকে নীরদ চৌধুরীর কাছে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর Autumn Number-এর জন্য লেখা চাইতে বলেছি। কিন্তু সমরবাবু সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেননি। তবে লেখা চেয়ে কখনও কোন পত্রালাপও করেননি। মনে হয় ভেতর থেকে তেমন সাড়া পেতেন না। শংকরবাবু এক জায়গায় নীরদবাবুর প্রতিটি লেখার বার আটেক পরিবর্তন করবার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে দেখছি নীরদবাবু অজান্তে মাও-এর নীতি অনুসরণ করছেন। মাও সে তুং লেখার উন্নতির জন্য কমপক্ষে আটবার লেখা

পরিমার্জনের পক্ষপাতী। আজকে এই "সময় নেই"-এর যুগে কোনও লেখকই এত সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। এটা করতে পারলে ভালই হয়।

'দেশব্রতী' পড়তে গিয়ে প্রথম সরোজ দত্ত'র লেখার সঙ্গে পরিচয়। তাঁর তীক্ষ্ম ব্যাঙ্গাত্মক লেখা পড়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। জ্যোতি বসুর উপর পাটনায় 'হামলা' হল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরোজ দত্তর সেই বিখ্যাত উক্তি—'কড়ে আঙুল ছড়ে যাওয়া হাফ শহীদ জ্যোতি বসু'। প্রসঙ্গত ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাবু জগজীবন রামের কাছ থেকে বোধহয় একবার এধরণের একটা চমকপ্রদ কথা শোনা গিয়েছিল—'দেড়জনের শাসন'।

সরোজ দত্তর রহস্যজনক মৃত্যু এবং পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে আর একবার নির্মম সত্য তুলে ধরে সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যের বাম রাজনীতির নৈতিক দেউলিয়াপনাকেই শংকরবাবু খুব সঠিকভাবেই কশাঘাত করেছেন। সরোজ দত্ত পুলিশ হেফাজতে খুন হয়েছেন একথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানা গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ নিয়ে তেমন কোনও প্রতিবাদ হয়নি, আন্দোলন দূরে থাকুক।

প্রায় ১৯ বছর পর অর্চনা গুহ মামলায় বহু নিন্দিত পুলিশ কর্তা রুনু গুহনিয়োগীর শাস্তি হয়েছে। শাস্তি যদি নাও হত অর্চনা মামলা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে প্রচার হয়েছিল তার গুরুত্ব অসীম। সরোজ দত্ত পুলিশের হাতে খুন হয়েছেন সত্তরের দশকে একথা বলায় ঝুঁকি ছিল ঠিকই কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়ার জন্য ভীতির বাতাবরণ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। এ ব্যাপারে শংকরবাবু প্রকারান্তে মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির নিষ্ক্রিয় ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। নকশাল নেতা সরোজ দত্ত সম্পর্কে ওদের ভূমিকা ভিন্ন রকম হওয়া অস্বাভাবিক। পার্টির সঙ্গে কারও মতবিরোধ হলেই হয় সে পুলিশের চর না হয় সি আই এ—সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে। বরানগর-কাশীপুর গণহত্যার পরও ওদের রাজনৈতিক বিবেক বিচলিত হয়নি।

নকশালদের বিভিন্ন গ্রুপ এখন সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল। বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বুর্জোয়াদের চাইতেও সময় সময় তারা বেশি আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের তরফেও সরোজ দত্ত হত্যা নিয়ে তেমন কোনও সোরগোল হয়নি। কিছুদিন আগে বিনোদ মিশ্রদের তরফে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল—যদি একটা মামলা দায়ের করা যায়। কিন্তু তার পরিণতি কী হল জানা যায়নি। 'সরোজ দত্ত' নিয়ে এখনও লেখালেখি চলছে। 'জলার্ক' তাদের সরোজ দত্ত সংখ্যায় সাধ্যমতো আলোচনা করেছে। কিন্তু এর দ্বারা জনমত গড়ে ওঠার আদৌ কোনও সম্ভাবনা নেই। সরোজ দত্তর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকায় শংকরবাবুর স্মৃতিচারণায় বহু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এসে পড়েছে। সত্তরের দশক যাদের এখনও অনুপ্রাণিত করে তাঁরা অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন।

সংস্কৃতি নিয়ে সমর সেন-সরোজ দত্ত বিতর্ক বহু পুরনো। সেই বিতর্ক নিয়ে কোনও মহলেই আজ আর তেমন উৎসাহ নেই। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' সম্পর্কে সরোজ দত্তর স্পর্শকাতরতার বিশেষ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। 'খতম' লাইনের বিরোধিতা পার্টির ভেতরে এবং বাইরে আরও অনেকে করেছেন। যে কোনও ধরণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধিতাই তখনকার এম-এল পার্টির কাছে অসহ্য ছিল। এই অসহিষ্ণুতা শেষ পর্যন্ত নকশাল আন্দোলনের ক্ষতিই করেছে। 'বিপ্লবভীরু বুদ্ধিজীবী' কিম্বা 'সূক্ষ্ম শোধনবাদীদের' জেলের মধ্যেও নিরাপত্তা ছিল না। তারা যে কোনও সময় খতম হয়ে যেতে পারত। বর্তমান লেখককেও আলিপুর স্পেশাল জেলে এই ধরণের এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে দেশব্রতীর পাড়ায় বিপ্লবভীরু বুদ্ধিজীবী তত্ত্বের প্রথম লেখক সত্য নারায়ণ সিংকে পরবর্তীকালে এই বিশেষণে ভূষিত হতে হয়েছিল। আসলে চিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে সামান্যতম রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিরোধিতাকেও সাম্রাজ্যবাদ নতুবা সামাজিকসাম্রাজ্যবাদের দালালি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। এর জন্য অবশ্য চিনারাও বহুলাংশে দায়ি।

কমুনিস্ট আন্দোলন এদেশে দুবার মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছে—প্রথমে CPM-CPML এবং পরে CPI-CPM এই বিভাজনের জন্য দুবারই মূলত চিনাপার্টি অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছেন। আবার সংকটের সময় চিনাপার্টি তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেনি। সুবিধাবাদের চূড়ান্ত। নিজেদের জাতীয় স্বার্থের জন্য অন্য পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চিনারা সব সময়ই হস্তক্ষেপ করেছে। আবার প্রয়োজনে একই অজুহাতে হাত গুটিয়ে রেখেছে।

ঘটনা হচ্ছে সরোজ দত্তর সাহস ছিল তাঁর অতি বড় শত্রুও একথা স্বীকার করতে বাধ্য। সরোজ দত্তকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি পুলিশ। নৃশংসতা দেখিয়ে পুলিশ শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় প্রতিবছর হাজার হাজার বিপ্লবী এবং বিপ্লবের সমর্থক হারিয়ে যায় প্রতিবিপ্লবের হিংসায়। সত্তরের পশ্চিমবঙ্গ লাতিন আমেরিকা হয়ত হয়নি কিন্তু সরোজ দত্তর হত্যার পর কলকাতা বুঝিবা লাতিন আমেরিকার জঙ্গলই হয়ে উঠছিল।

সম্পাদক সমর সেন সম্পর্কে শংকরবাবুর দীর্ঘ স্মৃতি চারণা বহু কারণেই অনেকের মনে থাকবে দীর্ঘ দিন। সমর বাবু মারা যাবার পর কিছু মহল থেকে একটা প্রচেষ্টা ছিল 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সমর সেনকে অস্বীকার করা। বলা ভাল এখনও



এ প্রচেষ্টা অব্যাহত। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের যারা ধারক ও বাহক তাদের কাছে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্য সমরবাবুর ১৯ বছরের পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা, প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যেও আপোসহীনতা—এসবের কোনও মূল্য নেই। কবিদের অবস্থান না হয় বোঝা যায়। কিম্বা প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যসেবীদের না হয় একটা দায়বদ্ধতার বাঁধন রয়েছে—মালিকের প্রয়োজনে দরকার হলে তাদের মিথ্যাচরণ করতে হবে, করতে হবে সত্যকে অস্বীকার। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছ থেকে এই ধরণের আচরণ ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্র্যাশিকেও হার মানায়। সমরবাবু মারা যাবার পর 'গণশক্তি' যে প্রতিবেদন ছেপেছিল সেখানে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর নামোল্লেখ পর্যান্ত নেই। সাহিত্য অকাদেমি যে স্মরণসভার আয়োজন করেছিল সেখানেও আলোচনা হয়েছিল মূলত কবি সমর সেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। বর্ষীয়ান কবি অরুণ মিত্রের কাছে কবি সমর সেন অপেক্ষা ব্যক্তি সমর সেন অনেক বেশি আকর্ষণীয়—"I was more an admirer of Samar Sen the man than the poet." অরুণ বাবু 'ফ্রন্টিয়ার' প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু ওই সভায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল 'poet Samar Sen was more relevant than the editor of Frontier'. মুখার্জীবাবু কোনও সময়ে নিয়মিত 'ফ্রন্টিয়ার' পড়তেন কিনা জানিনা আর পড়লেও এটা নিশ্চয়ই কখনও খোঁজ করেননি সমরবাবু হঠাৎ 'ফ্রন্টিয়ার' প্রকাশ করবার তাগিদ কেন অনুভব করেছিলেন। কবিতার মাধ্যমে সমর সেন যত লোকের কাছে পৌঁছেছিলেন, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর মাধ্যমে দেশে বিদেশে তার চাইতে অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সত্যটাকে অস্বীকার করে অস্বীকারকারীরা কী বলতে চাইছেন তাঁরাই জানেন। অন্ধ্রের জঙ্গলে যাঁরা প্রতিনিয়ত পুলিশের মোকাবিলা করছেন তাঁরা 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সমর সেনকে চেনে, বাংলা কবিতা পড়ার সৌভাগ্য তাদের নেই বললেই চলে। কিম্বা সুইডেনের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী মিরদালের ছেলে জান মিরদাল সম্পাদক সমর সেনকে জানেন। যেসব কুরদীশ বিপ্লবী টার্কির জেলে আমরণ অনশন করছেন তাঁরা তাঁদের বিবৃতি 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় ছাপতে আগ্রহী, বিনা কারণে নিশ্চয়ই নয়। মুখার্জীবাবুরা কবি সমর সেন নিয়ে কতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তা নিয়ে এদের মাথা ব্যথা নেই। শংকর বাবু সম্পাদক সমর সেন সম্পর্কে বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সমর সেনকে অস্বীকার করবার দলকে একটা উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন যদিও এই ব্যাপারটা তাঁর চিন্তায় ছিল বলে মনে হয় না।

যেসব বুদ্ধিজীবী লেখক সমরবাবুর কাছে থেকে আস্তে আস্তে সরে গেছেন তাদের সম্পর্কে কটাক্ষ থাকলেও শংকর বাবু বিশেষ কারও নাম করেননি। অবশ্য নাম জানিয়ে কী বা লাভ? সমরবাবুর কাছে আমি পরে জেনেছি 'এমারজেন্সির' সময় এই 'পলায়ন' একটা ন্যক্কারজনক রূপ নিয়েছিল। সেই সময় অনেক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর বাড়িতে ফোন করলে সমর বাবু বেশির ভাগ সময় উত্তর পেতেন—'উনি বাড়িতে নেই' অথবা 'উনি এখন কলকাতার বাইরে'। এর পর সমর বাবু এদেরকে ফোন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আসলে বিপ্লব হলে মিলিয়নিয়র মার্কসবাদীদের হারাবার আছে অনেক কিছুই। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিলেন। অশোক রুদ্র কোনও ব্যাপারে সমরবাবুর কোনও চিঠি পেলে তৎক্ষণাৎ সহযোগিতা করেছেন। বিজ্ঞাপন জগতের অনেকেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও 'ফ্রন্টিয়ার' বিজ্ঞাপন পেত না। ঠিক তেমনি বহু লেখকের সঙ্গে হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের লেখা 'ফ্রন্টিয়ার'-য়ে আসত না। অনেকে আবার EPW-তে লেখা বেশি পছন্দ করতেন। হয়ত অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছায় সেই কারণে। এই অবস্থার আজও কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ ক্ষেত্রেও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখার জন্য কারও চাকরি যায়নি কিম্বা কর্মক্ষেত্রে বিপদে পড়তে হয়নি। তবে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখার জন্যই মনে হয় ধানবাদের এ কে রায়-এর সিপিএম পার্টির সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। সমরবাবু মাঝে মাঝে বলতেন 'ফ্রন্টিয়ার' হচ্ছে হাত পাকাবার আসর। একটু পরিচিতি হলেই তখন অন্যত্র সরে পড়ার পালা। এই অবস্থার এখনও কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রবি সেনের নক্‌শাল নেতা হিসাবে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেওয়ার যে মজার কাহিনী শংকরবাবু লিখেছেন সেটা আমাদের অনেকেরই অজানা। রবিদা দু'একবার তাঁর বিদেশি কাগজে 'ইন্টারভিউ' দেওয়ার কথা বলেছেন বটে কিন্তু তার পেছনে কলকাতার কিছু সাংবাদিকের হাত ছিল একথা অবশ্য কখনও বলেননি। রবিদা'র ভাই অসিত সেন ছিলেন নক্‌শাল নেতা এবং রবিদা মোটামুটিভাবে অসিতদা'র রাজনৈতিক লাইনের সমর্থক ছিলেন। রবিদা'র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল এই অসিতদা'র ল্যান্সডাউনের বাসায়—ময়দানে যে জনসভায় এম-এল পার্টির জন্ম ঘোষিত হয় সেই সভার সভাপতি ছিলেন অসিত সেন। ইতিহাসের পরিহাস অসিতদা সেদিন নিজেই জানতেন না ওই সভায় এম-এল পার্টির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। এটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

সমরবাবুর সঙ্গে রবিদা'র বিচ্ছেদের তেমন কোনও কারণ ছিল না। রবিদা যখন 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ব্যবসার দিকটা দেখতেন তখন যথেষ্ট বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত ঘটনা এমন নয়। অন্ততপক্ষে নিত্যপ্রিয় ঘোষের রবিদা'র উপর স্মৃতিচারণে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একটা জিনিষ সবার জানা দরকার—

'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে রবি সেনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরও রবিদাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমরবাবুর সঙ্গে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত সুসম্পর্ক রেখেছিলেন এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্য সব রকম সাহায্য করেছেন। একবার এমন অবস্থা হল যে সাপ্তাহিক পাওনাদারদের টাকা মেটানো যাচ্ছে না। সমরবাবু রবিদাকে ফোন করে সব কিছু বললেন। রবিদা সঙ্গে সঙ্গেই কিছু টাকা এনে সমরবাবুকে দিলেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একবার সাংগঠনিক সঙ্কট দেখা দিল। মনে হয় ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে। সমরবাবুর শরীর তখন বেশ খারাপ। যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার ফলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর মালিকানা সমরবাবুর হাত থেকে বেরিয়ে যেত। হয়ত ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে 'ফ্রন্টিয়ার' দিল্লি থেকে নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করত। এ ক্ষেত্রেও রবিদা এসে সমস্যা সামাল দিয়েছিলেন। রবিদা'র সঙ্গে সমরবাবুর বিরোধ থাকলেও সেদিন পর্যন্ত সমরবাবু রবিদা'র উপর আস্থা রেখেছেন। কে. সি. দাস মারা যাবার পর সমরবাবু রবিদা'কেই তার জায়গায় ডিরেক্টর করেছিলেন।

সমরবাবু মারা যাবার পর 'ফ্রন্টিয়ার' কিম্বা 'ফ্রন্টিয়ার'-এর প্রকাশকের তরফে কোনও স্মরণসভা আয়োজনের আমি পক্ষপাতী ছিলাম না। কারণ সমরবাবু এসব আদৌ পছন্দ করতেন না। রবিদা বললেন 'তবুও আমাদের কিছু একটা করা দরকার। কারণ এরপর সবাই সব কিছু ভুলে যাবে'। সেহেতু 'ফ্রন্টিয়ার' কিম্বা এর ব্যানার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার আপত্তি ছিল, তাই রবিদা শেষ পর্যন্ত নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের সহযোগিতায় শ্রী শিক্ষায়তনে এক স্মরণসভার আয়োজন করলেন। সেই সময় যতগুলো স্মরণসভা হয়েছিল তার মধ্যে এই অনুষ্ঠানটাই ছিল সব দিক থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক। ফ্রন্টিয়ার অফিসে সমরবাবুর যে ছবিটা রয়েছে সেটাও রবিদা'ই একদিন নিয়ে এসে বললেন, 'এটা যে এ ঘরে কোথায় রাখা যায় বুঝতে পারছি না, যেখানে হক এক জায়গায় টাঙিয়ে রাখ'। রবি সেনের সঙ্গে সমর সেনের একটা পারিবারিক সম্পর্কও ছিল আর সেই সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে রবিদা'র ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

সময় থেমে থাকছে না। আজ আর সত্তরের দশকের উত্তাল আবহাওয়া ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সত্তরের দশক ক্রমশই ইতিহাস গবেষকদের বিষয়বস্তু হয়ে যাচ্ছে। শংকরবাবুর এই বইটা তাঁদের কাজে লাগবে নিশ্চয়ই। □

■ **বাবু ও বিপ্লবী** — শংকর ঘোষ / রক্তকরবী, কলকাতা-৯ / ৩০.০০

# লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞের চোখে দেখা গ্রাম

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

গ্রাম।বড় কোমল জায়গায় হাত দিয়েছেন গ্রামমনস্ক এই লেখক। লিখেছেন, 'গান আর গ্রাম আমরা বরাবরের অনুরাগের দুটি বিষয়। বছর তিরিশ ধরে বাংলা গানের নানা ধরণ খুঁজতে বেড়িয়েছি অগণন গ্রামে। সেই সুবাদে ঘটেছে একজন শহরবাসী মানুষের নানা গ্রামিক অভিজ্ঞতা। সঞ্চিত হয়েছে কত রকমের আখ্যান ও লোককথা, কত গান ও যাপনের বিভঙ্গ।... এই বই সেইসব রচনার সম্পুট।' বই-এর নাম 'পঞ্চগ্রামের কড়চা'। খোলসা করেই লিখেছেন, 'বইয়ের সব রচনাতেই ধরতে চেয়েছি পরিবর্তমান গ্রাম বিন্যাসের কাঠামোকে। সেই কাঠামোর মধ্যেই মানুষ বদলাচ্ছে, পালটে যাচ্ছে তার জীবনছন্দের লয়, অন্য এক ধারার স্পন্দ। আমার চেষ্টা সেইটাকে ধরা।' মুখপাতে উদ্ধৃত 'হারিয়ে যাওয়া গ্রাম' কবিতাংশটি পড়লেও রসিকগণ টের পাবেন এ বইয়ে কোন্ রসের পালাকীর্তন হবে। দুর্দান্ত গ্রামচন্দ্রিকা!

গ্রন্থখানি পঞ্চাঙ্কে ছড়ানো একটি গ্রামীন অভিযাত্রার মমতামেদুর বৃত্তান্ত। অন্বেষণ-আরোহণ-অবরোহণ। আদি-মধ্য-অন্ত। আদি থেকে মধ্যে যাবার পথে দুটি পরত। অভিযাত্রী বেরিয়েছেন পথে। চলেছেন 'গ্রাম থেকে গ্রামে'। এক এক গ্রাম যেন এক একটি নকশা। 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' ঘুরতে ঘুরতে লেখক টের পান তাঁর ভাঙা গড়া রূপান্তরের আভাস। বিষয়ক্রমের মধ্যপর্বে উঁচু হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার পিরামিড। 'গ্রাম □ শহর'। 'শহর □ গ্রাম'। একদিক থেকে ইতিবাচক উত্তরণ। অন্যদিকে নেতির দিকে গড়িয়ে পড়া। গ্রাম তার সজীবতার ডালি নিয়ে নৈমিত্তিক পৌঁছচ্ছে শহরে। অন্য দিকে গ্রামকে ভেতরে ভেতরে ভাঙছে শহর মরীচিকা। শোনা যাচ্ছে গ্রাম পতনের শব্দ। 'গ্রামের পাঁচালি' আখ্যাত অন্তিম অঙ্কে ছড়ানো আছে সেই পতনেরই সপ্রমাণ বিস্তার। এগারোটি দৃশ্যের মতো আপাতসম্পর্কহীন এগারোটি কাহিনীতে।

পঞ্চগ্রামের কড়চা। 'গ্রাম থেকে গ্রামে' আছে পঞ্চগ্রামের কথা। ব্যানা, পাখমারা, সরগাঁ, যিশুনিবাস, জগাইপুর। মুসলিম অধ্যুষিত ব্যানা গ্রামের গফুরন্নেছা বুড়ি অচেনা গ্রাম পথিককে সস্নেহে ডাকে। 'ও ছেলে তুমি আমাদের উঠোন দিয়ে যাও' (পৃ.১৪)। বজরং দলের সশব্দ হুঙ্কার চাপা পড়ে যায় এমন



মায়া, এমন টান সেই কণ্ঠে। যে গ্রাম অনেককাল ধরে অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসে আছে অথচ নানা অছিলায় আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি গফুরন্নেছা সেই গ্রামের দাদি। গ্রামের জীবনপ্রবাহের নিজস্ব ছকে গড়ে ওঠা আর গল্প শোলোক তার গলায়। 'মাছ খাও তো ইলিশ, আর নাং রাখো তো পুলিশ। কি কেমন শুনলে?' (পৃ.১৮) শ্লীল-অশ্লীলের সীমায় বাঁধা যায় না গফুরুন্নেছাকে — গ্রামকেও। ব্যানা থেকে রাজপুত উপনিবেশ যিশুনিবাস। শেষে উদ্বাস্তু কলোনি জগাইপুর। অভিবাসিত ইতিহাসের নানা বর্ণ ও সৌরভকে বাংলার গ্রাম কিভাবে ব্লটিং পেপারের মত চুষে নিয়েছে তার বৃত্তান্ত। মানসিংহের আমলে আসা নিরিমিষ্যভোজী রাজপুত মাটির গুণে মাছের মহিমা কীর্তন করছে। এক সময়ের আগ্রাসী খ্রিষ্টান যাজক যোসেফের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে খাঁটি ফকিরি সুরে খ্রিস্ট গান।

বরফ আর পানি হয়
তারা ভিন্ন তবু ভিন্ন নয়
তবু বরফের মধ্যে পানি রয় (পৃ: ৩৩)

জগাইপুরে দেখা যাচ্ছে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা উৎপাটিত মানুষ কি করে নতুন শিকড়ের টান পাচ্ছে, প্রত্যয়িত সংকল্পে গড়ে তুলছে নতুন গ্রাম। প্রথম অঙ্কের পরিকল্পনাটি চমৎকার। তবে অতৃপ্তি নেই তা নয়। মান্য সাময়িকপত্রের অবসাদগ্রস্ত পাঠকদের উত্তেজনার খোরাক জোগাতে লেখক দু দু'টি রাজপুত অধ্যুষিত গাঁয়ে না ঘুরে যদি একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বেছে নিতেন তবে প্রবন্ধটির প্রতি সুবিচার করা হত। যে লজিকে গ্রামগুলিকে সাজিয়েছেন তাতে আদিবাসী গ্রামটির স্থান পাবার কথা প্রথমেই। দাওয়ায় চাটাই পাতা এক বুড়ি সেখানে বলতে পারত — এঃ ঠেকুর, অনড়ে দুড়ুপমে'। হেই ঠাকুর, ঐখানে বোস্'।

গ্রামে গ্রামান্তরে পর্যায়ে এসেছে তিনটি গ্রামের কথা — নলদা, ফুলকলমি, পণ্ডিতপুর। প্রথম অঙ্কের মতো এখানে কোনও অভিবাসিত (মাইগ্রেটেড) সংস্থার নকশা নেই। লোকসংস্কৃতির আভ্যন্তর সূত্রে কোনও কোনও গ্রাম গাঁথা ভেতরে ভেতরে। কোথাও তার ডাল, কোথাও ফুল, কোথাও পাতা। বোলান ধরে চলে যাওয়া যায় সর্বাঙ্গপুর থেকে উদ্ধারণপুর সেখান থেকে নলদায়। সাহেবনগরের ফণী বলে নলদার শ্যাম বিশ্বাসের কথা। সেখানে গিয়ে লেখক টের পান পালটে যাচ্ছে গ্রামের মানুষ, তাদের সম্পর্কের বিন্যাস। পপ গানের সুরে বাঁধা হচ্ছে বোলান গান। কারণ 'সাবেকি সুর চলবে না। যে গাইবে, আর যারা শুনবে তাদের দু'জনেরই এই এক আবদার।' (পৃ: ৫৩) ফুলকলমি গাঁয়ে লেখক যান গোরুর গাড়িতে চেপে। গিয়ে অনুভব করেন গাঁয়ের আতিথ্যে কোনও খামতি নেই। 'এখানে অবারিত মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত, আর সমাকীর্ণ নিসর্গ কোথাও এদের খর্ব করেনি।' (পৃ: ৫৭) কিন্তু বদলে গেছে আতিথ্যের উপাচার। পরিবেশেরও বদল হচ্ছে। বর্ডারের গাঁ। স্মাগলার, ডিস এ্যান্টেনা ও মৌলবাদের জানানদারিতে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে সাবেকি গ্রামীণ মানুষ ও তাদের সেকুলার বন্ধুত্ব। ভটভটি চেপে একদিন লেখক পৌঁছে যান তরকারি চাষী স্যামুয়েলদের গ্রাম পণ্ডিতপুরে। সেখানে মাঠের 'ফসল উপচানো সৌন্দর্য্য' দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। অনুধাবন করেন, কৃষি ব্যবস্থা: বিপুল উন্নতি গ্রামকে গ্রাম পাল্টে দিচ্ছে।' (পৃ: ৬৬) গ্রামের সমাজকল্যাণকর্মী অঙ্গন ওয়াড়ি 'অর্পিতা সেখানে আরেক রকম ফসলের জনয়িত্রী। সে ঘটাচ্ছে পণ্ডিতপুরের শিশুদের মন আর বিকাশের পুষ্টি। ...যেন নতুন বর্গের নয়া ফসল।'(পৃ: ৭১) কালোমুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে পণ্ডিতপুরের অর্পিতা বলে 'আবার আসবেন তো।' প্রথম অঙ্কের শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জগাইপুরের বংশী ঠিক একই আহ্বান জানিয়েছিল, আবার আইয়েন।

গ্রাম □ শহর। শহর □ গ্রাম। গ্রাম ও শহরের অন্তঃস্থ বিনিময় দিয়ে সাজানো একটি নিভৃত নাট্যদ্বন্দ্বের মধ্যে আমাদের বসবাস। দু'দিকে তার ঢাল। গ্রাম কি শুধু গ্রামেই থাকে? শহরে কি এসে পৌঁছায় না তার অর্ঘ্য? পৌঁছয় বৈকি। নৈলে কলকাতা হল কি করে? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ এঁরা তো সব গ্রাম থেকেই একের পর এক এসে পৌঁছেছিলেন ডিহি কলকাতায়। নগরের বিন্যাস? বিনয় ঘোষ সেখানেও দেখতে পেয়েছিলেন কালকেতুর নগর পত্তনের সামন্ততান্ত্রিক ছক। সুধীর চক্রবর্তীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে 'এসব অ্যাকাডেমিক উদাহরণের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি খুব সহজ করে দেখিয়েছেন কীভাবে নির্মল দারিদ্র্যের অনুষঙ্গে শহরে শহরে এসে পৌঁছুচ্ছে গ্রামীণ সজীবতা। 'অশ্রুঝরানো পেঁপে, সতেজ কাঁচকলা, ডাঁসা পেয়ারা, জলের গন্ধমাখা কলমি শাক, ..কচু পাতায় ছড়ানো গুগলি, নিত্যপূজার খুচরা ফুল'। (পৃ. ৭৬) কাকভোরে এসব বয়ে আনে বীরপুরের নমিতা মণ্ডল, কোমর বাঁকা মানোদা বুড়ি, দিগ্ নগরের ভাদুরি বালা, সাতহাটির মেখলি দুর্লভ, দোগাছির পুষ্প। শহুরে বাজারের সবচেয়ে অনাদৃত অঙ্গনে সবুজ আলোর মতো ফুটে থাকে এদের বয়ে আনা গ্রামীণ অর্ঘ্য। এও একটা স্রোত। মানবিক অন্বেষণ জাগরুক থাকলে এই স্রোত ধরে পৌঁছনও যায় গ্রামীণ জীবনের নিরিবিলি অন্তঃপুরে। জানা যায় 'গ্রামিক জীবনের নানা অভিজ্ঞান যে বয়ে নিয়ে যায় শহরে, জীবনে তাদের নেপথ্যবিধান কত পরিপাটি বিন্যস্ত আর জীবনস্পন্দী।' (পৃ.৮৪)

'গ্রাম যেমন আসে শহরে শহর তেমনি যায় গ্রামে। গ্রামের ইতিবাচক অর্পণ দিয়ে যদি রচিত হয় তার উত্তরণের চূড়া শহরের নেতি দিয়ে তেমনি সূচিত হয় তার স্খলন। কি ছিল গ্রাম! অগ্রদ্বীপ। গুপীনাথের অগ্রদ্বীপ। পাঁচশো বছরের পুরনো

এক জনপদ। ইতিহাস এখানে সজীব ও লোকায়ত। দেবতা এখানে সন্তান। গৃহস্থের সেরা জিনিসটি তাকে না দিয়ে খেতে পারে না। কী আশ্চর্য জীবনমুখী এই ভক্তির ধারা। দুদিকে কারুশিল্পীদের উপনিবেশ। দাঁইহাট ও নতুনগ্রাম। প্রস্তরশিল্পী ও দারুশিল্পীদের গ্রাম। জরাজীর্ণ সমাদরহীন গ্রামীণ পরম্পরার মধ্যে নতুন গ্রামের কার্তিক ভাস্কর এখনও বিশ্বকর্মার দক্ষতায় একটুকরো নিমকাঠ থেকে পাঁচ মিনিটে বের করে দেয় দু'ইঞ্চি প্যাঁচার গড়ন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু গ্রাম থেকে বেরুনোর পথে দেখা হয় নতুন প্রজন্মের এক শিল্পীর সঙ্গে। ভারত উৎসব ফেরৎ বিদেশী স্ট হ্যাট পরা কাঠশিল্পী শম্ভুনাথ ভাস্কর। শহুরে ও প্রচারপ্রবণ, বিচ্ছিন্ন ও প্রতিষ্ঠাকামী। ইংরেজি নেম কার্ড হাতে তুলে দিতেই এক ঝটকায় ভেঙে যায় গ্রাম। গ্রামের ঐতিহ্য পরম্পরা। মামুদপুরের দাউদ ফকির একই আধুলির এপিঠ-ওপিঠ। বাউলরা বিদেশ যাচ্ছে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বাউলদের মতো দাউদ ফকির বিদেশের স্টেজে গাইবে না কেন? (পৃ. ৯৮) লেখক শুনতে পান, 'গ্রামের গভীরতম স্তরে স্পষ্ট একটা গ্রাম পতনের শব্দ।... শহর মরীচিকা এদের ভাঙছে।' (পৃ: ৯৮) পাঠক হিসাবে বুঝছি ফলিং অ্যাকশন শুরু।

বাকি পঞ্চম অঙ্ক। এগারোটি দৃশ্যের সমাহার। নাম 'গ্রামের পাঁচালি'। পা চালিয়ে দেখা গ্রাম। পাঁচটা পাঁচরকম নিয়ে আঁকা মা দুগ্গার চালির মতো। 'বৈরাগীর প্রতিশোধ' থেকে 'বন সমাজের বৃত্তান্ত' — দু'একটি বাদ দিলে প্রায় সব ক'টি দৃশ্যেই আছে গ্রাম পতনের চিহ্ন। 'বৈরাগীর প্রতিশোধে' শ্যামদাস বৈরাগীর কৃতী সন্তান এফিডেবিট করে ন্যাস্টি টাইটেল বদল করে উঠে যাচ্ছে শহুরে ফ্ল্যাটে। দেখা যাচ্ছে কবি সম্মেলনের নামে গ্রামেও চালু হয়েছে কবিমন্যদের শহুরে চালিয়াতি। পুজো উপলক্ষে এখন গ্রামেও নীলছবির আমন্ত্রণ, রবীন্দ্র স্মরণ হয়ে উঠেছে কার্যসিদ্ধির উপায়। এই রকম আরও নানা কাহিনী। এর মধ্যে অন্তত একটি দৃশ্য আছে যেখানে বাঁধা হচ্ছে গ্রাম ও শহরের সেতু। 'আম্বিয়া বিবি।' রক্ষণশীল মুসলমান গ্রামের এক বধূ তার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে শহরের হাত ধরছে। তার গ্রামে গিয়ে খুলছে সাক্ষরতা ও স্বনির্ভরতার কর্মশালা। পণ্ডিতপুরের অর্পিতার সমান্তরাল সক্রিয়তায় পাওয়া গেল রহমতপুরের আম্বিয়া বিবিকে। পতনের মধ্যে নির্মাণের অঙ্কুর। নেতির মধ্যে ইতি। খোদার উপর খোদকারি চলে না। তবু বলব বন সমাজের বৃত্তান্ত নয় এই বইয়ের সমাপ্তি দৃশ্যের মুখ্য দাবিদার ছিল আম্বিয়া বিবি। গফুরন্নেছা থেকে আম্বিয়া। তিন প্রজন্মে মোচার মতো মুড়ে দেওয়া যেত এক গ্রামীণ বৃত্তান্ত। উচ্চবর্গীয় লিটারারি ছাঁদ লেখক হয়ত এড়িয়ে গেছেন ইচ্ছা করেই। গ্রামিক অভিজ্ঞতা বলেই টানটান শহুরে শৃঙ্খলায় না বেঁধে খানিকটা শিথিল করে সাজিয়েছেন — এমন হওয়াই সম্ভব। সেজন্যেই কড়চা, পাঁচালি জাতীয় অনাধুনিক নামরূপে ঝোঁক তাঁর। নইলে পাঁচালি অংশ টুঁড়লে এমন রচনা পাওয়াই যায় যার মধ্যে চেপে ছোট করে রাখা হয়েছে একটি মহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা বা এমন কাহিনী অপ্রাপ্য নয় যার দু'একটি ছত্র অদলবদল করে দিলে হয়ে উঠত পাকা ছোট গল্প। চাই কি একটু জল বা ঝাল মেশালে দু'চারটি টি. ভি সিরিয়ালও বেরিয়ে আসতে পারত।

এখন আসা যাক অন্য লোকনে। বইটিকে দেখা যাক বইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন তো উঠতেই পারে লেখকের গ্রাম দর্শনের ইতি-নেতি নিয়ে। যা দেখেছেন সবটাই কি তাঁর ঠিক দেখা? সবই কি দেখতে পেয়েছেন তিনি? এ সব প্রশ্ন থেকে শুরু হয় বিতর্ক-মতান্তর অথবা মতান্তর থেকে আসে এসব প্রশ্ন। গ্রাম দর্শনের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই বোঝা দরকার দ্রষ্টার অবস্থান। রেলগাড়ি থেকে নেমে তিনি গ্রামের দিকে যাচ্ছেন, না অপু-দুর্গার মতো গ্রামের ভেতর থেকে ছুটছেন রেলগাড়ির দিকে? লেখক জানিয়েছেন 'এ বই একজন শহরবাসী মানুষের নানা গ্রামিক অভিজ্ঞতা'র সম্পুট। স্বভাবতই 'পথের পাঁচালি'র থেকে ভিন্ন মেরুর একটি গ্রামদর্শন এখানে পাওয়া যাবে।

■ **পঞ্চগ্রামের কড়চা** — সুধীর চক্রবর্তী / প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১৩, ৫০.০০

# ড. আর. কে. দাশগুপ্তের রসরচনা

সন্তোষকুমার দে

কবি নরেন্দ্র দেবের কাছে শুনেছিলাম, রাজশেখর বসু যখন বেঙ্গল কেমিক্যালের মানিকতলার কারখানায় কাজ করতেন তখন সপ্তাহের ছয় দিন কারখানার কোয়ার্টারে থাকতেন, রবিবারে সকালে আসতেন তাঁর পৈতৃক বাড়ি, সায়ান্স কলেজের পাশের রাস্তায় পার্শিবাগানে এবং রবিবারে বিকেলে রাজশেখর বাবুদের বাড়িতে সাহিত্যিক সমাগম হত। সেই সভার নাম ছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। সেখানেই রাজশেখর তাঁর লেখা 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রসরচনাটি পড়ে বন্ধুদের শোনান। সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক



রায় জলধর সেন বাহাদুর লেখাটি চেয়ে নিয়ে পকেটস্থ করেন। ওই সভায় উপস্থিত চিত্রশিল্পী যতীন সেনকে জলধর অনুরোধ করেন 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কাহিনীটির অলঙ্করণ করতে। যতীন ছিলেন রাজশেখরের দ্বারভাঙ্গার সহপাঠী বন্ধু। তিনি রাজশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করে যে ছবিগুলি আঁকেন তা ব্যঙ্গ চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় গল্পটি রাজশেখর নিজের নাম না দিয়ে তাঁদের পারিবারিক স্বর্ণকার 'পরশুরাম'-এর নামে (ছদ্মনামে) লিখতে চান; যতীনও তাই 'নারদ' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'পরশুরাম' রচিত এবং 'নারদ বিচিত্রিত' অভিধা-সহ 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রসরচনাটি এমন জনপ্রিয় হয় যে পরে 'চিকিৎসা সঙ্কট,' 'লম্বকর্ণ', 'ভূশণ্ডীর মাঠে' প্রভৃতি পরশুরামের অনেক সচিত্র রসরচনা 'ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেই সব মজাদার কাহিনী সংগ্রহ 'গড্ডলিকা' নামে যখন বই হয়ে বেরোয় রাজশেখরের কর্মস্থল বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা' পড়ে এতই বিস্মিত হন যে প্রফুল্লচন্দ্রকে এরকম লিখে পাঠান — একদিন ঘুম ভেঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যদি দেখা যায়, আগের দিনেও যেখানে ছিল খোলা মাঠ সেখানে এক দীর্ঘ জটাজুটধারী মহীরুহ বট দাঁড়িয়ে আছে, তাতে যে-বিস্ময় সৃষ্টি হয়, রাজশেখরের 'গড্ডলিকা' পড়ে কবিরও সেই অবস্থা হয়েছে।

কথাগুলি মনে পড়ছে সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'অলীক সংলাপ' নামক বইটি পড়ে। এখন যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন তবে হয়ত তিনিও বিদগ্ধ গ্রন্থকারের এই প্রথম বাংলা রসরচনার সংগ্রহ পড়ে একই রকম বিস্ময় প্রকাশ করতেন। সংসারে দুই শ্রেণীর লেখক জন্মান — এক যাঁরা বালক বয়সের আধও আধও বুলির মত কাঁচা রচনা দিয়ে লেখা শুরু করে ক্রমশ পরিণত ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন — যার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর এক শ্রেণীর লেখক মধ্যবয়সে যখন লিখতে শুরু করেন তখনই তিনি সম্পূর্ণ পরিণত। তাই তাঁর প্রথম আবির্ভাবের সময়েই বিশাল বটবৃক্ষের উপস্থিতি অনুভূত হয়, — যার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'পরশুরাম' বা রাজশেখর বসু। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা রসসাহিত্যে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের আবির্ভাবও রাজশেখরের মতই পরিণত বয়সে। তাই তাঁর 'শ্রী গৌড়' ছদ্মনামে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় লেখা রসরচনাগুলি প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চমক লাগে, যদিও তাতে কোনও ব্যঙ্গচিত্র যুক্ত হতনা। কিছুকাল পরে 'দেশ' পত্রিকায়ও 'শ্রীগৌড়' এবং তারও পরে 'ইন্দ্রধনু' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর সচিত্র লেখাগুলির গুরুত্ব এবং মাধুর্য সকলেরই নজর কাড়ে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'রবিবাসর' সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হলে উৎকেন্দ্র সমিতির জলধর সেন, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সদস্যের সঙ্গে রাজশেখরও রবিবাসরের সদস্য হন। তাঁর মুখেই শুনেছি, বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার বিক্রি করতে খুলনায় গিয়ে ফিরবার পথে স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' লিখবার প্রেরণা তাঁর মনে আসে। অর্থাৎ শেয়ার বিক্রয়ের অভিজ্ঞতাই তাঁর রস-রচনার মূল উৎস, তা পরিপাটিভাবে পরিবেশন করবার কুশলতা দিয়েছিল তাঁর উচ্চশিক্ষা, সূক্ষ্ম রুচি ও দীর্ঘ দিনের প্রচুর পঠন-পাঠন ও সাহিত্যপ্রীতি। রবীন্দ্রকুমার যে শুধু দেশে বিদেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন তাই নয়, 'কথাসাহিত্য' পত্রিকাতেও বাংলায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। যখন তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক তখনও কলকাতায় এসে বন্ধু চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের আমন্ত্রনে রবিবাসরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ সভায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েছেন। পরে যখন তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক হয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন তখন রবিবাসরেও সদস্য হন এবং তাঁর নিকট সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তখন দেখেছি, অধ্যাপক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা শ্রীগৌড়ের কলমে কীভাবে একটির পর একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করছিল।

বর্তমান গ্রন্থে শ্রী গৌড়ের সেই সব রচনার সমাবেশ বেশি নেই, বেশির ভাগই 'ইন্দ্রধনু' ছদ্মনামে লেখা — যা 'দেশ' পত্রিকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অলীক সংলাপ' এমনই একখানি দুর্দমনীয় আকর্ষক গ্রন্থ যার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির পাতার পর পাতা তুলে দিতে ইচ্ছা করে। এখানে তার স্থানাভাব, তবু গ্রন্থখানির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হলেও উদ্ধৃতি না দিয়ে উপায় নেই।

প্রথমেই বলব তাঁর ভাষার কথা — বিদ্যাসাগর যে বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকাংশ রচনা লিখেছেন তা এযুগেও যে সমান আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে তা ড: দাশগুপ্তই এখনও পর্যন্ত সমান পারদর্শিতার সঙ্গে প্রমাণ করে চলেছেন। একটু নিদর্শন দিচ্ছি। বর্তমান গ্রন্থের ৩৯টি রচনার মধ্যে যা আছে তা ছাড়াও তাঁর শ্রী গৌড়ের পূর্বতন রচনাগুলিতে এর প্রচুর নিদর্শন মিলবে। প্রমথনাথ বিশী নিজেও অনেক 'সংবাদ' বা কথোপকথনের মাধ্যমে রসরচনা লিখেছেন। তিনিও সানন্দে স্বীকার করেছেন — ভাষা-শিল্পী হিসাবে ড: দাশগুপ্ত রাজশেখরের মতই সদাসতর্ক ও সযত্ন। 'সাধের স্বপ্ন' কাহিনীতে ড: দাশগুপ্ত লিখেছেন — যা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের সার্থক অনুসরণ। — "স্বপ্ন দেখিলাম বঙ্গদেশ আবার স্বাধীন হইয়াছে। বঙ্গললনাদিগের হুলুধ্বনিত আকাশ বাতাস মুখরিত। আবার

অবিরাম শঙ্খরব যেন গভীর নীরবতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন শান্ত স্নিগ্ধ কলরব ইতিপূর্বে শুনি নাই। নগ্নপদেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এমন রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতও যেন পূর্বে কখনও দেখি নাই। প্রথমেই লক্ষ্য করিলাম কোনও অট্টালিকার প্রাচীরগাত্রে কোনও ভোটপ্রার্থীর নাম অঙ্কিত নাই। একজন গৃহস্বামী বলিলেন, আজ আমি আমার বাড়ির দেয়ালের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। কথাটি শুনিয়া পুলকে যেন হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত শহরটি পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইল।"

লক্ষ করবার বিষয়, ড: দাশগুপ্তের রচনায় সুস্পষ্ট সমালোচনা থাকলেও কারও বিরুদ্ধে বিষোদ্গার নেই। অথচ তাঁর লেখায় বিদ্যুৎ চমকেরও অভাব নেই। আর উদ্ধৃতি দিতে তিনি প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের অদ্ভুত সমাবেশ করেন অকৃপণভাবে। যেমন — ওই 'সাধের স্বপ্নে'ই আছে — "আলাপ করিয়া বুঝিলাম ভদ্রলোক কোনও একটি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক। বলিলেন কলেজ এখন পার্টির কেল্লা। পার্টির পরিচালিত ইউনিয়ন কলেজ চালায়। কোনও কলেজের নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। অধ্যাপক নিয়োগের জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশনের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই ছেলেমেয়েরা এই অবস্থার অবসান ঘটাইতেছে।

"আমি বলিলাম রাজনীতি ক্ষেত্রে কিছু সৎলোক অবশ্যই আছে। তিনি বলিলেন এই ক্ষেত্রে সজ্জনও ক্রমে স্বার্থপর হইয়া পড়েন। এই কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির নাই। এই প্রথমে এক ইংরাজ কবির কয়েক লাইন শুনাইলেন:

"Ambition comes behind the unobservable
Sin grows with doing good...
For those who serve the greater cause may make
the cause serve them.

"আমার ইংরাজি সাহিত্যে বড় প্রবেশ নাই। অথচ ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া একটি কোটেশান উপস্থিত করিবার ইচ্ছা হইল। আমার প্রিয় কবির একটি লাইন উচ্চারণ করিলাম: 'যারা অন্ধ, সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।' ভদ্রলোকটিও দেখিলাম এই কবির ভক্ত। তিনি 'অদ্ভুত আঁধার এক" কবিতাটির শেষ চার লাইন বড় সুন্দর আবৃত্তি করিলেন।

'যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়॥'

শুধু কোটেশান তুলে দিয়েও তীব্র তীক্ষ্ম শরাঘাতে ডঃ দাশগুপ্তকে অতুলনীয় বলা চলে।

ড: দাশগুপ্তের রসরচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে 'গৃধ্র বায়স কথা,' 'ভুষণ্ডী কাক উবাচ', 'চিত যেথা লজ্জাশূন্য' প্রভৃতি বর্তমান গ্রন্থে নেই। ব্যক্তিজীবনে তিনি রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি না করলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তথ্য প্রমাণাদি এমন নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন যা কেবল তাঁর মতো প্রাজ্ঞ এবং গবেষকের পক্ষেই করা সম্ভব। তাই 'অলীক সংলাপ' কেবল রসরচনার সংকলন না হয়ে নানা দুষ্প্রাপ্য তথ্যসম্পদের এক আকর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। খুবই সংক্ষেপে তার কিছু নিদর্শন তুলে দিচ্ছি:

'অলীক সংলাপ' গ্রন্থের ৩৯টি রচনার অনেকগুলির নামেই তার বিষয়বস্তুর পরিচয় পরিস্ফুট। যেমন — মার্কস-মুচিরাম সংবাদ, মার্কস-লেনিন সংবাদ, রবীন্দ্রনাথ-লেনিন সংবাদ, মার্কস্-স্ট্যালিন সংবাদ, প্রমোদহৃদয়-ক্রীড়াপ্রাণ সংবাদ, দেশবন্ধু-আত্মবন্ধু সংবাদ, আশুতোষ-আলোকভচুং সংবাদ, অ্যাডাম স্মিথ-কার্ল মার্কস সংবাদ। স্বেশ্বর-মার্কস সংবাদ, ট্রটস্কি-স্ট্যালিন সংবাদ, হেগেল-মার্কস্ সংবাদ; নীলকমল-লালকমল সংবাদ, গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ সংবাদ, মার্কস-মস্তান সংবাদ, গুরু-শিষ্য সংবাদ, মার্কস-গান্ধী সংবাদ, উপাচার্য-ছাত্র সংবাদ, মেষ-শৃগাল সংবাদ, সম্রাট-শিক্ষক সংবাদ, শ্রীঅরবিন্দ-সুভাষ সংবাদ, আশুতোষ-গণতোষ সংবাদ। এই একুশটি বাদে আরও আঠারোটি অন্য গল্প আছে।

এতে দেখা যায় মার্কস, লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্টালিন প্রভৃতি যে সকল বিদেশি রাজনৈতিক নেতাদের কথা বলা হয়েছে আমরা দৈনন্দিন জীবনেও তাঁদের বিষয়ে শুনতে পাই। অথচ তাঁদের প্রকৃত পরিচয় অনেকেই সম্যক অবহিত নই। গ্রন্থকারও এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন বলেই জানেন, — 'ডিক্সনারি অব ফিলজফি' গ্রন্থে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।... হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম বলে কোনও মানুষ পথ সৃষ্টি করেন না। (লেনিন তাই নিজে কোন পথ সৃষ্টি করেননি)। (পৃ: ১৪)। পঞ্চাশ খণ্ডে প্রকাশিত লেনিন-রচনাবলীর মধ্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ নাই কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় যে মাতামাতি হয়েছিল তেমন অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য অনেক আগেই লিখিত লেনিনের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ নভেম্বর 'নোভায়া ঝিজন' পত্রিকায় লেনিন লেখেন "Down with Literary Superman! Literature must become part of the common cause of the proletariat' (লেনিনের ধারণা বোধহয়) রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনাই শ্রেণী সংগ্রামে ক্লান্ত শ্রমিকের হাতে কোনও অস্ত্র তুলে দেয়নি। (পৃ.১৯)

১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'One Step forward, Two





Steps Back' পুস্তকে লেনিন পার্টি হতে ডেমোক্রাসিকে বিদায় দিলেন। স্ট্যালিন সেই নীতিকেই দৃঢ় করেন। (পৃ.৬৭)। F. Beck & W. Godin ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'Russian Purge and the Extraction of Confession' গ্রন্থে স্ট্যালিনের কর্মপদ্ধতির যে বর্ণনা করেন তাকে স্ট্যালিন পুঁজিবাদী জগতের চক্রান্ত বলে উড়িয়েদেন। তার পাঁচ বছর পরেই ক্রুশ্চেভ ষ্টালিনের বিষয়ে মন্তব্য করেন 'a fabricator of dirty and shameful cases'. (পৃ.৬৯)।

১৮৫৭-৫৮ সালে 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রস্তুতি হিসাবে মার্কস যে সাতখানি নোট বুক লেখেন তাহা হারাইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ ১৯৫৩ সালে মূল জার্মানে উহা প্রকাশিত হয়। মার্টিন নিকোলসকৃত ইহার ইংরাজি অনুবাদ ৮৯৮ পৃষ্ঠার "Grundrisse' নামে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। ...প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের অনন্য মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মার্কস এই গ্রন্থে বলিতেছেন — Why should not the historic childhood of humanity, its most beautiful unfolding exercise an eternal charm? এখানে যেন সাহিত্যের ইকনমিক ভিত্তির তত্ত্ব একেবারে ভাসিয়া গেল। মার্কসবাদের অনেক কথাই মার্কসের অন্তরের সংবাদে এই ভাবে ভাসিয়া যায়।" (পৃ.৮২)

"রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রিশ খণ্ডেই সমাপ্ত আর গ্যেটের সমগ্র রচনা একশত তেতাল্লিশ খণ্ডে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে পত্রগুলিই সংগৃহীত হইয়াছে পঞ্চাশ খণ্ডে।" (পৃ:৯০)।

"১৮৫৩ সালের ১০ জুন লণ্ডনে বসিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে মার্কস যে প্রবন্ধ লেখেন তা New York Daily Tribune পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি মন্তব্য করেন — 'England is causing a social revolution in Bengal' (পৃ:৯৩)। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত মার্কস-এর Notes on Indian History' গ্রন্থে বাঙালির কথা নাই। যে হিউম্যানিজমের আদর্শ লইয়া ইউরোপের এত গর্ব সে আদর্শের প্রথম প্রবক্তা যে এক বঙ্গীয় কবি তাহা আমি বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত গ্রন্থে পাই নাই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই' কথাটি যেদিন শুনিয়াছিলাম সেই দিন আমার চোখ দুটি আর্দ্র হইয়াছিল। (পৃ: ৯৫) ...'মস্তান মার্কসবাদেরই সৃষ্টি।' (ঐ পৃষ্ঠা)।

"শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'The Ideal of Human Unity গ্রন্থে সোভিয়েট 'Intolerant State এবং 'Police State বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মার্কসবদীরা শ্রীঅরবিন্দের এই কথার উল্লেখ করেন না। (পৃ: ১০৮)। ...সোভিয়েট দেশের মানুষ নয়, তার কম্যুনিস্ট পার্টিই ছিল প্রধান বিবেচ্য। তাই দেখা যায় — "সুপ্রিম সোভিয়েটের সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের নবম কনভেনশন ১৯৭৭ সালের ৭ অক্টোবর যে সংবিধান অনুমোদন করেন তাতে ছয় নম্বর আর্টিকেলটি..এই; "The leading and guiding force of Soviet society and the nucleus of its political system, of all the State organisation and public organisations is the Communist Pary of the Soviet Union. The CPSU exists for the people and serves the people." (পৃ: ১১২)

এই রকম বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। কেবল হাস্য রসসৃষ্টিতেই তার পরিধি সীমিত নয়।

■ **অলীক সংলাপ** — রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত — প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স্, কলকাতা-১৩ / ৪৫.০০

# আধুনিক বাংলা কবিতায় পল্লীজীবন (১৯১৪–১৯৪৭)

কামাল হোসেন

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় গ্রামীণ জীবনের প্রভাবকে এই গ্রন্থে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন রাজশাহীর শাহ মখদুম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তসিকুল ইসলাম। বস্তুত এটি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ। যথেষ্ট পরিশ্রম ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। সন্দেহ নেই, এই বিশেষ কালপর্বে বাংলা কাব্য, বাঙলার সমগ্র সাহিত্য এক যুগ থেকে অন্য যুগে পদার্পণ করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলা কবিতায় রোমান্টিক গীতিকবিতার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম, কবিতায় জাতীয়তা, ঐতিহ্য-গৌরব, অতীতের বীরত্ব মহিমা প্রভৃতির স্থানে সরল সহজ প্রকৃতিপ্রীতি দেখা দিতে আরম্ভ করল। বিহারীলাল থেকে শুরু করে এই ভাবে নগরবাসী কবিদের মধ্যে এক ধরনের পল্লীতৃষ্ণা দেখা দিতে লাগল।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এক এবং অদ্বিতীয়, একথা হাজার বার উচ্চারণেও ক্লিশে হয়ে যায় না। তাঁর কবিতায় এবং আরও নানাবিধ রচনায় প্রকৃতির ভূমিকা অতি বিস্তৃত। একদিকে পদ্মা, অন্যদিকে কোপাই, একদিকে শিলাইদহ, কালিগ্রাম, পতিসর, শাহজাদপুর, অন্যদিকে ভুবনডাঙ্গা, বল্লভপুর,

সুকুল, একদিকে পূর্ব বাংলার ভিজে মাটি জোলো আবহাওয়া, অন্যদিকে পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ খোয়াই, তপ্ত হাওয়া — বাংলার গ্রামের এই বিস্তৃত বাস্তবতার মধ্যে এই মহান রোমান্টিক কবির আজীবন অবস্থান।

একথা অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা কবিতা গ্রামীণ ভাবনায় এমন এক অসাধারণ গভীরতা লাভ করল, যার ফলে বাংলা কবিতার চেহারা একেবারেই বদলে গেল। আমরা জানি, এই শতাব্দীর শুরু থেকে চারের দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যে বাংলা সাহিত্য এগিয়েছে। অনেকে তাঁকে অনুসরণ করেই অন্ধভাবে পথ হেঁটেছেন, অনেকেই ঘোড়া ছুটিয়েছেন স্বতন্ত্র ভূমির সন্ধানে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শক্তিমান, কেউ মাঝারি ক্ষমতার এবং বেশির ভাগই স্বল্প ক্ষমতার — সাহিত্যের চলমান ইতিহাসে যেমনটা ঘটে থাকে।

ড. ইসলাম প্রথমেই রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের কবিগোষ্ঠীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁরা হলেন : প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়।

টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কবি, গীতিকার ও নাট্যকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কণিকা' (১৮৯৯) কাব্যটি তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রমথনাথের প্রায় সব কাব্যগ্রন্থেই পল্লীবিষয়ক কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির নিখুঁত ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি একটুও কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'পল্লীর নিসর্গ সৌন্দর্যের কবি, পল্লীজীবনের কবি নন।' গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার ছবি তাঁর কাব্যে খুব একটা দেখা যায় না। তাঁর রোমান্টিক মন প্রেমের আকুতির ও সৌন্দর্য পিপাসায় মুখর হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী পল্লীপ্রকৃতিকে ভালবেসেছেন, সেই সঙ্গে পল্লীর দীন-দুঃখী ব্যথাতুর মানুষকেও গভীরভাবে ভালবেসেছেন। ঘরোয়া গ্রামীণ জীবনের আলেখ্যগুলি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর 'শোলক বলা কাজলা-দিদি'কে কি ভোলা যায়? তাঁর এসব কবিতায় আন্তরিকতা আছে, তবে তা অনেকখানি দূর থেকে দেখার মত রোমান্টিক। শহুরে মন নিয়ে গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যতটুকু দেখা যায়, তাই তিনি দেখেছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃতিকে সহজ-সরল ও সাদামাটাভাবে তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন। গ্রামের দিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে তিনি তাকাননি। ব্যাকুলতা বা অস্পষ্টতা বা সৌন্দর্যস্বপ্নে মগ্ন থাকেননি।

কালিদাস রায় নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে পল্লীজীবনের কবিতাও রয়েছে। গ্রামের মানুষের নানা অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন। কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের পল্লীপ্রীতির অনেকাংশ জুড়ি রয়েছে বৈষ্ণবীয় আবেগ, এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

ড. ইসলাম এরপর রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তরণের সাধনায় নিমগ্ন কয়েকজন কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যাঁরা হলেন : প্রথম চৌধুরী, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম। প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, কথাসাহিত্যিক ও সুদক্ষ সম্পাদক। তাঁর কাব্যগ্রন্থ মাত্র দুটি। কবিতার সংখ্যা কম হলেও তাঁর জীবনদৃষ্টি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তিনি পল্লীকবি নন। পরবর্তীকালের আধুনিক কবিরা পল্লীজীবন ও প্রকৃতি বিষয়ে ভাবব্যাকুলতার পরিবর্তে যে এক ধরণের তির্যক দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন, বলা যেতে পারে, তার সূচনা প্রমথ চৌধুরীর কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভট অভিনবত্বের অধিকারী। পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনচিত্র তাঁর বহু কবিতায় স্থান পেয়েছে।

দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য হল সমকালীন অনুজ কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনি সর্বপ্রথম সার্থকভাবে রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভাব প্রকাশ করেছেন। একজন শিক্ষিত নাগরিক কবিও পল্লীগ্রামের মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে ভাবালুতাবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল ও সহৃদয় মনোভাব নিয়ে কাব্যচর্চা করতে বা কবিতা লিখতে পারেন — যতীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণ তথা নিপীড়িত নির্যাতিত কৃষক ও খেটেখাওয়া দিন-মুজুরের গভীর মর্মবেদনাকে তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

মোহিতলাল মজুমদার উচ্চ-মার্গের জীবন-দর্শন নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেখানে পল্লী-প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের প্রবেশ খুব একটা নেই বললেই চলে। রবীন্দ্র-ভাববৃত্ত থেকে বাংলা কবিতাকে দেহবাদী প্রেমচেতনা এবং সংরাগতপ্ত সৌন্দর্যতৃষ্ণার সাহায্যে তিনি বাইরে আনতে চেয়েছেন। ড. ইসলাম সম্ভবত তাঁকে আলোচনার মধ্যে রেখেছেন এই জন্য যে আলোচ্য কালপর্বে প্রথম দিকে তিনি একজন প্রধান কবি। নিছক অবসর বিনোদনের মতো কিছু কিছু পল্লীচিত্র কীভাবে এই নাগরিক কবির কবিতায় স্থান করে নিয়েছে, পাঠক ও সমালোচকের কাছে সেটাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়।

কাজী নজরুল ইসলামের কবি-ব্যক্তিত্ব তাঁর সৃষ্টিকর্মের অভিনবত্বে উজ্জ্বল এবং স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত। সামাজিক অবক্ষয়,



রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষক অত্যাচারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহ। পাশাপাশি তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে এক চিরকালের প্রেমিক সত্তা। তবু মনে হয়, সরাসরিভাবে তাঁর কবিতায় পল্লীজীবন ও প্রকৃতিপ্রীতির বন্ধন তেমন সুদৃঢ় নয়। প্রকৃতিমূলক অধিকাংশ কবিতায় তিনি তাঁর নিজ জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতি এবং প্রিয়া তাঁর অনেক কবিতায় একাকার হয়ে মিশে গেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কিছু কবিতায় কৃষক সমাজ তার বাস্তব রূপ নিয়ে উপস্থিত থেকেছে। কৃষক-রাখাল-মাঝিদের রূপ-কল্পনায় লোকায়ত বোধ যেমন তাঁর বিভিন্ন গানের সারি-বাউল-ভাটিয়ালির সুরে মিশে যায়, তেমনই তাদের বাস্তব দারিদ্র্য ও পীড়িত রূপও ঠিকই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর সামাবাদী রাজনৈতিক ভাবনা পল্লীজীবনবোধের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে একাকার হয়ে যায়। নাগরিক মননের অধিকারী এই কবির অসংখ্য গানের কথায় ও সুরে গ্রাম বাংলার নদী-মাটি-বাতাস নিজস্ব আস্বাদ সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসে।

ড. ইসলামের পরবর্তী আলোচনা বিশিষ্ট ধারার দুই কবিকে নিয়ে : জসীমউদ্দীন ও বন্দে আলী মিয়া।

জসীমউদ্দীনের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : 'জসীমউদ্দীনের কবিতার ভাষা, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।' বস্তুত গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির ভালবাসায় মুগ্ধ মন নিয়েই তিনি শহুরে আধুনিকতার প্রায় প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আবহমান বাংলার গ্রামকে আধুনিক সাহিত্যে জায়গা করে দিয়েছেন। বাংলা কবিতায় বিষয় নির্বাচন ও কাব্যশৈলীর নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি একক সাধনায় নিজস্ব ভুবন সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন — যে ভুবনের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হিসাবে বিবেচিত। অবহেলিত পল্লীর সমাজ ও জীবন লোকসাহিত্য ও সঙ্গীত থেকে কাহিনী, তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে আধুনিক মনোভাঙ্গিতে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। বালাড-ধর্মী 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' লিখে সমকালীন গীতি-কবিতার রাজ্যে এক নবদিগন্ত এনেছেন।

বন্দে আলী মিয়ার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থ। পদ্মা চরের মোহনীয় দৃশ্যাবলী ও চরের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি তিনি খুব সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন। পল্লীপ্রকৃতির রূপ ও গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণকে তিনি লোক-কবিতার ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করেছেন এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, "তথ্যগতভাবে এটা স্মরণীয় যে জসীমউদ্দীন নন বন্দে আলী মিয়াই এই পরিমার্জিত গ্রামীণ গাথা-কবিতার প্রথম সূত্রধারক।"

ড. ইসলাম এরপর আরও এগারো জন গৌণ কবির পল্লী কবিতার আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে দু'জন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও সুফিয়া কামাল। এই সব কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ইসলাম দেখিয়েছেন, আলোচ্য কালপর্বে বাংলা কাব্য জগতে পল্লীকবিতা কত বিস্তার লাভ করেছিল এবং কত বিচিত্র রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল।

বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতির এই পর্যালোচনা করার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে সেই বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দিকেও আমরা একটু দৃষ্টিপাত করতে পারি। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলাদেশেও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সে সময় ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে : ১৯০৫-১১ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯২১-২৩ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ১৯৩০-৩৩ আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলন, এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ধারাবাহিক বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ও সংগ্রাম, মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন — সেই বিশেষ সন্ধিক্ষণের জটিল সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার গ্রামীণ জীবনও নিশ্চয়ই টালমাটাল হচ্ছিল। পাশাপাশি আরও ছিল জমিদার-প্রজার লড়াই, গুণ-সালিশী বোর্ডের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর সময় থেকে প্রাত্যহিক জীবনে ভোগ্যবস্তুর রেশনিং, কাপড়-কেরোসিনের অভাব গ্রামীণ জীবনকে কম প্রভাবিত করেনি। ১৩৫০-এর মন্বন্তর এবং পরের কয়েকটি বছর ধরে বস্ত্র দুর্ভিক্ষ শহর ও গ্রামের মানুষকে সমানভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের শেষ নিদর্শন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ১৯৪৬ সাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ঘৃণা-অবিশ্বাস ও রক্তপাতের অশুভ ছায়া থেকে বাংলার গ্রামও রেহাই পায়নি। গ্রামের শান্তির নীড় যে প্রবলভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, ১৯১০-৪৭-এর মধ্যে, বিশেষ করে শেষের বছরগুলিতে তার যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে — ড. ইসলামের গবেষণাগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না, একমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া বাংলার পল্লীপ্রীতির কবিতায় তার আর তেমন কোনও উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ নিদর্শন নেই।

বস্তুত জীবনের গতিপ্রবাহের মতো কবিতা ও সাহিত্যও তার নিজস্ব গতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে পরবর্তী কোনও হিরণ্ময় সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলে। আর তাই এই গবেষণাগ্রন্থের আলোচ্য সময়কালের নির্দিষ্ট কবিদের তালিকার

বাইরে চারের দশক থেকেই আমরা একদল নতুন কবিদের দেখা পেলাম—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—যাঁদের কবিতায় আধুনিকতার ধারাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ড. ইসলামের চমৎকার আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বোধহয় জীবনানন্দ দাশেও একসময় পৌঁছে যেতে পারি। তাঁর 'রূপসী বাংলা' এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তো বটেই অন্যান্য কাব্যেও বাংলার পল্লী বেশ বিস্তৃত ভূমিকায় উপস্থিত। তবে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলার পল্লীর রূপময় চিত্র অঙ্কনে যখন তাঁকে বিহ্বল মনে হয়, তখনও তাঁর ভিতরে-ভিতরে সূক্ষ্মভাবে এবং গভীরভাবে নাগরিক মনন সক্রিয় থাকে। অত্যন্ত আধুনিক এবং একান্তভাবেই নাগরিকবোধের এই কবির পল্লীচেতনাও আসলে তাঁর আত্মদর্শনই। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে একমাত্র আল মাহমুদকেই বোধহয় বলা যেতে পারে, জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দীনের যুগল উৎস থেকে তাঁর জন্ম।

ড. ইসলামকে অনুরোধ, তাঁর গ্রন্থের একটি দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করুন, যার মধ্যে থাকবে 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় গ্রামীণ জীবন' শীর্ষক আর একটি দীর্ঘ তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ মননশীল আলোচনা।

■ **রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে গ্রামীণ জীবন**—ড. তসিকুল ইসলাম / বাংলা একাডেমী, ঢাকা / ৯০.০০

# নাতনি বৃত্তান্ত

## দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

“এসো, অহনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই”—এই বাক্যটি দিয়ে এই কাহিনীর শুরু। অহনা নামে যে-মেয়েটির সঙ্গে ৭০ পাতা জুড়ে আমাদের পরিচয় হয় সে মুম্বাইবাসী এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা। তাঁর মা-বাবা বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে যুক্ত। একটি কাজের লোকও আছে। কিন্তু আসলে এই কাহিনীটি অহনার সঙ্গে তার দিদিমা, যাকে সে আম্মা বলে ডাকে তার সম্পর্কের কাহিনী।

আম্মা অহনাদের বাড়িতে এসেছেন কিছু দিনের জন্য আর এসেই জড়িয়ে গেছেন অহনার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। সেই জীবনটা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের আর পাঁচটি সন্তানের চেয়ে যে খুব একটা পৃথক তা মনে হয় না। বাবা এবং মা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তার মধ্যে যে কোনও শিশুই একা বোধ করতে বাধ্য।

আম্মার আগমন সেই একাকিত্ব ঘোচাতে অনেকটাই সাহায্য করে এবং সেই জন্যই আম্মা অধিকার করে থাকেন অহনার অনেকটা সময়। তাই স্নো হোয়াইট নাটকে অহনা কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবে তা নিয়ে যেমন আলোচনা হয় তেমনই আচার খাওয়ার ফন্দিও তৈরি হয়। আবার 'মহাভারত' পড়াও চলে পরম উৎসাহে। 'মহাভারতের' একজন মনোযোগী শ্রোতা অহনা, কারণ সে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনীতে ছোটখাটো ভুল ধরে ফেলে। সে মহাভারতের কাহিনী নিয়ে মা-বাবার পরীক্ষা পর্যন্ত নেয়।

অবশ্য শুধু 'মহাভারত' নয়, অহনার জগতের মধ্যে আছে 'চণ্ডালিকা'ও। কার্ড-বোর্ডের টুকরো আঠা দিয়ে সেঁটে তৈরি হচ্ছে চণ্ডালিকার বাড়ি। আছে মণিপুরী নাচ। সেই সঙ্গে জাপানি রূপকথা। তোত্তোচান নামে এক জাপানি শিশুর কাহিনী বইয়ের বেশ কিছুটা অংশ এবং অহনার মনের অনেকটা জুড়ে থাকে।

এই সবের মধ্যে দিয়েই একদিন আম্মার বিদায় নেওয়ার সময় এসে যায়। তবে ইতিমধ্যে অহনার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়। সেই উপলক্ষে আমরা অহনার মুখে একটা কথা শুনি যা হয়ত সব শিশুরই মনের কথা—“জন্মদিন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় কেন?” অহনাকে একটু পৃথক বলে মনে হতে আরম্ভ করে যখন সে তার মাকে “যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে” গানটি গাইতে শুনে বলে ওঠে, “তুমি এই hymn টা গেও না... আমার ভয় করছে”।

অহনার আব্বু বা মাম্মা যদিও খুব বেশি সময় দিতে পারেন না সন্তানের জন্য, তবু সে যাতে প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে এবং বড় হয়ে ওঠে এক সংস্কারমুক্ত পরিবেশে সেদিকে নজর দিতে ভোলেন না। তাই অহনার স্কুলের ভর্তির ফর্মে ওর কী ধর্ম তা লেখেন না। আব্বু জানিয়ে দেন, “আমরা চাই ও বড় হয়ে নিজের ধর্ম বেছে নেবে।” এমন মা-বাবার সংখ্যা অনেক নয়।

গৌরী আইয়ুব সহজভাবেই শুনিয়েছেন অহনার কাহিনী। ছোট ছোট আঁচড়ে বেশ ভাল ফুটে উঠেছে কিছু ছবি। দেবব্রত ঘোষের অলঙ্করণ বইটিকে করেছে আরও আকর্ষক। ছোটদের ভাল লাগবে সব মিলিয়ে। □

■ **এই যে অহনা**—গৌরী আইয়ুব / প্যাপিরাস, কলকাতা-৭০০ ০০৪ / ২০.০০



# বাংলা ব্যাকরণচর্চা

## অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তার সূচনালগ্নে যেসব কর্মসূচি নিয়েছিল তার অন্যতম ছিল বাংলা ব্যাকরণ রচনা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছিলেন খাঁটি বাংলার কোনও ব্যাকরণ নেই। হয় সংস্কৃত আদর্শে কিংবা ইংরেজি মডেলে বাংলার ব্যাকরণ লেখা হয়ে থাকে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতের কন্যাস্থানীয় এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিও তিনি কটাক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে আর সব নব্যভারতীয় আর্যভাষার মতোই বাংলা ভাষা আত্মপ্রকাশ করে। তখন প্রাকৃতের শেষ স্তর অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ থেকে এইসব ভাষা জন্ম নিয়েছিল। পূর্বী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের উদ্ভব। সেই মাগধী অপভ্রংশ ভেঙে বেরিয়ে এল বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া ও মৈথিলি ভাষা। তারপর আদি ও মধ্য পর্যায় পেরিয়ে আজকের আধুনিক বাংলাভাষাকে পেয়েছি। অবশ্য ভাষা সৃষ্টির এই ধারায় স্বাভাবিকতা অনেকখানি ধাক্কা খেয়েছে গড় উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সাধুগৌড়ীয় ভাষা নির্মাণের উদ্যমের ফলে। যে ভাষারীতি ও বানান আপন নিয়মে গড়ে উঠছিল সেখানে জোর করে সংস্কৃতায়ন করা হয় ওই সময়ে। আর তারই জের টেনে চলেছি আমরা আজ অবধি। সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ আজও লিখে ওঠা গেল না তাই।

অবশ্যই চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ধরা আছে বাংলা শব্দতত্ত্ব আর বাংলা ভাষা পরিচয় গ্রন্থে। যোগেশচন্দ্র রায় একটি ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা করেন। সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন ঐতিহাসিক ব্যাকরণে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেও খাঁটি বাংলা ভাষার জন্য বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক ব্যাকরণের কিছু কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। সুকুমার সেন তাঁর নিজের মতো করে চলিত বাংলায় ব্যাকরণ রচনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে এনিয়ে আলোচনা করেছেন পবিত্র সরকার। তাঁর পকেট বাংলা ব্যাকরণ বইখানি অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা অসম্পূর্ণও বটে। একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের প্রত্যাশা জাগিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিভূষণ চাকীর বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ। এটি আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। জ্যোতিবাবু দীর্ঘদিন ব্যাকরণচর্চায় নিরত। তিনি ইংরেজিসহ কয়েকটি পাশ্চাত্যভাষা সেই সঙ্গে সংস্কৃত পালি হিন্দি উর্দু আবার আরবি ফারসিতেও ব্যুৎপন্ন। তাই এধরনের গ্রন্থ রচনায় তাঁর অধিকার অবিসংবাদিত।

জ্যোতিবাবু তাঁর গ্রন্থে প্রথাগত ব্যাকরণ অংশে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটিই বই-এর বড় অংশ জুড়ে আছে। তার আগে প্রবেশক শীর্ষক অংশে ভাষা, ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ পরম্পরা, বাংলা শব্দভাণ্ডার, বাগ্‌বিধি, সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। বই-এর অন্য ভাগের আলোচ্য হল নব্য ব্যাকরণ চিন্তা। এই শেষ ভাগটি অবশ্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবি করে, এখানে পাঁচটি অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে এসেও জ্যোতিবাবুকে পদে পদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম শেখাতে হয়েছে। যেমন ণত্বষত্ব, সন্ধি, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ, বাচ্য, কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ, সমাস প্রভৃতি। আর বারেবারে তাঁকে বলতে হচ্ছে যে চলিত বাংলার জন্য এগুলির তেমন প্রয়োজন নেই। চলিত বাংলায় ণত্বষত্ব মানবার সুযোগ কোথায়? সংস্কৃত সন্ধিসূত্র কি বাংলায় প্রযোজ্য? কারক, সমাস প্রভৃতির বাংলায় কতটা প্রয়োজন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং অব্যয় অধ্যায় দুটিতে জ্যোতিবাবু বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা করেছেন। শব্দদ্বৈত অধ্যায়ে আরও অনেক কথা বলা চলতে পারত।

তবে এ বই-এর বড় গুণ হল বক্তব্য পরিবেষণে সরসতা। ব্যাকরণের বই হলেও তরতর করে পড়ে ফেলা যায়। গোটা বই নানা সরস মন্তব্যে ভরা। কোথাও বলছেন হরি ওম্, কোথাও বা ত্রাহি মধুসূদন। অনেক মজার মজার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। লেখকের নিবিষ্ট ব্যাকরণমনস্কতা গোটা বই-এ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অনেক আলোচনাই কৌতূহল উদ্রেক করে।

তবু যেন মনে হয় এ-বই ফিরে লেখা চাই। জ্যোতিবাবুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে অনেক বেশি। মান্য চলিত বাংলার ব্যাকরণটি তো এখানে ঠিক পাওয়া গেল না। এতকাল যে ব্যাকরণ আমরা পড়ে এসেছি তাই যেন একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা। তিনি কেনই বা সংস্কৃতের উপর এত নির্ভর করলেন? বাংলা ভাষার নিজস্ব চরিত্রটি তেমনভাবে ধরা পড়তে পারল না হয়ত সেই কারণেই। অথচ তাঁর হাতে সেটা হওয়ার কথা ছিল। লেখক নতুন ব্যাকরণচিন্তার প্রসঙ্গ এনেছেন বটে, কিন্তু একটু সাহস করে তো বলতেই পারতেন যে সংস্কৃত মতের কারক বিভক্তি, সমাস, সন্ধি প্রভৃতিকে বাংলা ব্যাকরণ থেকে বিদায় দেওয়ার সময় এসেছে। বাংলা বাগ্‌বিধি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষা থেকে শব্দ, এমনকী বাক্যবিন্যাস, আত্মসাৎ করার যে বিশেষ ক্ষমতাটি বাংলার রয়েছে সে নিয়েও

বিচার করা যেতে পারে। এটাই তো একালের চাহিদা। তাই বলতে ইচ্ছে করে: আগে কহো আর।

বাংলা ব্যাকরণচর্চা নিয়ে যে তর্কটা বারবার উঠেছে সেটা যদি এই বইকে কেন্দ্র করে নতুন করে দেখা দেয় তবে বাংলা ভাষার পক্ষে মঙ্গল। আমাদের শব্দসম্ভারে তৎসমের সংস্কৃতত্ব কতটুকু এবং সেজন্য পাণিনি প্রমুখের মুখাপেক্ষী থাকার প্রয়োজন কতটা? আর আমরা কি এখনও নেসফিল্ডের অনুসরণ করে যাব? বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণবিধি গড়ে তোলার স্বরূপটাই বা কী হবে?

আমাদের পাঠ্য তালিকা থেকে সংস্কৃতের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। এর ভাল-মন্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই না। যাঁরা ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য নিশ্চয় পড়ে নেবেন। তবে বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপটি অনুধাবনের জন্য কিছুটা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। বিদ্যালয়ের অন্তিম স্তরে এবং মানবিকীবিদ্যায় স্নাতকপর্যায়ে এর প্রবর্তনের কথা ভাবা চলে। এর ফলে বাংলা ব্যাকরণচর্চা সমৃদ্ধ হতে পারবে। □

■ **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ** — জ্যোতিভূষণ চাকী / আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ / ৭৫.০০

# চারখানি সংকলন ও একটি স্মৃতিচারণ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

**কবিতার কাছাকাছি**

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবৎকালেই তাঁর ষাট বছর বয়সে পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখতে, তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের লেখা সংগ্রহ করে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন সম্পাদকদ্বয় এবং প্রকাশক মহাশয় কিন্তু এরকম একটি সংকলন প্রকাশে তো সময়ও লেগে যায় অনেক — তাই বইটি যখন প্রকাশিত হল ১৯৯৬ এর কলকাতা বইমেলায় — শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজে তা দেখে যেতে পারলেন না! কিছুকাল আগে হঠাৎ তিনি আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে তাঁর গুণগ্রাহী বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং বয়োকনিষ্ঠ খ্যাত স্বল্পখ্যাত বন্ধুগণ ও আত্মীয়বর্গ কী ভাবেন — তাঁর পদ্য ও ততোধিক আলোচিত জীবনযাপন নিয়ে — তা যে তিনি জানতেন না তা নয় কিন্তু চমৎকার একটি সংকলন গ্রন্থের আকারে তার প্রকাশ দেখলে নিশ্চয় তিনি অভিভূত হতেন — বইটি হাতে নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে এখন আমরা যেমন মুগ্ধ, বিস্মিত, কৌতূহলী হচ্ছি।

মাঝেমাঝে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে বিশেষ কবি-লেখকদের উদ্দেশে সম্মান বা স্মরণ সংখ্যার প্রকাশ আমরা দেখেছি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'অনুষ্টুপ'-এর সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা। অশোক মিত্র সম্পাদিত ও সুবর্ণরেখা প্রকাশিত সমর সেনকে নিয়ে তাঁর বন্ধু ও গুণগ্রাহীদের লেখার বিখ্যাত ইংরেজি সংকলন গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উক্ত সংকলনগুলি ছিল ভাবগম্ভীর, রচনা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণমূলক। তাত্ত্বিক প্রবন্ধ ছিল বেশি। সেদিক দিয়ে 'শক্তির কাছাকাছি' একদম অন্য স্বাদের। এখানে কেউ তেমন সিরিয়াস হবার চেষ্টা করেননি দুয়েকজন ছাড়া। আড্ডা বা ঘরোয়া আসরের ঢঙে শক্তিকে নিয়ে যে যার অভিজ্ঞতা বলে গিয়েছেন।

'শক্তির কাছাকাছি' পড়তে পড়তে তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বুধমণ্ডলীর পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়। কে তাঁকে ভালবাসেননি, তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাননি, এ গ্রন্থে কে লেখেননি! তাঁর অতিবিখ্যাত কৃত্তিবাসের বন্ধুবর্গছাড়া লিখেছেন অনিল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষের মতো অভিনেতারা, কুমার রায় ও বিভাস চক্রবর্তীর মতো নাট্যনির্দেশক, গৌতম ঘোষের মতো চলচ্চিত্রপরিচালক, তুষার তালুকদার ও আয়ান রসীদ খানের মতো উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, বিখ্যাত আবৃত্তিকাররা, জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়ার। বইটি একবার একটানা না পড়ে বহুদিন ধরে বারবার পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পুস্তকপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে অবশ্যই রাখতে হবে। কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া বইটির অপ্রচলিত প্রশস্ত আকৃতি, ছবি ও অলংকরণ মনোগ্রাহী।

শেষে একটা কথা বলে রাখা যায় — অধিকাংশ লেখকই শক্তির কবিতার চেয়ে তাঁর বিচিত্র উদ্দাম জীবনযাপন নিয়ে কথা বলেছেন বেশি। কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে জীবনানন্দের পর তিনিই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মৃত্যুর পর এখন নিরপেক্ষভাবে এটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। জীবনানন্দের পর তাঁকে শ্রেষ্ঠ বললে — অন্য সকলকে সরিয়ে রেখেও — আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কোথায় বসাব? তিনি তো জীবনানন্দ ও শক্তির মধ্যবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে ভাস্বর হয়েছেন।

কবি ও কবিতা সংক্রান্ত আলোচনায়, বিচার-বিশ্লেষণে প্রথাসিদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে চিরকালই এগিয়ে এসেছেন কবিরা — যাঁদের অনেকেই আবার অধ্যাপক পণ্ডিত হিসাবেও সুবিদিত। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শঙ্খ ঘোষ,



অলোকরঞ্জন এই ক্ষেত্রে স্তম্ভ বিশেষ। পরবর্তী প্রজন্মের কবিরাও কবিতা নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখছেন — সম্প্রতি এরকম একটি বই পড়লাম — 'মেঠো ইঁদুরের চোখ'। গৌতম ঘোষদস্তিদার এই বইটির প্রবন্ধগুলিতে পঞ্চাশ থেকে আশির দশকের কবিদের কবিতা, কাব্যরুচি ও প্রবণতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কয়েকটি তর্ক তুলেছেন। তিনি নিজে কবি এবং লিট্‌ল ম্যাগের সম্পাদক ফলত কবিদের ভিতর মহলের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা — তাই তাঁর লেখার অন্তরঙ্গতা মনকে স্পর্শ করে। বইটির প্রথম ও মুখ্য প্রবন্ধটিতে তিনি 'কবিতা' ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাদুটির জীবনকাহিনী রচনা করার চেষ্টা করেছেন। বইটির বাকি প্রবন্ধগুলি পড়ে মনে হয় যে পঞ্চাশের কৃত্তিবাস ও শতভিষা গোষ্ঠীর, কবিকুল ও কবিতা তাঁকে বেশি অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করেছে এবং এই কবিদের কথা তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে। পরবর্তী দশকগুলিতে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করে স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন সেই বুদ্ধদেব, ভাস্কর, দেবারতি, রণজিৎ, তুষার, জয়, মৃদুল, শ্যামলকান্তি, মল্লিকা, সংযম, রাহুলদের নিয়েও লেখক যথাযোগ্য আলোচনা করেছেন — এখানেই এই বইটি আলাদা গুরুত্ব পেয়ে যায়।

'কবিতার জন্ম-জন্মান্তর' এবং 'কবির উপন্যাস, উপন্যাসের কবি' ছোটমাপের হলেও দুটি কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধ। প্রথমটির বিষয় কবিদের জনপ্রিয়তালাভ বা জনপ্রিয়তাহীনতা আর দ্বিতীয়টির বিষয় কবিদের উপন্যাস লিখতে যাওয়া। এই দুটি নিবন্ধ পড়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে এ দুটিতে আর যা কিছুই আলোচিত হক না কেন লেখকের মুখ্য উদ্দিষ্ট জয় গোস্বামী অর্থাৎ তাঁর সমবয়সী ও সমযুগের সমস্ত কবিকে ছাড়িয়ে তাঁর বিপুল খ্যাতি এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সমাদর লাভ। জয়ের কবিতার গুণগ্রাহী রূপেই তিনি জয়কে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন যেন তিনি কবিতাকে সস্তা করে না ফেলেন। দ্বিতীয়টি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ হয়ে উঠতে পারত যদি গৌতম শুধু সুনীল ও জয়ের উপন্যাস রচনার পরিসরে আটকে না গিয়ে কবিদের উপন্যাস লেখার বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে স্থাপন করতেন। এখানেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জয় গোস্বামীর উপন্যাস লেখার সমালোচনা করেছেন। গত কয়েক বছরে কবি জয় একাদিক্রমে উপন্যাস-গল্প-ফিচার লিখতে শুরু করেছেন। গৌতম এটাকে ভাল চোখে দেখেননি এবং তিনি তাঁর কবিসত্তার হানি ঘটাচ্ছেন বলে আশঙ্কা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় জয় গোস্বামী শুধু কবি পরিচয়েই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকতে সন্তুষ্ট হবেন, না কি প্রতিষ্ঠানের তথা বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠীর প্ররোচনায় বাৎসরিক উপন্যাস লেখকের ভূমিকাও গ্রহণ করবেন (করেছেন) — তা একমাত্র তিনিই স্থির করতে পারেন বা ইতিমধ্যে করেছেন। এর পিছনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছাড়াও তাঁর নিজের শিল্পীসত্তার তাগিদ থাকতে পারে বই কি। বাইরে থেকে তাঁর বন্ধুরা-অনুজরা এতে মনোকষ্ট পেতে পারেন, তাঁর প্রতিভার অপচয় হচ্ছে ভেবে সমালোচনা ও আশঙ্কা করতে পারেন — এইটুকু মাত্র — কিন্তু আসলে সবই নির্ভর করছে জয়ের নিজস্ব বিবেচনার ওপর। অন্য কারও বিচলিত হওয়া অমূলক।

বইটির লেখককৃত প্রচ্ছদ এক নজরে প্রশংসা করার যোগ্য। কিন্তু একটা অভিযোগ জানাতেই হয় — প্রথম মলাটে কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর প্রধান তিনজন কবির স্বহস্তলিখিত কবিতা ও স্বাক্ষরের সঙ্গে জয়ের কবিতা ও স্বাক্ষর রয়েছে। বিনয় মজুমদারকে সত্তরের কবিদের সঙ্গে পিছনের মলাটে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এটা কি অত্যন্ত বিসদৃশ নয়? বিনয় মজুমদারও কি শক্তি-সুনীল-শঙ্খর সঙ্গে প্রথম মলাটে আসন পাওয়ার যোগ্য নন?

**নাট্য-চলচ্চিত্রকথা**

প্রসিদ্ধ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণা এক বিশেষ জাতের সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। সাহিত্যমূল্য ছাড়াও স্মৃতিচারণা থেকে সেই মানুষটি যে-বিশেষ যুগে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন সেই সময়ের একটা চিত্র তথা ইতিহাস জানা যায়। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'নট-নাট্য-চলচ্চিত্রকথা' এরকম একটি মূল্যবান স্মৃতিচারণা। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালে, মৃত্যু ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে। কলকাতার একটি সাধারণ ছেলে কীভাবে ধীরে ধীরে উৎসাহে উদ্যমে সে যুগের বিখ্যাত থিয়েটারের পত্রিকা 'নাচঘর'-এর সহকারী সম্পাদক ও লেখক এবং পত্রিকার সূত্রে চলচ্চিত্র পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠিত হল — তার বিবরণ জানতে বেশ লাগে। একটি স্কুলপড়ুয়া সুবোধ বালক একদিন কিংবদন্তিপ্রতিম নাট্যকার অভিনেতা অমৃতলাল বসুর সংস্পর্শে এল, তার মধ্যে ভাল ছাত্র হওয়া, পরীক্ষায় বেশি বেশি নাম্বার পাওয়ার বদলে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ গড়ে উঠল ও সে শিল্পের জগতে জড়িয়ে পড়তে লাগল — এ এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। তাঁর জীবনে অমৃতলালের ভূমিকাকে তিনি অতি গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন, তেমনই তাঁর কৈশোর ও যৌবনের বন্ধুদের কথা বলেছেন দরদ দিয়ে — এঁদের অন্যতম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ। চলচ্চিত্র পরিচালক রূপে — বিশেষত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর সার্থক চিত্রায়নের সুবাদে — খ্যাতি জুটলেও তাঁর কৈশোর-যৌবনের ভালবাসা নাটককে জড়িয়ে আবর্তিত হয়েছিল। তাই তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে এই শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার থিয়েটারের একটি জীবন্ত আলেখ্য পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র পরিচালক রূপেও তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ। কিছু ছবির চিত্রনাট্য লিখে, পরিকল্পনা করেও শেষ পর্যন্ত করতে পারেননি কেন — তার বেদনাদায়ক ও কৌতুকপ্রদ বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন আমাদের। এটি ঘটনায় কৌতুকের পরিমান উপচে পড়েছে। কলকাতা পুলিশের এক ইন্সপেক্টর তথা থিয়েটার

হলমালিক স্বপ্ন পান যে কালীঘাটের মা কালী তাঁকে বলছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে নিয়ে একটি ছবি করাতে — 'কদিন ধরে মা ক্রমাগত স্বপ্নে বলছেন, গদাধর চাটুজ্জের ছবি পশুপতি চাটুজ্জে ছাড়া আর কে করবে?' স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি পশুপতিবাবুকে সটান তাঁর অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর মতামতের তোয়াক্কা না করে রিভলভার দেখিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকা কন্ট্রাক্টে সই করিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে মাত্র তিনমাসের মধ্যে ছবি সম্পূর্ণ করে দেবার জন্য জুলুম করতে থাকেন। যদিও অদ্ভুত কারণে পশুপতিবাবু ছবিটি করতে পারেননি — কিন্তু চলচ্চিত্র দুনিয়ায় যে এরকম একজন মাভক্ত-রিভলভারধারী প্রযোজকের আবির্ভাব ঘটেছিল তা নথিবদ্ধ হয়ে থাকল।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-পত্রিকার জগতে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত বিভাব গত বিশ বছরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে। বিভাব পত্রিকার ৬৩ তম শরৎ-শীত ১৪০২ সংখ্যাটি সিনেমার একশো বছর উপলক্ষে বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাড়া দুটি নিবন্ধ লিখেছেন পিনাকী ভাদুড়ী এবং সত্যজিৎ চৌধুরী। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহু আলোচিত ও স্মরণীয় দশটি ছবির চিত্রনাট্য এই সংখ্যার সম্পদ; ছবিগুলি হল — মুক্তি, উদয়ের পথে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, আকালের সন্ধানে, পরমা, তাহাদের কথা, পদ্মানদীর মাঝি এবং হুইলচেয়ার।

সাহিত্যিক-সামাজিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিটি ছবিই গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র শিল্পের বিচারেও ছবিগুলি দেশে-বিদেশে সম্মান সমাদর লাভ করেছিল, বিতর্ক জাগিয়েছিল। চলচ্চিত্র এমন একটি শিল্প ইচ্ছে গেলেই যখন তখন তার স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু মনে ছাপরাখা, ভাললাগা কিংবা সময়-সুযোগের অভাবে দেখতে না পাওয়া কোনও ছবির চিত্রনাট্য যদি মুদ্রিত আকারে হাতের সামনে থাকে মন গেলেই তার পৃষ্ঠা উল্টে কল্পনাকে সজীব করে ছবিটিকে মনের পর্দায় ভাসিয়ে নেওয়া যায়। এই হিসাবে চিত্রনাট্যের প্রকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যম।

সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য এবং সেই ছবি তোলার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে এক্ষণ পত্রিকা বাংলা পত্রিকার জগতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভাবের মতো বিখ্যাত সাহিত্য শিল্প পত্রিকাও চিত্রনাট্য প্রকাশ শুরু করে — এদিক দিয়ে এই সংখ্যাটি হয়েছে অনবদ্য। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রপ্রেমীরা নিশ্চয় ইতিমধ্যে সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নিয়েছেন।

**ছোটদের বই**

চল্লিশ বছর আগে সুবীর রায়চৌধুরী হাবু নামের এক বালক চরিত্রকে কেন্দ্র করে ছোটদের জন্য কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলেন আনন্দবাজার, সত্যযুগ ও লোকসেবক পত্রিকার ছোটদের পৃষ্ঠায়। সেগুলি সংগ্রহ করে দে'জ পাবলিশিং একটি উপাদেয় গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন 'হাবু কেন বই-রাগী' নামে। বইটির নামকরণ থেকেই হাবু চরিত্রের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে যে ছেলেটি বইয়ের প্রতি বিরূপ অর্থাৎ লেখাপড়ায় মতি নেই, বাবা-মা-দিদিদের দুশ্চিন্তার বস্তু। হাবুর নানা কাণ্ডকারখানা এবং তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলি ও পরিবেশের সরস বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে বেজায় হাসতে হয় আর হাসতে হাসতে পড়তে হয়। হাবু না হয় বখাটে, গোবরগনেশ কিন্তু তার বুদ্ধিমান অভিভাবকরা যে তাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ে তার পিছনে কি তাঁদের কোনও দোষ নেই? সবচেয়ে মজাদার লেগেছে 'পাশ করার দুঃখ'। একবার পরীক্ষায় ফেল করার পর পরিশ্রম করে পরেরবার হাবু পাশ করে কিন্তু এ জন্য কেউ তার বিন্দুমাত্র প্রশংসা করে না, তাকে কৃতিত্ব দেয় না। পূর্ণ কৃতিত্ব দাবি করেন একেএকে বাবা, মা, সেজদা আর ছোড়দি। কারণ ফেল করার পর বাবা এক জবরদস্ত গৃহশিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন, মা পরিয়েছিলেন সরস্বতীর স্বপ্নাদ্য মাদুলি, মেজদা মেরেছিল মস্ত চড় আর ছোড়দি জোগাড় করে এনেছিল এক অব্যর্থ নোটবই। তাহলে হাবু আর করলটা কী! গল্পটি পড়তে মজা লাগলেও শেষ করে মনে হয় এটা কি এক বালকের বেদনার গল্প নয়? 'ভোলানাথ ধাম' ছোটদের জন্য লেখা একটি শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য।

প্রকাশক জানিয়েছেন যে এই লেখকের আরও কিছু গল্প এখনও সংগ্রহ করা যায়নি — কারও সন্ধান জানা থাকলে, সংগ্রহ করে দিতে পারলে বইটির পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হবে। এই সংকলনের গল্পগুলি পড়ে মনে হল, বাকি গল্পগুলির সন্ধান পাওয়ার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। □

■ **শক্তির কাছাকাছি** — সংকলনও সম্পাদনা — সমরজিৎ ও ইনা সেনগুপ্ত / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা / ৫০.০০

■ **মেঠো ইঁদুরের চোখ** — গৌতম ঘোষদস্তিদার / স্বর্ণাক্ষর; হাওড়া-১ / ২৫.০০

■ **নট-নাট্য-চলচ্চিত্র কথা** — পশুপতি চট্টোপাধ্যায় / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ৬০.০০

■ **বিভাব (৬৩ তম, বিশেষ চিত্রনাট্য সংখ্যা)** প্রধান সম্পাদক — সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত / ৫০৮ এ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮ / ৭৫.০০

■ **হাবু কেন বই-রাগী** — সুবীর রায়চৌধুরী / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ২০.০০

■ বিতর্ক

# প্রসঙ্গ : 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'

**নজরুল ইসলাম**

আপনার পত্রিকায় (ভাদ্র ১৪০৩) শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃত আমার "বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায় গ্রন্থের 'সমালোচনা' পড়লাম। সমালোচক মহাশয় আমার "বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই অতিকথন, একদেশদর্শিতা ও চটজলদি সিদ্ধান্তের প্রবলতায় ক্লিষ্ট।" এই রায় দিয়ে বলেছেন "তাঁর আলোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। (১) স্বাধীনতার পূর্বযুগে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান সঙ্কটের উথাল-পাথাল, ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ কি সম্ভব? আবার দেশবিভাগের পরবর্তীযুগে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ ও চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ বা প্রত্যাগতির ঢেউ কি পশ্চিমবাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তাভাবনাকে এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে প্রভাবিত করেনি?"

এরকম প্রশ্ন ওঠে কি করে? বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আমি 'সম্পূর্ণ' বিচ্ছিন্ন করে তো দূরের কথা একদমই বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করিনি। গ্রন্থের একদম শুরুতেই আমি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি, "আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক-এ আমি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করেছি। বর্তমান গ্রন্থে আমি ... সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী প্রধান প্রধান কারণগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করেছি এবং সেগুলি কিভাবে দূর করা যায় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ পেশ করেছি।" প্রথম গ্রন্থে আমি বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারেই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এমনকি আমার গ্রন্থে 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' প্রভৃতি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থের শুরুতেও যে 'বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দিয়েছি তাতেও এগুলি স্থান পেয়েছে। তা হলে সমালোচক মহাশয়ের প্রথম প্রশ্নের কারণ কি?

সমালোচক মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন "হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা তো ছিল প্রধানত তথাকথিত শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে তাহলে শূদ্রবর্ণের মধ্যে এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ এল না কেন?

আমি জানি না, সমালোচক মহাশয় শূদ্রদের মধ্যে এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ সত্যিই দেখতেই পাননি; না, দেখেও দেখতে চাননি। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই নমশূদ্র এবং রাজবংশীদের 'হিন্দু ভদ্রলোকদের' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা অজানা থাকার কথা নয়। অজানা থাকার কথা নয় কোন পরিস্থিতিতে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় 'শূদ্রবর্ণের' লোকদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজির অনশনের পরও তাঁদের যুক্ত নির্বাচনে রাজি করানোর জন্য পুনা চুক্তিতে অনেক বেশি আসন সংরক্ষণ দিতে হয়েছিল। মুসলমানদের সংরক্ষণ দিয়ে ১৯২৩-এ করা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ১৯২৬ সালেই বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু 'শূদ্রবর্ণের' লোকদের সংরক্ষণ দিয়ে ১৯৩২ সালের পুণা চুক্তি আজ ১৯৯৬ সালের স্বাধীনতার পঞ্চাশ করেও বাতিল করা যায়নি কেন? সমালোচক প্রশ্ন করেছেন, "হিন্দু সমাজের তলায় পড়ে থাকা শূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গার ইতিহাস গড়ে উঠল কী করে?" কিন্তু অন্য ইতিহাসও তো গড়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে নমশূদ্র ভাগচাষীরা মুসলমান ভাগচাষীদের সঙ্গে মিলে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সমালোচক মহাশয়ের আজানা থাকার কথা নয় যে ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে যশোরের নমশূদ্র এবং মুসলমান বর্গাদাররা বর্ণহিন্দু ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছিল। এগুলো জানার পরও কেন এরকম প্রশ্ন? এরকম প্রশ্নের আর বেশি আলোচনা কাম্য নয়।

তবে সমালোচকের উত্থাপিত আরও কয়েকটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের উগ্র সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিকেও সাম্প্রদায়িক বলতে রাজি নন। তাঁর মতে, 'তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খোলা মনে পড়লে ডঃ ইসলাম যে অর্থ আরোপ করেছেন তা করা যায় না।.... কী গভীর হতাশার আঁধারে এই লেখা শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তা বোঝা দরকার।" অথচ 'ওহাবী'-ফরাজি আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্য তিনি আবুল মনসুর আমেদের আবৃত্তি করা একটি 'পয়ার' উদ্ধৃতি করে মন্তব্য করেছেন এটি কী ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গিপনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

কিন্তু কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পয়ার আবৃত্তি হত তা সমালোচক বিবেচনা করেননি। অন্য সূত্রের কথা বাদ দিলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ওহাবীজ ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

"শিখরা তখন পাঞ্জাবের মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করতো এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম পালনে বাধা দিতো। বিশেষ করে শিখরা আজান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, আর এটাই ছিল মুসলমানদের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সপক্ষে উপযুক্ত কারণ," এই কারণ জানার পর কি সমালোচক মহাশয় বলবেন, "কী গভীর ক্ষোভের আঁধারে এই পয়ার আবুল মনসুর আমেদ আবৃত্তি করেছিলেন, তা বোঝা দরকার"? যদি না বলেন তবে কেন বলছেন যে "কী গভীর হতাশার আঁধারে এই লেখা শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তা বোঝা দরকার'? তিনি দাবি করেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খোলা মনে পড়লে ড. ইসলাম যে অর্থ আরোপ করেছেন, তা করা যায় না।"

আমি উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'সীতারাম' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "রমা আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপন্যার একজন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা — মুসলমানরা কি ছেলে মারে?'

বর্ষীয়সী বলিল, 'তারা কাকে না মারে? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি'?"

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছে, "...এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে এবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।' গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সে রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল 'মুই হেঁদু।"

'সোনা মনে' পড়লে এ লেখা সাম্প্রদায়িক মনে হবে না কেন? একমাত্র মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনে পড়লে এ লেখা অসাম্প্রদায়িক মনে হতে পারে। না হলে নয়।

সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "হজরত মহম্মদ সাম্প্রতিকতম হিসাবে নিশ্চয়ই সর্বশেষ দূত; কিন্তু চিরকালের জন্য সর্বশেষ পয়গম্বর, এ ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তথাপি বর্তমান প্রবন্ধকার এক হিসাবে এই গোড়ামির ব্যাখ্যাকেও মেনে নিতে প্রস্তুত।" আমি জোর দিয়ে বলছি, আমার গ্রন্থের কোথাও এটা মেনে নেওয়া হয়নি। এটা তার স্বপ্নলব্ধ সত্য হতে পারে, গ্রন্থবদ্ধ সত্য নয়। তিনি যদি দয়া করে বলেন, গ্রন্থের কোন অংশটা পড়ে তাঁর এরকম মনে হয়েছে তা হলে সচেতন পাঠকরা সেটা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন।

সমালোচক মহাশয় দাবি করেছেন, 'হিন্দু' সমাজের মধ্যে এখনও অ-সাম্প্রদায়িক শক্তির যে বিপুল সংখ্যাধিক্য আছে, তাতে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে যদি মুসলমান সমাজে কোরানের মৌলিক মূল্যবোধ অনুযায়ী সংস্কার শুরু হয়... তাহলে হিন্দু সমাজে মুসলমানদের প্রতি অনুরাগের আবেগ প্রবল হয়ে উঠবে।" এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত হতে পারে। আমি সেরকম মনে করি না। ফরাজী, তরিকা-ই-মহম্মদিয়া ও ওহাবীদের উদ্দেশ্যই ছিল আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে, তা সমালোচক মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে দেশের ঐক্যের স্বপ্ন বিশ শতকের শুরুতেও অনেক রাজনীতিবিদই দেখেছিলেন। কিন্তু তার পরিণতি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং দেশবিভাগ। প্রকৃত পক্ষে কোনও দেশে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন, এক সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সদ্ভাব স্থাপন এমনকি সাম্প্রদায়িক ভেদভাব হ্রাস করার উপায় সত্যিকার সেকুলার শাসন প্রবর্তন করা। সমালোচক মহাশয় নেহরুর 'বিলাতি যবনে'র সেকুলারিজম আমদানিকে ভুল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেহরুর যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে তা হাঁটি সেকুলারিজমের প্রবর্তন না করা। দেশের লোকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদভাবকে হ্রাস করতে হলে প্রকৃত সেকুলার শাসন প্রবর্তন করতে হবে। □

■ স্মরণে

# সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ্

জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭
মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সহকর্মী প্রয়াত সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ করবার জন্য চতুরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক মশাই আমাকে অনুরোধ করেছেন। প্রথমেই আমি বলতে চাই, প্রয়তি হবিবুল্লাহ একজন অনন্যসাধারণ, ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত নিরহংকারী, সদালাপী, সুপণ্ডিত ও সুরসিক ব্যক্তি হিসাবে তিনি যে কোনও সমাবেশে আকাঙ্ক্ষিত সম্মান পেতেন। ঘরোয়া সমাবেশেও তাঁর বিদগ্ধ বাক্‌পটুতা এবং সূক্ষ্মরসবোধ তাঁকে সেই সমাবেশের মধ্যমণি হিসাবে সব সময়ই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে।

তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি-উর্দু ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং শব্দের প্রয়োগে সময় সময় অসামান্য সূক্ষ্মরোসবোধের পরিচয় দিতেন। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। তিনি বলতেন যে আপনারা আমাকে বুজুর্গ বলে যখন সম্মানিত করবার চেষ্টা করেন তখন আমি লক্ষ করি যে আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে বুজরুক শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলতেন যে একই শব্দ কীভাবে বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণের তফাতে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। তিনি আরও বলতেন যে আমাকে যখন বুজরুক অভিধায় অভিহিত করেন, আমি মনে করি যে আপনারা আমাকে বুজুর্গ বলছেন। পরিশেষে বলতেন, যে-অর্থেই বলুন না কেন, দুই-ই সমান। পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞান তাঁর হাস্য পরিহাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হত।

তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আত্মগোপন করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে দিন কাটিয়েছেন। কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কখনওবা অন্য কিছু বেশে তিনি বিভিন্ন আস্তানায় বিভিন্ন সময়ে কাটিয়েছেন। প্রত্যেকটা চরিত্রের সঙ্গেই তাকে বেশ ভুষায়, আচার আচরণে ও কথাবার্তায় বেশ মানিয়ে যেত। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি সমস্ত ধরনের মানুষের সঙ্গে গভীর ভাবে মেলামেশা করতে এবং তাদের জীবনযাত্রার এবং চালচলনের রীতিনীতি অত্যন্ত সৌহার্দ্যের ও আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন। সব সময়েই তিনি জনগণের যে কোনও অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে যেতে পারতেন। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। কখনও তাঁকে আমরা এমন কোনও কথা বলতে বা আচরণ করতে দেখেনি যাতে তাঁকে দাম্ভিক বা উন্নাসিক বলে মনে করা সম্ভব।

কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। মন্ত্রী ও স্পিকার রূপে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আইনজীবী হিসাবেও তাঁর জনপ্রিয়তার কোনও তুলনা নেই। আইন সহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থকার হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শেষ গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা 'Parpitrators of Perpituaty' একটি অসাধারণ রচনা। সংক্ষিপ্ত আকারে এই উপমহাদেশের বিশেষভাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দুই শতকের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এই রকম মূল্যবান রচনা আমার আর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ বাঙালি ছিলেন। তাঁদের চরিত্রের বহু গুণ প্রয়াত সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়লে যে ধরনের মহত্ব, দৃঢ়তা তথা কোমলতা, রসবোধ ও সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রয়াত হবিবুল্লাহর সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়ে আমি জোর করেই বলতে পারি, সেই সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বোধহয় এই রকমই কতকটা ছিলেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে তিনিও তাঁর আদর্শ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে তাঁর অতি সহজেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের

সম্পর্ক গড়ে উঠত। আরও বহু কথা তাঁর সম্পর্কে বলা যায়। সব কথা বলতে গেলে চতুরঙ্গ পত্রিকার একটি সংখ্যায় হয়ত সংকুলান হবে না।

আমি আশা করব যে মনসুর হবিবুল্লাহ-র মতো মানুষ এই পৃথিবীতে এবং এই দেশে মাঝেমাঝে হয়ত আসবেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম South End School যার নাম Monsoor Habibullah Memorial School হিসাবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিবর্তিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। তিনি যেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারপর তাহই বিশেষ চেষ্টায় সেটি একটি বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে তাঁরই মত সুন্দর আকর্ষণীয় ও শ্রদ্ধেয় চরিত্রের মানুষ ভবিষ্যতে গড়ে উঠবেন — এই কামনাই করি। □

**সলিল গঙ্গোপাধ্যায়**

## সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্ : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

১৯১৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বর্ধমান শহরে সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। স্কুলের ছাত্র থাকাকালনী অবস্থাতেই ১৯২৯ সালে তাঁর পিতা সৈয়দ হামেদুল্লাহর মৃত্যু হয়। তাঁর মাতা হাবিবা খাতুনের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে।

১৯২৬ সালে মনসুর হবিবুল্লাহ্ বর্ধমান টাউন স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলে পাড়ার সময় থেকেই তিনি বর্ধমান জেলায় বন্যা রিলিফ কমিটির সাথে যুক্ত থেকে বন্যাত্রান কাজে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় বর্ধমানে অজয় নদীর বন্যা ছিল প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। টাউন স্কুলের ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্র পড়াশোনা শুরু করেন। সেই সময় রাজনৈতিক সাহিত্যের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৬ সালে আই. এ. পাশ করেন। পরে তিনি ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন ১৯৪০ সালে।

১৯৩৬ সালে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। ওই একই সালে গঠিত হয় ভারতীয় কৃষক সভা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রথমে কিছুদিন ছাত্র ফেডারেশনে কাজ করেন। কিন্তু তখনকার দিনে ওই কলেজে অধিকাংশ যে শ্রেণীর ছাত্ররা পড়াশোনা করত তাদেরকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন কোনও ছাত্র সংগঠনে টেনে আনা ছিল খুবই মুস্কিল, বলা চলে প্রায় অসম্ভব। ধনী পরিবারের ওই সব ছেলেদেরকে তখন ঠাট্টা করে বলা হত 'লালবাবু'। সেই 'লালবাবু' অর্থাৎ ধনী ও খুব সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের বিশেষ কোনও সুযোগ না থাকায় মনসুর হবিবুল্লাহ কৃষক সভার কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়েই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সময় অথবা তার কাছাকাছি সময়ে যে সব তরুণ ও যুবকরা এবং এককালীন সন্ত্রাসবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন মনসুর হবিবুল্লাহ ছিলেন তাঁদেরই একজন।

কৃষক সভায় যোগদান করে কাজ শুরু করার পর প্রথম দিকে তিনি ২৪ পরগণার হাড়োয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। সে সময় হাড়োয়া বাজারের কাছে তাঁদের থাকার জায়গা ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। মনসুর হবিবুল্লাহ সে সময় ওই অঞ্চলে যাঁদের সাথে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল সরকার, নলিনী দে, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মাধ্যমে ফজলুল হকের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং বাগের হাট অঞ্চলে তিনি ফজলুল হকের সঙ্গে নির্বাচনী এলাকায় যান।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় বাংলার মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে ভোট না দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টিকে ভোট দিয়েছিলেন। সে সময় কৃষক সভার নামেই নোয়াখালী কুমিল্লা থেকে সৈয়দ আহমদ খাঁ, ওয়াসিমুদ্দীন প্রভৃতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এভাবে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টিকেই সমর্থন করেছিলেন। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের আগে কৃষক আন্দোলনের এলাকায় ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে আগে মামলা দায়ের করা হয়। যেই সব মামলার ব্যাপারে



মনসুর হবিবুল্লাহ মুজফ্ফর সাহেবের চিঠি নিয়ে ব্যারিস্টার নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত এবং ফজলুল হকের কাছে যান ও তাঁদের সাহায্য লাভ করেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ২৪ পরগণার আবাদ অঞ্চলে যে খাস জমির আন্দোলন, জমিদার বিরোধী ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয় তাতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এইভাবে সেখানে কাজ করার সময় তাঁকে ও বঙ্কিম মুখার্জীকে ১৯৩৭ সালে ওই এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৪০ সালে যুদ্ধের সময় ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি বে আইনি ঘোষিত হলে কলকাতায় কৃষক সভার অফিসের দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত থাকেন এবং পার্টির অনেক গোপন যোগাযোগ তাঁর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। হিটলার কর্তৃক সোবিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত ও জোরদার করার আহ্বান জানায় এবং সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। সেই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও কৃষক সভার সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সরকার অনেকভাবে বাধা প্রদান করতে থাকে। ১৯৪২ সালের মেদিনীপুরে কৃষক সভার কাজে যোগ দেওয়ার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় দুই মাস জেলে আটক থাকার পর তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৪ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলনে সাতাশ বছর বয়সে মনসুর হবিবুল্লাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার আগে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনসুর হবিবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে বর্ধমান জেলার হাট গোবিন্দপুরে কৃষক সভার পরবর্তী প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বিরাট সম্মেলনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণ চন্দ্রযোশী সহ ভারতীয় অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হয় তার মধ্যে ছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক, যা সে সময় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রগতিশীল নাটা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। এছাড়া গণসঙ্গীত, ছায়ানৃত্য ইত্যাদি সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও সাধারণ কৃষকদেরকে তখনকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নতুন ধারার সাথে পরিচিত করে।

মনসুর হবিবুল্লাহ ১৯৪৫ সালে হাটগোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শুধু তাই নয় এর পরবর্তীতে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের সম্মেলনেও তিনি ওই একটি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ পূর্ব কালে তেভাগা আন্দোলনের পুরো সময়টাতেও তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থেকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, ঋণসালিশ বোর্ড গঠন, কৃষকদের ঋণ মওকুফ ইত্যাদি কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আন্দোলন ও ভূমিসংস্কার করার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন 'ফ্লাউড কমিশন' নামে সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। এই ভাবে গঠিত ভূমিসংস্কার কমিশনের কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে একটি মেমোরেন্ডাম বা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সেই মেমোরেন্ডামে বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়। 'ফ্লাউড কমিশন' ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি উচ্ছেদের সুপারিশ করলেও বর্গাদারদেরকে জমিতে স্বত্ব প্রদানের বিষয়ে কোনও সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বর্গাদারদেরকে জমিতে স্বত্ব প্রদানের সুপারিশ না করলেও 'ফ্লাউড কমিশন' বর্গাদারদেরকে অর্ধেকের পরিবর্তে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান করার সুপারিশ করে। কৃষক সভার মেমোরেন্ডামে বর্গাদারদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ ফসল দেওয়ার কোনও দাবি না থাকলেও কংগ্রেস বাঙলাদেশের কোনও কোনও এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে তেভাগার দাবি তোলা হয়। 'ফ্লাউড কমিশন' কৃষক বর্গাদারকে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়ার সুপারিশের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগার দাবিকে নিজেদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং সভা তেভাগার দাবিকে নিজেদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং ১৯৪৩ সালের মহা দুর্ভিক্ষের পর তেভাগা আন্দোলন সারা বাঙলাদেশে সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৪৪ সালে মনসুর হবিবুল্লাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকে তেভাগা আন্দোলন তৎকালীন বাঙলাদেশের ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেন।

তেভাগা আন্দোলনের সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি রেকর্ডকৃত আত্মজীবনীমূলক বর্ণনায় (যা এখনও অপ্রকাশিত) মনসুর হবিবুল্লাহ বলেছেন যে, আন্দোলনকারীদের ওপর মুসলিম লীগ সরকার অনেক নির্যাতন করলেও বর্গাদেরকে এবং সেই সাথে আন্দোলনে নিযুক্ত নেতা কর্মীদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য তাঁরা তেভাগা সম্পর্কিত একটি বিল প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থিত করে। বিলটির আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃত্ব মুসলিম লীগের "সদিচ্ছার" ওপর কিছুটা আস্থা রাখার ফলে আন্দোলনের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ভাব, শৈথিল্য ও বিভ্রান্তি

দেশ৷ দেয় এবং তার পরিণতিতে আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় যে কথাটি ওই স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেছেন তা হল, মুসলিম লীগের প্রভাবে মুসলমান কৃষকদের একটা অংশ সরাসরি তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও মুসলমান কৃষকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর অমুসলমান কৃষকদের সাথে একযোগে ও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেক নির্যাতন তাঁরা সহ্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পুলিশের গুলিতে শহীদও হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ও বাঙলা বিভাগের পর বর্ধমান শহরের ইচ্ছা বাজারে কৃষক সভার ও কমিউনিস্ট পার্টির পৃথক পৃথক বর্ধিত কেন্দ্রীয় বৈঠক হয়। সে সময় সাজ্জাদ জহীরকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় মনসুর হবিবুল্লাহ তার সদস্য হন। সেই কমিটি অবশ্য কার্যত প্রথম থেকেই নিষ্ক্রিয় থাকে এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়। সাজ্জাদ জহীর অল্পদিন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে থাকার সময় একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ জেনারেল আকবর, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ প্রভৃতির সাথে একই সময় গ্রেফতার হন। সেই মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার পর তিনি ভারতে ফিরে যান।

মনসুর হবিবুল্লাহ পূর্ব বাঙলা পার্টির পার্টি কমিটির সদস্য ও পূর্ব বাঙলা কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। সে সময় তাঁর কাজের প্রধান এলাকা ছিল উত্তর বাঙলার রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলায়। এই ভাবে কাজ করার সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার অন্য নেতাদের মতো তাঁকে আত্মগোপন অবস্থায় থাকতে ও চলাফেরা করতে হত। অন্য কোনভাবে সাংগঠনিক কাজ করা তখন সম্ভব ছিল না।

১৯৪৮ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলেও পূর্ব বাঙলা সরকার সেভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সাথে সম্পর্কিত সংগঠনগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করেনি। কিন্তু সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে না করলেও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলা সরকার ও সরকারি দল মুসলিম লীগ তখন এমন ব্যাপকভাবে দমন, নির্যাতন, গ্রেফতার ইত্যাদি শুরু করে যাতে করে কমিউনিস্ট ও কৃষকদের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা অসম্ভব হয়। এইভাবে আত্মগোপন অবস্থায় থাকার সময় ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রংপুর জেলার শ্যামপুর নামক এক গ্রামে হঠাৎ গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারের পর তাঁকে রংপুর জেলে রাখা হয় এবং পরে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে জেল অনশন ধর্মঘটের সময় নিরাপত্তা আইনের অধীনে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। ওই সময় রাজশাহী জেলে বন্দিরাও নিজেদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেন এবং জেল কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁদের নানা ধরনের গন্ডগোল ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। সেই বন্দিদের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হত তার বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনে মনসুর হবিবুল্লাহ স্মারকলিপি লেখা থেকে শুরু করে অন্য অনেকভাবে সহায়তা করেন। এ কারণে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত ছিল।

১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে থাকার সময় ২৪ এপ্রিল জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সাথে রাজবন্দিদের এক সরাসরি সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষের সময় তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। জেল হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। রাজশাহী জেলে গুলির পর তিনি সেখানেই আটক থাকেন। জেল হাসপাতালে চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর শরীরের মধ্যে ঢুকে থাকা দুটি গুলি বের করা সম্ভব হয়নি। পরেও মৃত্যু পর্যন্ত গুলি তাঁর শরীরেই থেকে গিয়েছিল।

১৯৫১ সালে তাঁর মুক্তির জন্য ঢাকা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করা হয়। বিচারপতি এনিম ও ইস্পাহানীর আদালতে মামলাটির শুনানির পর তাঁরা সরকারের আটকাদেশ বহাল রাখেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর সিটিজেনশিপ এ্যাক্ট এর একটি ধারা অনুযায়ী মনসুর হবিবুল্লাহকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে ভাগ হওয়ার পর হিন্দু পরিবার থেকে আগত বহু সংখ্যক পার্টি নেতা ও কর্মীর পূর্ব বাঙলা থেকে পশ্চিম বাঙলায় চলে যাওয়ায় এবং পূর্ব বাঙলায় মুসলমান পরিবার থেকে আগত নেতা ও কর্মীর অভাব দেখা দেওয়ায় মনসুর হবিবুল্লাহ, আবদুল্লাহ রসুল প্রভৃতিকে পূর্ব বাঙলায় কাজের জন্য বলা হয়। আবদুল্লাহ রসুল পূর্ব বাঙলা থেকে একবার ঘুরে গিয়ে আর ফেরৎ যান নি। মনসুর হবিবুল্লাহ অবশ্য সেখানে থেকে যান এবং সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনেকের থেকে এ ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার পরিবর্তে এক ধরনের বিরুদ্ধতা এবং অসহযোগিতার সম্মুখীন হন। পূর্ব বাঙলায় মনসুর হবিবুল্লাহ সাংগঠনিক উপস্থিতি ও কাজকর্ম তাঁদের অনেকের জন্যই অসুবিধা এবং অস্বস্তির কারণ ছিল। এ কারণে শেষ পর্যন্ত সারা পূর্ব বাঙলার পরিবর্তে শুধু উত্তর বাঙলার কতকগুলি এলাকায় তিনি তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও তাঁর ওপর সামগ্রিকভাবে তৎকালীন পূর্ণ বাঙলার কৃষক আন্দোলনের দায়িত্বই সাংগঠনিকভাবে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব



বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম সেকালে কিভাবে চলত সে বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন।

পাকিস্তানের জেল থেকে মনসুর হবিবুল্লাহ যখন কলকাতায় ফেরৎ গেলেন তখন ভারত সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন কলকাতায় ও বর্ধমানে থাকেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্য হিসাবে আবার যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি পূর্ব বাঙলায় সাংগঠনিক কাজে যাওয়ার আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য থাকলেও পাকিস্তান থেকে ফেরার পর তিনি আর প্রাদেশিক কমিটিতে থাকেননি। ভারত ও পশ্চিম বাঙলায় পার্টির কোনও কোনও প্রভাবশীল নেতার তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্যই তাঁকে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো থেকে বাইরে রাখা হয়েছিল। এর অন্য কোন বোধগম্য কারণ ছিল না, কারণ তিনি বাঙলায় ফিরে এসে অল্প কিছুদিন পর থেকেই আবার পার্টির কাজে আগের মতোই নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ কথাও তিনি আমাকে তৎকালীন পার্টির সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে আলোচনার সময় বলেছিলেন

বি. এ. পাশ করার পর তিনি আইন পড়ার জন্য কলকাতায় ল' কলেজে ভর্তি হলেও সাংগঠনিক কাজে অনেক সময় দিতে হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষা দিতে পারেননি। সে পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন পূর্ব বাঙলা থেকে কলকাতায় ফেরার পর ১৯৫৬ সালে। তার আগে ১৯৫৫ সালে তিনি বীরভূম জেলার সিউড়ি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন।

১৯৪৭ সালের প্রাদেশিক বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে ২৪ পরগণার হাড়োয়া নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবিরের কাছে পরাজিত হন। ১৯৬২ সালে বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকা থেকে তিনি প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের পরবর্তী নির্বাচনে তিনি ওই একই এলাকায় পরাজিত হন। তারপর ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার নাদনঘাট থেকে তিনি দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় নির্বাচিত হন। এর পর থেকে নাদনঘাট পরিণত হয় তাঁর নির্বাচনী এলাকায়।

১৯৭৭ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার নির্বাচিত হন। ওই বছরই তিনি আন্তর্জাতিক স্পীকার্স কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ক্যানাডায় যান। এর পর ১৯৭৮ সালে জ্যামেইকাতে এবং ১৯৮০-৮১ সালে ফিজিতে স্পীকার্স সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় আইন ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে বিধানসভায় শেষ বারের মতো নির্বাচিত হওয়ার পর আর কোনও বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেননি।

অল্প বয়স থেকেই রাজনৈতিক কাজে জড়িত থাকলেও রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম থেকেই তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। লেখার কাজও শুরু করেন অল্প বয়সে। ১৯৩৭ সালে দামোদর নদের ওপর তাঁর একটি রচনা তৎকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সেই থেকে তিনি বিভিন্ন কাগজে নানা বিষয়ে লিখতে থাকেন। দেশ ভাগের আগে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র 'দৈনিক স্বাধীনতা'তে তিনি লিখতেন। আবদুল্লাহ রসুল, মনোরঞ্জন গুহ, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ 'কমরেড' নামে যে ইংরেজি পত্রিকা বের করেন তাতে তিনি মাঝে মাঝে লিখতেন। এইভাবে চতুরঙ্গ সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নানা বিষয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত অনেক রচনা প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধের সংকলন যেভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার কথা সেভাবে তা হয়নি। সেদিক দিয়ে মাত্র কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত 'আধুনিক তোতা কাহিনী' নামক বইটি একমাত্র ব্যতিক্রম। এ বইটিতে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কিছু রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুনে অবশ্য বলা দরকার তিনি শুধু শিক্ষা বিষয়ে লেখালেখি করেই নিশ্চেষ্ট থাকেননি। কলকাতার টালিগঞ্জে তিনি একটি হাই স্কুলেরও প্রতিষ্ঠা করেন যে স্কুলটি এখন যথেষ্ট উচ্চমানসম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থাকারে মনসুর হবিবুল্লাহর প্রথম বই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যার নাম ছিল 'লাল মার্শাল ফ্লেম ভেরিশিলড'। অনেক খোঁজাখুজি সত্ত্বেও বইটির কোনও কপি এখনও পর্যন্ত আর পাওয়া যায়নি। আইন মন্ত্রী থাকা কালে তিনি 'Law of wakfs' নামে মুসলিম ওয়াক্ফ আইনের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর মনসুর হবিবুল্লাহর মৃত্যুর মাত্র তিনি সপ্তাহ আগে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ বই 'A Critique on Bengal Renaissance'। □

**বদরুদ্দীন উমর**

# অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ৩০ অগস্ট ১৯৫৭
মৃত্যু ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চতুরঙ্গ পত্রিকার একজন উজ্জ্বল লেখিকা। বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু বিষয় এবং বিশেষ করে নাটকের ওপর তাঁর মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ কয়েকটি লেখা ছাপার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত। এরকম একজন প্রতিভাময়ী লেখিকার মাত্র ৩৯ বছর বয়সে আকস্মিক জীবনাবসানে আমরা মর্মাহত।

আকস্মিক হলেও অরুন্ধতীর এ ধরনের জীবনাবসান হয়ত নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। ভেতরে ভেতরে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি চলছিল অনেক আগে থেকেই। কেন আমার একথা মনে হয়েছে সেটাই এখন খুলে বলতে চাই। অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার মাত্র বছর কয়েকের পরিচয় চতুরঙ্গ সম্পাদনা সূত্রেই। সম-মনস্কদের মধ্যে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে—পরিচয় অতি দ্রুত সখ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সখ্যতা থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খুবই সীমিত। তিনি যে ন্যাশন্যাল মেরিট স্কলারশিপ পাওয়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে গোল্ড মেডেল পাওয়া ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছাত্রী—এসব আমি জানতাম না। তবে জানতাম তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ভাল অধ্যাপিকা, নাটকের একজন ভাল বোদ্ধা এবং ভাল অভিনেত্রী। একজন উঁচুদরের অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সবরকম সম্ভাবনাই তাঁর মধ্যে ছিল। অরুন্ধতী নিজেও এ ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। তাই নিজের অধ্যাপিকা কিংবা গবেষিকা পরিচয়ের তুলনায় অভিনেত্রী পরিচয়ের ওপরেই তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশি।

গবেষণা তিনি করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মারাঠি এবং বাংলা নাটা বিষয়ে। একাজে তিনি যখন মনোনিবেশ করেন তখন আমরা পরস্পরের পরিচিত। উল্লেখিত বিষয়ে তিনি ১৯৯২ সালে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান। গবেষণা, অধ্যাপনা, অভিনয়, ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজের উদ্দীপনার মধ্যেও জীবন সম্পর্কে এক ধরনের বীতস্পৃহা যে তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে—একথা কখনও টের পাইনি। টের পাওয়ার কোনও উপায়ও ছিল না। কারণ, পঁয়ত্রিশোর্দ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন প্রাণোজ্জ্বল তারুণ্যের প্রতীক।

অরুন্ধতী যে ভাল আঁকিয়ে ছিলেন, এটা আমার শোনা কথা। তাঁর ছবি কখনও দেখিনি। তবে তিনি যাই-ই করবেন, সেটাই যে হবে বিশেষ উৎকর্ষমণ্ডিত এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলাম। কারণ সাহিত্য, নাটক, শিল্পকলা ইত্যাদি যখন যে বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সযত্ন অনুশীলনজনিত চিন্তাভাবনার অদ্ভুত এক ধরনের নিজস্বতা এবং আন্তরিকতা লক্ষ না করে উপায় ছিল না। বিদুষী বলতে যা বোঝায়, আক্ষরিক অর্থে তিনি ছিলেন সেইরকম ব্যক্তিত্ব। তাই আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সখ্যতার ঊষ্ণতা থাকলেও সম্ভ্রমজনিত আপাত দূরত্বের একটা ব্যাপার ছিল। ঠিক বন্ধু হিসাবে পরস্পরকে আমরা কখনও সম্বোধন করিনি। যদিও অরুন্ধতীর সান্নিধ্য ছিল আমার কাছে একটি দুর্লভ প্রাপ্তি, কিন্তু সেটাকে সম্পর্কের ঘনিষ্টতা বলা যায় না কিছুতেই। তবুও তিনি যে আমাকে উদ্দেশ্য করেই সেই ১৯৯০ সালে নিজের এপিটাফ লিখে রেখে যাবেন—এ একেবারে অভাবনীয়। সম্প্রতি 'থিয়েট্রন'-এর প্রাণপুরুষ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় (যে থিয়েট্রনের জন্য অরুন্ধতী ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ) অরুন্ধতীর কাগজপত্রের ভেতর থেকে আমার নাম লেখা একটি মুখবন্ধ খাম আবিষ্কার করেন। যাতে ছিল আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটুকরো চিঠি এবং একটি কবিতা। আমার ওপর নির্দেশ ছিল পড়েই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই নির্দেশ মানা, না মানা অর্থহীন। কারণ অরুন্ধতী এখন সব কিছুর ঊর্ধে। তাই তারিখসহ চিঠি এবং কবিতা দুটোই হুবহু ছেপে দিলাম।

আবদুর রউফ
সম্পাদক, চতুরঙ্গ

১১/১৩ সেলিমপুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১
২৩. ১০. ৯০

মানাবরেষু,

অনেক দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে লেখাটি পাঠালাম। আপনি জানেন, আপনার মতোই, আমিও আধুনিক কবিতা বুঝি না। পরখ করার জন্য কবিতাটি আপনার সহকারী কাউকে দেখাতে পারেন, চিঠিটি নয়। এটি শুধু আপনার চক্ষুর জন্য। যদি মনোনীত হয়, 'শতরূপা বসুরায়' এই নামে ছাপবেন। না হলে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন।

চিঠিটি কাউকে দেখাবেন না দয়া করে। পড়ামাত্র ছিঁড়ে ফেলবেন। পত্রিকা তো হৈ হৈ-রৈ রৈ করে চলছে।

ভালো থাকবেন।

শুভেচ্ছান্তে
অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮.১০.৯০

**"প্রস্থানের পরে"**
(অভিনেত্রী অরুন্ধতী দেবীর স্মৃতিতে)
শতরূপা বসুরায়

দরজা খুলে রেখে চলে গেছে।
এপাশে ভিজে পায়ের ছাপ,
আর ওপাশে
নির্ভাজ শূন্যতা।
ও কি ভেবেছিল
কেউ পিছু ডাকবে?
দেহের তন্তুতে ছিল মায়া,
তাও ফেলে গেছে।
ছেঁড়া শাড়ি, অবয়ব ছায়া, ছায়া
মাটিতে লুটোয়।
হয়তো মাঝরাতে
একা জেগে
ভেবেছিল
এসব কুড়িয়ে নেবে কেউ—
সাজাবে ইজেলে;
বিমূর্ত প্রতিমা থেকে যাবে
স্বপ্নে, আড়ালে।
কী করুণ প্রস্থান!
বাতাসে বন্ধ কপাট
মৃদু হাসে।
পায়ের নির্জন আলপনা
কখন মিলিয়ে গেছে।
যদি জানতো
কেউ লক্ষ্য করবে না
ও কি যেতো?

ছবছর আগে লেখা এই কবিতা, যা অরুন্ধতী আমার কাছে পাঠাতে চেয়েও কী ভেবে শেষ পর্যন্ত পাঠাননি, আজ কল্পনায় নয় বাস্তবেই তাঁর 'করুণ প্রস্থানের' পর আমার হাতে এল। এই কবিতা পাঠের বেদনা একা একা বহন করা আমার পক্ষে দুঃসহ। তাই পাঠকদের ও শিল্পসংস্কৃতি তথা জীবনের অনুরাগী সকলকেই ভাগ দিতে চাইলাম। জানি না তাঁরা কীভাবে নেবেন।

আবদুর রউফ